সত্য কাহিনী সম্ভার

আয়াতুল্লাহ্ মুর্তাজা মোতাহারী

অনুবাদ : মাওলানা আলী আব্বাস

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ঢাকা, বাংলাদেশ

সত্য কাহিনী সম্ভার

আয়াতুল্লাহ মুর্তাজা মোতাহারী

অনুবাদ : মাওলানা আলী আব্বাস

প্রকাশকাল : এপ্রিল, ১৯৯৭

প্রকাশক : ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র বাড়ী নং- ৫৪ সড়কস নং- ৮/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা, বাংলাদেশ ।

Satta Kahini Shambher by Auatullah Mortaza Motahhari. Published by Office of the Cultural Counsellor, Embassy of the Islamic Republic of Iran, Dhaka.

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

ভূমিকা

এ কাহিনীগুলো সংগ্রহ, সাজানো ও প্রকাশকালে আমি আমার অধিকাংশ বন্ধু-বান্ধব ও ঘনিষ্ঠদের সাথে আলাপ-আলোচনা করেছি যে, আজকাল আমি এমন সংগৃহীত। কাহিনীগুলোর সবই সত্য কাহিনী। সত্য ও বাস্তবতা সমৃদ্ধ এ কাহিনীগুলো সাজানোর ব্যাপারে আকর্ষণীয় পদ্ধতি ও সহজ-সরল ভাষা ব্যবহার করেছি যাতে করে সাধারণ ও বিশেষ শ্রেণীর লোকদের প্রত্যেকেই সব সময় এর থেকে উপকৃত হতে পারে। আমার কথা শুনে লোকেরা এ গ্রন্থটির প্রশংসা করতে লাগলেন। কেউ কেউ নিজেদের খেয়াল প্রকাশ করে বললেন, ‘আসলে এ বইটি যুবক শ্রেণী ছাড়াও ভবিষ্যত বংশধরদের জন্যও অত্যন্ত উপকারী ও কার্যকরী হবে।’ কেউ কেউ আবার নিজেদের খেয়াল প্রকাশ করে এ কথা বললেন, ‘কাহিনী লেখার জগতে আজ পর্যন্ত এমন কোন দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয় না যেটিকে হাদীস ও ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলী থেকে সংগৃহীত বলে বলা হয়েছে। সুতরাং এ বইটি বিষয়গত দিক থেকে একটি সর্বপ্রথম ও অনন্য পদক্ষেপ। কাহিনী রচনার ময়দানে এ বিষয়টির অভাব অনুভূত হচ্ছিল। আশা করি এ বইটি সে অভাব পুরোপুরিভাবে দূর করে দিতে সক্ষম হবে।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এমন সব বহু গ্রন্থাদি সংকলিত, সম্পাদিত ও রচিত হয়েছে, যেগুলোতে চরিত্র আখলাক ও সামাজিক অবস্থার কথা বিষয় ভিত্তিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া এমনও অনেক বই-পুস্তক দেখতে পাওয়া যায় যেগুলোতে মানুষের জীবনের বিভিন্ন অবস্থা ও রূপকে লেখক নিজের চিত্তাকর্ষনীয় বর্ণনাভঙ্গি ও সুচিন্তিত পদ্ধতিতে সাজাবার সাথে সাথে কাহিনীর আকারে উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু যদি লক্ষ্য করে দেখা যায় তাহলে সে সব কাহিনীতে যা কিছু বর্ণনা করা হয়েছে তার সব কথাই বাস্তব সত্য নয়, বরং দক্ষ লেখক হিসাবে রচয়িতা মানব জীবনে পরিদৃষ্ট হয় এমন সত্যগুলোর ছবি কিছুটা এমনভাবে তুলে ধরেছেন যে, সাধারণ পাঠকদের নিকট তার বর্ণনাভঙ্গি মনঃপূত হয়। এতদ্ব্যতীত অনেক জীবনী গ্রন্থও পাওয়া যায়

যেখানে কোন একজনের কিংবা কয়েকজন মহান ব্যক্তিত্বের জীবনের বিভিন্ন অবস্থা ইতিহাসের ন্যায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সুতরাং এ সমস্ত গ্রন্থকে কাহিনী গ্রন্থের তালিকায় গণনা করা যায় না। আমার চোখের সামনেও এমন কোন কাহিনী গ্রন্থ পড়েনি যা হাদীস ও ইতিহাস গ্রন্থাদি হতে সংগৃহীত সত্য ও উপকারী কাহিনী সমৃদ্ধ। যার সংকলনের উদ্দেশ্য মানুষের হেদায়েতের সাথে সাথে ইসলামী চরিত্র- আখলাক ও সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসার ঘটানো। যদি ইসলামী চরিত্র- আখলাক ও সংস্কৃতির প্রচারের উদ্দেশ্য কোন গ্রন্থ রচিত হয়েছে তবে সেটা কাহিনীর আকারে নয়। আর যদি কোন বই কাহিনীর আকারে জনসমক্ষে এসেছে তবে সেটার সংগ্রহের উৎস হাদীস ও ইতিহাসের গ্রন্থাবলী নয় বরং সেটা রচয়িতার পারদর্শিতা ও দক্ষতাকে স্পষ্ট করে তুলে ধরার নমুনা।

এ বইটি তার বিষয়ের সর্বপ্রথম ও অনন্য অবতারণা হোক অথবা না হোক, এর জন্য প্রাপ্য ফুলের মামলার যোগ্য পাত্র আমি নই, অর্থাৎ যদি এ বইটি কাহিনী রচনার জগতে কোন গুরুত্বপূর্ণ নতুন অবতারণার দাবিদার হয় তাহলে তার গোড়াপত্তনকারী আমি নই। বরং প্রকাশনা ও প্রচারণার একটি প্রতিষ্ঠানে দেশের বিজ্ঞ বিজ্ঞ বিজ্ঞানী- গুণী কতিপয় ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে একটি সম্পাদনা বোর্ড গঠন করা হয়েছে। এ অধমও সে বোর্ডের একজন সদস্য। দেশের খ্যাতনামা লেখক ও বিজ্ঞতম ব্যক্তিত্ব সমৃদ্ধ সে বোর্ডের এক বৈঠকে প্রস্তাব রাখা হলো যে, এমন একটি গ্রন্থ রচিত হওয়া উচিত যার মধ্যে চারিত্রিক সুন্দর ও গুণাবলী কাহিনী আকারে উপস্থাপিত থাকবে। আর সে কাহিনীগুলো লেখকের নিজের মস্তিষ্ক থেকে আবিস্কৃত বা নিজের খেয়াল মোতাবেক তৈরি হবে না। বরং তার ভিত্তিমূল ও উৎস হবে হাদীস, বাস্তব জীবন ও ইতিহাসের গ্রন্থরাজি। এর সংকলনের উদ্দেশ্য থাকবে মুসলিম সমাজকে শিক্ষা দান এবং যুব সমাজকে হেদায়েতের পথ প্রদর্শন ও পরিচালনা করা।

সংক্ষিপ্ত কথা হচ্ছে যে, সভায় সকল সদস্যের মতানুযায়ী এ প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। এ ব্যাপারে আমার ভূমিকা শুধু এতটুকুন যে, এ প্রস্তাব অন্যান্য সদস্যের তুলনায় আমার নিকট বেশী ভালো লেগেছে। তখনই আমি আমার মনে এ অঙ্গীকার করলাম যে, এ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বটি আমি পালন

করবো। তাই ‘সত্য কাহিনী সম্ভার’ নামের এ বইটি সে প্রস্তাব ও অঙ্গীকারেই ফল হিসাবে আপনাদের হাতে তুলে দিতে পারলাম।

‘সত্য কাহিনী সম্ভারে’ অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি কাহিনী সংগ্রহের উৎস অর্থাৎ যে গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে তার নাম কাহিনীর সমাপ্তি পর্যায়ে টীকা দিয়ে সমাপ্ত পৃষ্ঠারই নিচে লিখে দেয়া হয়েছে। এর কোন কোন কাহিনী একাধিক গ্রন্থ পাওয়া যায়। সুতরাং অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে বিবেচনা করে প্রতিটি সংগ্রহের ভিত্তি উল্লেখ করা হয়েছে। একাধিক গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে এ বিষয়ের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে যে, বিভিন্ন গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন রচনাভঙ্গিতে একই ঘটনাকে উপস্থাপন করা হয়েছে। একই ঘটনাকে কেউ খুব সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন আবার অন্য লেখক সেটাকেই আরো বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন।

মনে রাখতে হবে যে, যে কোন ঘটনাকেই বর্ণনা করার সময় মনের কল্পনা রূপায়ন বা রচনা শৈল্পিক প্রদর্শনীর নীতি অবলম্বন করা হয়নি, বরং যে গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে সে গ্রন্থে যে ঘটনা যেভাবে বর্ণিত আছে ঠিক সেভাবেই বর্ণনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। মোদ্দাকথা মূল ঘটনায় কোন কিছু বাড়ানো হয়নি। আর না তার থেকে কমানো হয়েছে। কিন্তু এর সাথে সাথে এ কথাটিও বলে দেয়া জরুরী যে, এ বইটিকে একটি নিছক শাব্দিক অনুবাদের বই মনে করাটা হবে বাস্তবতা বিরোধী। বরং কাহিনী লেখার সময় যথা সাধ্য এ চেষ্টা করা হয়েছে যে, মূল বর্ণনায় কোন প্রকার বাড়ানো বা কমানো ব্যতীত কাহিনীকে এমন ভঙ্গিতে তুলে ধরা হবে যা দ্বারা মানুষের রুচি-চাহিদাও পূরণ হবে এবং পাঠকের আত্মতৃপ্তিতে কোন প্রকার অসঙ্গতি ও অসম্পূর্ণতা সৃষ্টি হবে না। অধিকাংশ কাহিনীতে আপনারা দেখতে পাবেন যে, যে পুস্তক থেকে কাহিনীটি সংগ্রহ করা হয়েছে সে পুস্তকে কাহিনীর সূচনা এক রকমের আর এ পুস্তকে অন্য রকমের অথবা সে পুস্তকে যেখানে কাহিনীর সমাপ্তি, এ পুস্তকে সেখান থেকে শুরু হয়েছে। এভাবে এ বইয়ের উপস্থাপনা ও বর্ণনাভঙ্গি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। কিন্তু যদি একজন সত্যপন্থী পাঠক এ বইয়ের কাহিনী এবং যে বই থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে, এ দুটোই পাঠ করে তাহলে সে খুব সহজে বুঝতে পারবে যে, এ রদবদল কিছুটা এমনভাবে করা হয়েছে যে, কাহিনীর

সত্যতা ও তার যথার্থতার ক্ষেত্রে কোনই পরিবর্তন সংঘটিত হয়নি, বরং কাহিনীকে আরো সমৃদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য করে উপস্থাপন করা হয়েছে।

এ গ্রন্থে কাহিনীগুলোর ফলাফল ও শিক্ষনীয় বিষয়াবলীর বর্ণনা পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা হয়নি। তবে এর মধ্যে এমন কতকগুলো বাক্য নিহিত রয়েছে যা দ্বারা কাহিনীর ফলাফল বেরিয়ে আসে। এমন কি কাহিনীগুলোর শিরোনাম চয়নকালে যথা সম্ভব চেষ্টা করা হয়েছে যে, তা যেন এমন না হয়, যা সরাসরি এর ফলাফলের দিকে ইঙ্গিত করে। এটা এ কারণে যে, আমরা চাইলাম ফলাফল নির্ণয়ের দায়িত্বভার স্বয়ং পাঠকবৃন্দের উপরই ন্যস্ত করবো।

কোন গ্রন্থ রচনা বা বর্ণনার পূর্ণত্ব ও সৌন্দর্য হচ্ছে তার পাঠকের চিন্তা জগতে সাড়া জাগাবে এবং সে বর্ণনায় প্রাপ্ত গভীর তাৎপর্য পর্যন্ত পৌছার জন্য চিন্তাগত দিক থেকে প্রস্তুত হয়ে যাবে। বর্ণনাটি উপস্থাপন করার সময় সহজবোধ্য রচনাভঙ্গি ও সহজ- সরল ভাষা ব্যবহার করা উচিত যাতে করে পাঠককে তা বুঝবার জন্য বেশী চিন্তা- ভাবনা করতে না হয় এবং খুব সহজে সে লেখায় নিহিত তাৎপর্য বুঝে নিতে পারে। কিন্তু সে লেখার ফলাফল হাসিল করার বিষয়টি পাঠকদের চিন্তার ওপর ছেড়ে দেয়া উচিত যাতে করে তার চিন্তা- ভাবনা করার যোগ্যতা বৃদ্ধি করতে পারে। যে লেখার ফলাফল পাঠক নিজে নির্ণয় করতে না পারে এবং নিজের চিন্তা- ভাবনা দ্বারা এর তাৎপর্য আরো বাড়াতে না পারে, সে লেখা তার হৃদয়ে কোন দাগ কাটতে পারে না অর্থাৎ কোন লেখার ফলাফল যদি পাঠক নিজে বের করতে সক্ষম হয়, তাহলে তার চিন্তা- ভাবনার পরিধি বৃদ্ধির সাথে সাথে সে ফলাফল তার অন্তরে গেঁথে যায় এবং সে ফলাফলই তার মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। আর যার প্রভাব একবার অন্তরে বসে যায় সেটাই বাস্তবে নিশ্চিতরূপে পরিদৃষ্ট হয়, অর্থাৎ নিজের চিন্তা- ভাবনা দ্বারা অর্জিত ফলাফলের প্রভাব তার বাস্তব অনুশীলনে অবশ্যই পরিলক্ষিত হয়। এছাড়াও একটি বাস্তব সত্যকে ভুলে যাওয়া ঠিক হবে না যে, নিজের চিন্তা- ভাবনা দ্বারা অর্জিত ফলাফল প্রকৃতিগতভাবে হয়ে থাকে। সুতরাং এর দ্বারা মানব প্রকৃতি প্রভাবিত হওয়া নিশ্চিত।

আগেই বলা হয়েছে এ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ কাহিনীই হাদীস গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে। আর কাহিনীর প্রধান আকর্ষণ হিসেবে বেশীর ভাগ দ্বীনী মহান ব্যক্তিবর্গকে চয়ন করা হয়েছে। কিন্তু প্রতিটি কাহিনীর বেলায়ই এ কথাটি প্রযোজ্য হবে না, বরং ইলমে রিজাল ভিত্তিক কিতাবাদি তথা হাদীসের গ্রন্থাবলী ও দ্বীনের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের জীবন অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা ছাড়াও ইতিহাসের গ্রন্থাবলী থেকেও কোন কোন গল্প গৃহীত হয়েছে। এতদ্ব্যতীত উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ওলামা ও বিজ্ঞ ইসলামী চিন্তাবিদগণের সাথে সম্পৃক্ত সে সমস্ত ঘটনা কাহিনীকেও শামিল করা হয়েছে। যা দ্বারা মুসলিম সমাজের সংশোধন করা যেতে পারে, যা পাঠ করে লোকেরা উন্নত চারিত্রিক গুণাবলী সম্পর্কে অবগত হতে পারে এবং বাস্তব জীবনে সেগুলোর অনুসরণ করার প্রেরণা লাভ করতে পারে। এ পর্যায়ে কোন প্রকার পক্ষপাতমূলক বা তরফদারীর নীতি অনুসরণ করা হয়নি, বরং শিয়া ওলামা ও পথ প্রদর্শকদের ছাড়াও অন্যান্য ইসলামী ও অনৈসলামী গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বদের সাথে সম্পৃক্ত ঘটনাবলীকেও কাহিনীর আকারে পেশ করা হয়েছে যাতে করে লোকেরা এর থেকে পুরোপুরিভাবে উপকৃত হতে পারে।

গ্রন্থটির নামকরণের বেলায় এ সত্যটি চিন্তা- বিবেচনায় রাখা হয়েছে যে, কাহিনীগুলোতে প্রধান আকর্ষণের ভূমিকায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে এমন সব ব্যক্তিবর্গ রয়েছেন, যাদের চরিত্র- আখলাক ও সত্যবাদিতার ব্যাপারে কারোই দ্বিমত নেই। আর যাদেরকে মহান আল্লাহর কিতাব আল কোরআন সিদ্দিকীন নামে তথা সত্যবাদী উপাধিতে ভূষিত করেছে। তাই এ গ্রন্থের নাম রাখা হয়েছে 'সত্য কাহিনী সম্ভার' অর্থাৎ আমরা এ কথা বলতে চাই যে, এ গল্প- কাহিনীগুলো সে সমস্ত সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কিত, যারা নিজেদের সমগ্র জীবন সত্য- ন্যায় ও সঠিক পথের অনুসরণ ও প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করে রেখেছিলেন। এ নামকরণ দ্বারা অপর একটি ধারণা এটাও নেয়া যেতে পারে যে, এ গল্প- কাহিনীগুলো সে সমস্তলোকের জন্যই রচিত, যারা সত্য ও ন্যায়ের পথে চলতে আগ্রহী এবং যাদের অন্তরে এ স্পন্দন রয়েছে যে, সত্য সত্য কাহিনীর আলোচনা দ্বারা নিজেদের আমল- অনুশীলনকে বিশুদ্ধ করে নেবেন। বস্তুত এ কাহিনীগুলো সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের ও সত্যাগ্রহী লোকদের জন্যই লেখা হয়েছে।

যেহেতু এ কাহিনীগুলো কারো মনগড়া নয়, বরং বাস্তবে যা সংঘটিত হয়েছে এবং এমন সব গ্রন্থাদিতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যেগুলোতে যে কোন ঘটনাকেই অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে সত্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করে লেখা হয়েছে। সুতরাং এ কাহিনীগুলো সার্বিকভাবে 'সত্য কাহিনী সম্ভার' নামে আখ্যায়িত হওয়ার অধিকারী। মোটকথা এ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত কাহিনীগুলোকে কোনভাবেই সত্যের গন্ডি থেকে পৃথক করে দেখা যেতে পারে না।

এতে দ্বিমতের কোনই অবকাশ নেই যে, এ কাহিনীগুলো মানুষের চরিত্র- আখলাক ও সামাজিক জীবনে পথপ্রদর্শনের কাজটি আঞ্জাম দেবার বেলায় অত্যন্ত ফলদায়ক। এর সাথে সাথে এ কাহিনীগুলো ইসলামী শিক্ষা- দীক্ষার আধ্যাত্মিক পরিচয়টাও তুলে ধরে অর্থাৎ এ কাহিনীগুলো পাঠ করে পাঠক ইসলামী শিক্ষার আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে সম্যক অবগতি লাভ করতে পারে। ইসলামী তত্ত্বজ্ঞান সম্পর্কে অবগতি হাসিল করার পর এ কাজটি খুবই সহজ হয়ে যায় যে, পাঠক নিজের ব্যক্তিগত জীবন ও সমাজ জীবনের পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করে এ সিদ্ধান্তগ্রহণ করবে যে, তিনি যে পরিবেশ ও সমাজে বসবাস করছেন, সেটা ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী কিনা। এমনিতে বলার সময় তো প্রতিটি স্তরের লোকেরাই নিজেদেরকে মুসলমান হিসাবে দাবী করে। কখনও কখনও এমনও দেখা গেছে যে, কোন কোন দল ইসলামের সাইন বোর্ড নিজেদের গলায় ঝুলিয়ে চলাফেরা করে। কিন্তু যেভাবে বলা ও করার মধ্যে পার্থক্য হয়ে থাকে, তেমনিভাবে ইসলামের দাবিদার ও ইসলামের ভিত্তির উপর অনুসারী হয়ে চলার মধ্যে বিরাট পার্থক্য থেকে যায়। ইসলামের সাথে সম্পর্কযুক্ত বাস্তব সত্য ও তত্ত্ব সম্বন্ধে যথাযথ অবগতি হাসিল করে নেয়া এবং আমল- অনুশীলনের জগতে সে সব ভিত্তির ওপর অনুগত থাকা বিরাট গুরুত্বের দাবিদার।

এ কাহিনীগুলো বিশেষ শ্রেণীর লোকদের জন্যও ততখানিই কল্যাণকর ও উপকারী, যতখানি সাধারণ মানুষদের জন্য। কিন্তু এ গ্রন্থ সংকলনের আসল ও মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সাধারণ মানুষের কল্যাণ সাধন। কেননা এরাই সে স্তরের লোক, যারা ন্যায়- ইনসাফ ও সত্যের সামনে অবনত মস্তক ঝুঁকিয়ে দেবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকে। এ শ্রেণীর লোকেরা সত্য- ন্যায়ের আনুগত্য করার

ব্যাপারে কোন প্রকারের হীলা- বাহানা ও ছল- ছাতরীর পথ অবলম্বন করে না, বরং জানার সাথে সাথেই তার উপর আমল করার অনুসারী হয়ে যায়।

মানব সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের ভালো- মন্দের প্রভাব নিঃসন্দেহে পরস্পরেরে মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করে। এটা কিছুতেই সম্ভব নয় যে, এ শ্রেণীগুলোর মাঝে এমন একটা আড়াল দাড় করানো যেতে পারে, যার কারণে এক শ্রেণীর মন্দ কাজের প্রভাব অন্য শ্রেণীকে প্রভাবিত করতে পারে না। কিন্তু মানব ইতিহাসে আজ পর্যন্ত সাধারণত এটাই পরিলক্ষিত হয়ে আসছে যে, ঝগড়া- লড়াই বা মন্দ কাজ সব সময় বিশেষ শ্রেণীর লোকদের থেকেই শুরু হয়েছে। পরবর্তীতে এ মন্দের অনুশীলন সাধারণ লোকদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে। ঠিক এর বিপরীতে সব রকমের সামাজিক ভালো কাজ ও জাগরণের ধারা সাধারণ মানুষ থেকে শুরু হয়ে আসছে। অতঃপর বিশেষ শ্রেণীর লোকদেরকে এ ব্যাপারে বাধ্য করেছে যে, তারা সে ভালো কাজের অনুসরণ করবে অর্থাৎ পূর্ব থেকেই প্রচলিত হয়ে আসছে যে, ঝগড়া- লড়াই ও মন্দ উপর থেকে নিচের দিকে ছড়ায় আর ভালো কাজ নিচে থেকে উপরের দিকে গড়ায়। অল্প কথায় এরূপ বলা যেতে পারে যে, সমাজে বিস্তৃত মন্দ ও খারাপ কীর্তির উপর দৃষ্টি পড়ার সাথে সাথেই এ কথা বুঝে নিতে হবে যে, এর ভিত্তি স্থাপনকারী' হচ্ছে বিশেষ বা উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা। আর ধীরে ধীরে এ মন্দ সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে গিয়ে একটা বিপজ্জনক ও ধ্বংসকর অবস্থা ধারণ করেছে। অনুরূপভাবে সামাজিক কল্যাণ ও মঙ্গল বিষয়ক প্রতিটি কাজ সাধারণ মানুষ থেকে গোড়াপত্তন হয়েছে। অবশেষে এমন একটি পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হয়েছে যে, উপরতলার লোকদের নিকট তখন আর কোন উপায়- অন্তর অবশিষ্ট থাকেনি যে, তারা জনগণের কর্মসূচীর সাথে একমত না হয়ে থাকতে পেরেছে।

উপরোক্ত নিয়মের সমর্থনে আমরা দেখতে পাই আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী ইবনে আবী তালিব (আঃ) তার উচ্চ শিক্ষামূলক বক্তব্যাবলীর এক পর্যায়ে মানুষকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেনে। একটা হলো সাধারণ লোক ও আরেকটি হলো বিশেষ বা উচ্চ শ্রেণীর লোক। সাথে সাথে তিনি সে বিশেষ শ্রেণীর লোকদের কল্যাণের কাজ ও সঠিক পথের অনুসরণের ব্যাপারে হতাশা ও

নিরাশা ব্যক্ত করেছেন। আর শুধু সাধারণ লোকদের ব্যাপারেই তিনি আশাবাদের বাণী উল্লেখ করেছেন। তিনি তার খেলাফতকালে এক সরকারী নির্দেশনামায় গভর্নর মালিক আশতার নাখঈকে লিখেছেন :

"গভর্নরকে এ কথা জেনে রাখা দরকার যে, অহেতুক কাজে অধিক খরচকারী, বিপদ- আপদে কম সাহায্যকারী, ন্যায়- ইনসাফের প্রতি অধিক ঘৃণা পোষণকারী, উচ্চাভিলাষী, খোদার শুকুর অনাদায়ী, ওযর- আপত্তি গ্রহণ করতে অস্বীকারকারী ও কঠিন বিপদে ধৈর্য ধারণ ক্ষমতার অভাবীরা উচ্চ শ্রেণীর লোক ছাড়া অন্য কেউ নয়। এর বিপরীতে সাধারণ শ্রেণীর লোকেরা দ্বীনের স্তম্ভ। নিঃসন্দেহে এরা মুসলমানদের কেন্দ্রবিন্দু এবং শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয়ের কারণ। সুতরাং হে মালিক আশতার। সর্বদা এ সাধারণ লোকদের প্রতি সুদৃষ্টি রাখা তোমার জন্য অতীব জরুরী।"

এ ধারণা পোষণ করা একটি ভুলেরই নামান্তর যে, বিশেষ শ্রেণীর গুটিকতেক লোকের সাহায্য বিরাট বিরাট সংস্কারকর্ম সাধিত হয়ে যাবে। আর এ সীমিত সংখ্যক লোকদের পক্ষপাতিত্ব করে উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করা যেতে পারে।

বরং বাস্তব অভিজ্ঞতা এ কথাই বাতলে দিচ্ছে যে, সাধারণত উপরতলা থেকে সূচনাকৃত কাজ বাহ্যিকভাবে কল্যাণকর ও উপকারী দেখা যায়। সে কর্মসূচীর বাহ্যিক সৌন্দর্যের ব্যাপক ও অতিরিক্ত প্রচারাভিযান চালানো হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ সমস্ত প্রপাগাণ্ডা ডঙ্কা বাজানো ব্যতীত আর কিছুই নয়। ঠিক এর বিপরীত পক্ষে জনগণের সাহায্য শুরুকৃত কর্মসূচীতে প্রচার- প্রপাগাণ্ডার বদলে ঐকান্তিকতা ও বিশ্বাসের নমুনাই পরিদৃষ্ট হয়। সাধারণ মানুষের প্রত্যেকেই অত্যন্ত আন্তরিকতা ও পরিশ্রমের সাথে নিজেদের কাজে পরিপূর্ণরূপে নির্লিপ্ত থাকে।

প্রসঙ্গক্রমে আরো একটি কথা বলতে হচ্ছে। সেটা হলো আমি যখন এ বইটি সংকলন ও প্রকাশনার কাজে লিপ্ত ছিলাম তখন আমার বন্ধু- বান্ধব ও প্রিয়জনের অনেকেই এ বইটির উপকারিতা ও গুরুত্বের প্রতি আলোকপাত করে অসংখ্য চিঠিপত্র লিখেছেন। প্রায় সকলেই এ বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে, এ বইটি মুসলিম সমাজের জন্য অতীব উপকারী বলে প্রমাণিত হবে। কিন্তু তাদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ এ কথা লিখেছেন যে, তাদের মতে আমার

মত একজন আলেমের পক্ষে এটা শোভনীয় নয় যে, অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের রচনা ও সংকলনের কাজ বন্ধ রেখে তাদের পত্রে আফসোস প্রকাশ করার সাথে সাথে আমাকে ভালো-মন্দও বলেছেন। তাদের দষ্টিতে মূল্যবান গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাদির রচনা সাময়িকভাবে বন্ধ রেখে একটি সাধারণ ও সহজ বই সংকলনের কাজে লিপ্ত হওয়া কোন অবস্থাতে সঙ্গত হয়নি। কোন কোন বন্ধু এ পরামর্শও দিয়েছেন যে, আপনি যখন কাহিনীর বইটি লেখার কষ্ট মেনেই নিয়েছেন তখন কোন কথা নেই, কিন্তু বইটি আপনার নিজের নামে প্রকাশ না করাটাই উত্তম হবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেন? তাতে অসুবিধা কি'? তারা বললেন, 'আপনার মত একজন বিজ্ঞ আলেম ও দার্শনিকের শানে এটা অসামঞ্জস্য। এ ধরনের ছোট্ট ও কম গুরুত্বের বই আপনার নামে বের হবে'? তারপর আমি যখন ছোট্ট ও বড় কাজের মাপকাঠি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, তখন তারা বললেন, 'কঠিনতম বিষয়গুলোর সম্পাদন করা ও বিজ্ঞতার পরিচয় বহনকারী বই পুস্তক রচনাই বড় কাজের তালিকাভুক্ত। আর সহজবোধ্য রচনাভঙ্গি ও সাধারণ মানুসের বোধগম্যের ভাষায় লিখিত বই- পুস্তকই ছোট কাজের অন্তর্ভূক্ত অর্থাৎ ছোট্ট ও বড় কাজের মাপকাঠি কাজের গুরুত্বের সাথে সম্পৃক্ত নয়, বরং বিধান হচ্ছে সহজ- সরল কাজটি ছোট আর কঠিন কাজটি বড়'।

এ যুক্তি বা চিন্তা পদ্ধতি যদি একজন বা কয়েকজন লোকের ধারণাপ্রসূত হতো তাহলে আমি এ ব্যাপারে কখনো আলোচনা করতাম না। কিন্তু পরিতাপের সাথে বলতে হয় যে, এ চিন্তা পদ্ধতি একটা বিপজ্জনক সামাজিক ব্যাধির রূপ ধারণ করতে যাচ্ছে। এটাকে ইসলামী শিক্ষার প্রচার-প্রসার ও প্রকাশনার পথে একটা বিরাট বিদ্রোহ ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। এ ধরনের চিন্তা- ফিকির অসংখ্য কলমধারীকে এমন হতাশা ও নিরাশার শিকারে পরিণত করেছে যে, তারা রচনা, সম্পাদনা ও সংকলনের কাজই ছেড়ে দিয়েছেন।

এ কারণেই আজ আমরা দ্বীনী ও মাজহাবী উপকারী পুস্তকাদির ময়দানে সীমাহীন দারিদ্র্যতার শিকার। আর এমন মূল্যবান বই- পুস্তকগুলো একেবারেই দুর্লভ হয়ে গেছে যেগুলো দ্বারা মুসলমানরা উপকৃত হতে পারতো। উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন আলেম ও বিজ্ঞজনদের জন্য যেন এটাই

জরুরি কাজ হয়ে গেছে যে, তারা দশ বছর পর্যন্ত কিংবা আরো বেশী সময়কাল ধরে কোন একটি বিষয়ে একটি ইলমসমৃদ্ধ বিরাট গ্রন্থ্ সংকলন করবেন আর তার প্রচ্ছদে মোটা অক্ষরে নিজের নাম লিখে প্রকাশ করবেন। এখন এটা ভিন্ন কথা যে, সে পুরো গ্রন্থটি দ্বারা সমাজের কোন এক ব্যক্তিও চাই উপকৃত হতে না পারুক। কিন্তু মাপকাঠির দিক থেকে সেটি একটি বিরাট ও মূল্যবান কাজ হিসাবে পরিগণিত হবে। সে বিজ্ঞ আলেম অতীব উপকারী, অথচ সহজ- সরল ভাষার একটি ছোট্ট পুস্তক শুধু এ কারণেই রচনা ও সংকলন করে প্রকাশ করেন না যে, এটি তার মান- সম্মান মোতাবেক নয়। যার ফল এ দাড়িয়েছে, যে সব বিষয় জরুরি দরকার সেগুলোর সংকলন ও প্রকাশনা হতে পারছে না আর যেগুলো খুব বেশী প্রয়োজন নেই সেগুলো একের পর এক জনসমক্ষে এসে হাজির হচ্ছে। এ পর্যায়ে খাজা নাছির উদ্দিন তুসী খুব সুন্দর বলেছেন :

অর্থাৎ, ‘আফসসো! যে খেলায় আমার হেরে যাওয়ার কথা সেখানেই হয়েছি আমি বিজয়ী। আর যে সমস্ত জিনিস আমার চেনা উচিত না সেগুলোর পরিচিতিই আমি হাসিল করেছি। মোদ্দাকথা যে সব জিনিস পরিত্যাগ করা আমার উচিত ছিল, সে সবই আমি আমার গলায় ঝুলিয়ে রেখেছি আর যা যা আমার অর্জন করা দরকার ছিল তা তা আমি করেছি ত্যাগ’।

কাব্যার্থ :

‘যেথায় আমার হারার কথা
হইনু সেথা বিজয়ী হায়!
ছিল না যাহা চেনার গরজ
কাটানু বেলা তারই নেশায়।
ত্যাজ্য সকল জিনিস কুড়ায়ে
করিনু আমি গলার মালা।
হেলায় হারানু তাহাই আমি
যাহাই ছিল কুড়ানোর পালা’।

অবশেষে আমি আমার বন্ধুদের পত্রের জবাবে লিখলাম : 'আপনাদের এ প্রস্তাব আমাকে বাধ্য করেছে যে, সমাজে বিস্তৃত এ বিপজ্জনক রোগের কতা আলোচনা করবো, যা ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রচার মিশনকে বিরোধিতার মোকাবিলায় দাঁড় করিয়ে রেখেছে। শুধু তাই নয়, আপনাদের এ প্রস্তাব আমার নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। আমি এ সহজ- সরল বইটিকে আমার নামেই প্রকাশ করবো, বরং এ বইয়ের ভূমিকায় আমি ইসলামী সমাজ যে এ মারাত্মক রোগে আক্রান্ততার কথাও উল্লেখ করবো'।

এতো সব কথাবার্তা সত্ত্বেও একটি বিষয় আমার মন- মগজকে অস্থির করছে। সেটা হলো যেভাবে মানুষ সহজ- সরল বই রচনা ও সংকলন করাকে নিজের শান সম্মানের লাঘব মনে করে তেমনি আমাদের সমাজে এমন সব লোকও নিশ্চয়ই বর্তমান রয়েছে যারা সহজ- সরল ভাষায় লিখিত জ্ঞানসমৃদ্ধ বই- পুস্তক এ কথা বেবে অধ্যয়ন করে না যে, এ ধরনের ছোট- খাটো বই পাঠ করা তাদের সম্ভ্রমের হানি ঘটবে।

কোরআন মজীদের মান- মসযার্দাও এর ঐতিহ্য- পবিত্রতার প্রতি দৃষ্টি রেখে আমি ইচ্ছা করেই এ ঐশী গ্রন্থের কাহিনীগুলোকে এ গ্রন্থে শামিল করিনি। আমার আকীদা বিশ্বাস হচ্ছে আল কোরআনের গুরুত্বপূর্ণ কাহিনীগুলোর ওপর একটা স্বতন্ত্র গ্রন্থ সংকলিত হওয়া উচিত। এর কাহিনীগুলোকে অন্য গ্রন্থে শামিল করা ঠিক নয়। মহান আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি যে, এ জাতীয় কাজ আরবী ভাষায় যথেষ্ট হয়েছে এবং ফার্সী ভাষায়ও এ বিষয়ে অনেক বই প্রকাশিত হয়েছে।

বস্তুত আল কোরআনের শিক্ষা নিয়েই আমরা এ গ্রন্থটি সংকলন করেছি। কেননা আল- কোরআনই সর্বপ্রথম কিতাব যা মানব সমাজকে হেদায়েত, পথপ্রদর্শন ও শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে বাস্তব ও সত্য কাহিনীগুলোকে নিজের কলেবরে স্থান দিয়েছে। আর সেগুলোকে উচ্চ ঐশী শিক্ষা বলে ঘোষণা করেছে।

'সত্য কাহিনী সম্ভার খন্ডে ৭৫টি কাহিনী স্থান' লাভ করেছে। এ খন্ডের জন্য আমি প্রথমে ১০০টি কাহিনী নির্বাচিত করেছিলাম। আর এ খেয়ালও রেখেছিলাম যে, পরবর্তী খন্ডেও

১০০টি কাহিনী শামিল করবো। কিন্তু একান্তবন্ধু- বান্ধবগণ ছাড়াও প্রকাশনা বোর্ডও এ পরামর্শই দিয়েছেন যে, ১০০টি কাহিনীর কারণে গ্রন্থটি আকারে বেশ পুরুহয়ে যাবে। এছাড়াও ছাপানোর জন্য যে কাগজ যোগাড় করা হয়েছিল তাও ছিল কম। এ সমস্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করে প্রথম খণ্ড ৭৫টি কাহিনী সমন্বয়ে প্রকাশ করা হলো। এখানে আরো একটি কথা পরিষ্কার করে দেয়া দরকার মনে করছি। কথাটি হলো- এ গ্রন্থে অন্তভুর্ক্ত অধিকাংশ কাহিনীই ইতিবাচক। সমগ্র গ্রন্থে শুধু দুই তিনটি কাহিনী আছে নেতিবাচক। অর্থাৎ এ দুই তিনটি নেতিবাচক কাহিনী লোকমান হাকিমের সে নীতির প্রতি ইঙ্গিত বহন করছে যে, যদি কোন লোকের মধ্যে কোন চারিত্রিক দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয় তাহলে তার সংশোধনী ও সতর্ক করে দেয়ার জন্য তার সে দুর্বলতা ও মন্দ দিকটা আলোচনা করা জরুরী। উদাহারণ হিসেবে আমরা এখানে সেরূপ তিনটি কাহিনীর অবতারণা করেছি। যেমন- 'একটি গালী', 'বাক্যবাণ' ও 'বন্ধুত্বের চির অবসান'। এ তিনটি কাহিনীকে নেতিবাচক বলা যেতে পারে। প্রথম দিকে বিশেষ কোন দৃষ্টিপাত না করেই আমি এ কাহিনীগুলো লিখে চলেছিলাম। কিন্তু ক্রমানুসারে সাজাবার সময় যখন লক্ষ্য করে দেখলাম তখন একবার খেয়াল হলো নেতিবাচক কাহিনীগুলো এ বইয়ের অন্তর্ভুক্ত করবো না, যাতে করে সমস্ত কাহিনী একই ধরনের থেকে যায়। আর ইতিবাচক পদ্ধতি দিয়েই সমাজ সংস্কারের কাজ শুরু করবো। দীর্ঘদিন পর্যন্ত স্থির করতে পারছিলাম না যে, এ কাহিনীগুলোকে এ গ্রন্থে শামিল করবো কিনা? অবশেষে স্থির করলাম যে, এগুলোও অন্তর্ভুক্ত করে দেবো। আর ভূমিকায় কথাটি আলোচনা করে এ গল্পগুলোর প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাদের কাছেই পরামর্শ চাইবো যে, এ ধরনের কাহিনীর ব্যাপারে তাদের কি মতামত? পাঠকদের রায় মোতাবেক পরবর্তী খন্ডে এ ধরনের গল্পের অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ উত্তম হবে।

আমি আপনাদের সকলের দিকনির্দেশনা ও পরামর্শের মুখাপেক্ষী রইলাম। সংশোধন সংক্রান্ত পাঠকবৃন্দের প্রতিটি পরামর্শের জন্য তাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো। তাদের পরামর্শ আমাদের পরবর্তী খণ্ডগুলোকে আরো সমৃদ্ধ করার ব্যাপারে নিশ্চয়ই সহায়ক হবে।

মহান আল্লাহর দরবারে কল্যাণ ও তাওফিক দানের প্রার্থী রইলাম।

মুর্তাজা মোতাহারী

তেহরান,   ১৫ মুহাররামুল হারাম

১৩৮০ হিজরী

চিরঞ্জীব শহীদ মোতাহারী

অধ্যাপক আয়াতুল্লাহ মুর্তাজা মোতাহারীর শাহাদাতের পর ষোল বছর অতিক্রান্ত হলো। ইরানের ইসলামী বিপ্লবের প্রায় তিন মাস অতীত হবার পর ১৯৭৯ সালের ১ মে এই মহান সাধকের শাহাদাতের মর্মন্তুদ ঘটনাটি সংঘটিত হয়। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের চরেরা বিপক্ষ- পূর্বকালের এ মহান চিন্তাবিদ ও দার্শনিককে শহীদ করার মাধ্যমে বিপ্লবের মনীষাকে নস্যাৎ করার জন্য এক গণ্য ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনা পূর্ব থেকেই করেছিল। তাদের সে পরিকল্পনা সার্থক হয়নি। কারণ আয়াতুল্লাহ মুর্তাজা মোতাহারীর যে মনীষা ও বুদ্ধিমত্তা তার জীবদ্দশার চেয়ে শাহাদাতের পরে আরো প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। আর এ কারণেই ইসলামের ইতিহাসের যে কোন গ্রন্থকারের তুলনায় তার গ্রন্থগুলো আজ সর্বত্র বিপুলভাবে পঠিত হচ্ছে।

ইসলামী চিন্তাধারা ও দর্শনের পুনর্জাগরণের লক্ষ্যেই মোতাহারী তার কলম ধরেছিলেন এবং তিনি ইরানের নতুন বংশধরদেরকে জ্ঞান- বিজ্ঞানের এমন অস্ত্রে সুসজ্জিত করেছিলেন যে, তাতে করে তারা বিপথগামী আদর্শ ও মতাদর্শের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে সক্ষম হয়। বিভিন্ন দেশের যুব শক্তিগুলো যাতে ইসলামের মহান শিক্ষার সঙ্গে পরিচিত হয়ে ইসলামী জ্ঞান- বিজ্ঞানের অকাট্য যুক্তিগুলো আত্মস্থ করতে পারে সে জন্য তিনি বিরামহীন চেষ্টা চালিয়েছিলেন।

শহীদ মোতাহারী ছিলেন একজন অসাধারণ প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব। তবে তিনি তার সে প্রতিভাকে শুধু তত্ত্বগত ও শিক্ষায়তনগত পরিমণ্ডলেই নিয়োজিত রাখেন নি- যা জনগণের ওপর কোন প্রকার প্রভাব ব্যতিরেকে শুধু কোন মহান ব্যক্তিত্বের জন্য ব্যক্তিগত সন্তুষ্টির কারণ হতে পারে। তিনি ছিলেন সরল- সহজ প্রকাশভঙ্গির অধিকারী। তবে তাতে তার চিন্তার গাম্ভীর্য আদৌ ক্ষুণ্ন হতো না, এমন কি যুক্তির যথার্থতা বিসর্জন না দিয়ে এবং কোন প্রকার কূটযুক্তি তথা অর্তহীন বাগাড়ম্বরপূর্ণ উক্তি ও কাব্যিক সুর সংযোজন ব্যতীতই তিনি তার সরল- সহজ বক্তব্যকে পাঠকের অন্তরে প্রবেশ করিয়ে দিতে সক্ষম ছিলেন। মোটকথা, ইসলামের মহান ব্যক্তিগণ দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যের মধ্যে দিয়ে যে সব গুণের অধিকারী হয়েছেন তিনিও সে সব গুণের অধিকারী ছিলেন।

শহীদ মোতাহারী তার যুগের যাবতীয় বুদ্ধিবৃত্তিক প্রয়োজন পূরণ করার মতোই এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

তাঁর গ্রন্থগুলো আজ সর্বস্তরের লোকেরাই পাঠ করছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থেকে বিদগ্ধ পন্ডিত সমাজ আজ তার গ্রন্থের সমঝদার পাঠক। আর তারা সকলেই তাদের স্ব স্ব মেধা ও সামর্থ্য অনুযায়ী সে সব গ্রন্থ থেকে অফুরন্ত ফায়দা গ্রহণ করছেন। তার গ্রন্থগুলো পাঠ করা মাত্র যে কোন চিন্তার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সচেতন হতে পারেন- আর এটাই হচ্ছে তার লেখার বিশেষত্ব। আমরা মনে করি তার সমুদয় লেখা বিদেশী ভাষাসমূহে অনূদিত হওয়া প্রয়োজন- যাতে ফাসীর্ভাষা ভাষী নন এমন সব মুসলিম ভাইয়েরাও তার জ্ঞান ও চিন্তাধারার সারবত্তা, মৌলিকতা এবং ব্যাপ্তি ও গভীরতা সম্বন্ধে সম্যক উপলব্ধি করতে পারেন।

মোল্লা সদরের ইন্তেকালের পর (১০৫০ হিজরী) দীর্ঘদিন পর্যন্তইসলামী দর্শন কম-বেশী জড়তাগ্রস্ত থাকার পর শহীদ মোতাহারীর লেখনি শক্তির মাধ্যমেই ইসলামী দর্শন ও চিন্তাধারা আধুনিক ধারায় প্রবেশ করে এবং একটি সতেজ ও গুরুত্বপূর্ণ রূপ লাভ করে। তিনি ইরানের এবং শহীদ আয়াতুল্লাহ বাকের আল সদর ইরাকের মার্কসবাদের ও পুঁজিবাদের অসার যুক্তিগুলোকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেন। শুধু তাই নয়, তারা সাধারণভাবে ইউরোপের আধুনিক দর্শনের গোলমেলে অগ্রগতি, বিশেষ করে মার্কসবাদের মোকাবিলায় ইসলামী দর্শনের অকাট্য ও অপ্রতিহত প্রাধান্য এবং এর আবশ্যিক পবিত্রতা ও সংহতিকে প্রতিষ্ঠিত করেন- যা প্রকৃতপক্ষে একটি অতি প্রাকৃতিক ও জগাখিচুড়িপূর্ণ ঘোলাটে দর্শন এবং যাকে প্রতারণাপূর্ণভাবে 'বৈজ্ঞানিক' এই লেবেল দ্বারা বাজারজাত করানো হয়েছে।

শহীদ মোতাহারীর সংক্ষিপ্ত জীবনী শহীদ মুর্তাজা মোতাহারী ১৯১৯ সালের (হিজরী ১৩৩৮) ২ ফেব্রয়ারী খোরাসান প্রদেশের ফারিমান নামক শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা হুজ্জাতুল ইসলাম মোহাম্মদ হোসাইন মোতাহারী ছিলেন সে যুগের একজন মস্তবড় সাধক ব্যক্তি ও আলেম। ফারিমানে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপণান্তে ১২ বছর বয়সে তিনি মির্জা মেহেদী শহীদী রেজাভীর অধীনে উচ্চতর শিক্ষা অর্জনের লক্ষ্যে মাশহাদের ধর্মতত্ত্ব কেন্দ্রে গমন করেন। অতঃপর

আয়াতুল্লাহ বুরুজারদী, ইমাম খোমেনী ও অন্যান্য মহান শিক্ষক ও চিন্তাবিদদের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা অর্জনের উদ্দেশ্যে তিনি কোমে গমন করেন। তখন তার বয়স ছিল মাত্র ১৮ বছর। হাজী মির্জা আলী আগা শিরাজীর সাথে পরিচিতি তার চিন্তাধারার বিপুল পরিবর্তন ও প্রভাব ঘটায়। এই সময় শহীদ মোতাহারী ইসলামী দর্শনশাস্ত্রে বিশেষভাবে আগ্রহান্বিত হয়ে পড়েন। অতঃপর তিনি ইসলামী আইনের মূলনীতিসমূহ তথা 'ইলমে উসুল' ও ইসলামী আইন বা ফিকাহ্ এই উভয়বিধ শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে ইসলামী দর্শনশাস্ত্রে আত্মনিয়োগ করেন। ঠিক এই সময়ই তিনি কোমের ধর্মতত্ত্ব কেন্দ্রে একজন অন্যতম মেধাবী ছাত্র হিসেবে বিবেচিত হতে থাকেন। শুধু তাই নয়, তিনি ইমাম খোমেনীর একজন অতিশয় প্রিয় ও স্নেহভাজন ছাত্র হিসেবে বিপুল খ্যাতি অর্জন করেন।

অধ্যাপক মোতাহারী আয়াতুল্লাহ মুহাক্কিক, আগা মেহেদী মির্জা আশতিয়ানী, আল্লামা তাবাতাবায়ী ও আয়াতুলাহজ বুরুজারদীর মতো মহান শিক্ষকদের অধীনে অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করেন। আর এভাবেই তিনি উচ্চ শিক্ষা অর্জনে ব্রতী হন। তাঁর সুযোগ্য শিক্ষকদের মধ্যে আর যাদের নাম উল্লেখ করা যায়, তারা হলেন আয়াতুল্লাহ ইয়াসবেরী কাশানী, আয়াতুল্লাহ খোনছারী ও আয়াতুল্লাহ সদর।

উপরে উল্লিখিত তার এ বিদ্যা অভ্যাস থেকে এটাই অনুমান করা যায় যে, মাশহাদে থাকাকালীন তথা যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি ইসলামী দর্শনশাস্ত্রের প্রতি আগ্রহান্বিত হয়ে পড়েন। পরবর্তীকালে অতীতের সে দিনগুলোর কথা স্মরণ করে তিনি বলেন, 'মাশহাদে আমি যখন আরবী ভাষা শিক্ষা শুরু করেছিলাম তখন থেকেই আমি আমার অতীতের কথাটা স্মরণ করতে পারি। আমি যদিও মহান দার্শনিক ও চিন্তাবিদদের দর্শন সম্পর্কে খুব একটা পরিচিত ছিলাম না, তথাপি আমি তখন থেকেই তাদের পান্ডিত্য ও দর্শনের বিশেষ মূল্য দিতে শুরু করি। সুতরাং আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, আবিষ্কারক, উদ্ভাবক, অনুসন্ধানী ও বিজ্ঞানীদের তুলনায় আমি তাদের ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী হয়ে উঠি। আর এ কারণেই আমি তাদেরকে পৃথিবীর চিন্তা রাজ্যের নায়ক বলে মনে করতে লাগলাম'।

আমরা অনায়াসে জানতে পারি যে, কোমে ইমাম খোমেনী এবং পরবর্তী পর্যায়ে ইমাম তাবাতাবায়ীর মতো সুযোগ্য উস্তাদদের অধীনে দীর্ঘ ১৫ বছরকাল অধ্যয়নের পূর্বেই অধ্যাপক মোতাহারী দর্শন শাস্ত্রের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট ও অনুরক্ত হয়ে পড়েছিলেন। ইমাম খোমেনীর নিকট দর্শনশাস্ত্রের পাঠ গ্রহণ করা ছাড়াও তিনি 'ইমামের আখলাক' শীর্ষক ক্লাসগুলোতে নিয়মিত যোগদান করতেন। এতে মনে হচ্ছে যে, বক্তৃতামালা তাঁর ব্যক্তিত্বের বিকাশের ক্ষেত্রে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তিনি নিজেই ইমাম খোমেনীর সে সব বক্তৃতার কথা এভাবে স্মরণ করেছেন :'নীতিজ্ঞান তথা আখলাক সম্পর্কে প্রতি বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক (ইমাম খোমেনী) যে সব বক্তৃতা দিতেন আধ্যাত্মিক পথে পরিচালিত করার লক্ষ্যে তা বিশেষ প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের কাজ করতো। তিনি কোন নির্জীব নীতিশাস্ত্রের শুষ্ক আকৃষ্ট করতো যে, আমি অলক্ষ্যেই যেন তার প্রভাবাধীন হয়ে পড়তাম এবং পরবর্তী সোম ও মঙ্গলবার পর্যন্তত আমার হৃদয়পটে স্থায়ী হয়ে থাকতো। আমি এই আধ্যাত্মিক শিক্ষকের নিকট দীর্ঘ ১২ বছর পর্যন্ত যে সব বক্তৃতার ক্লাসে অংশগ্রহণ করেছিলাম আমার আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনের অধিকাংশ ফসলগুলো তারই ফলশ্রুতি। আমি সব সময়ই আমাকে তার নিকট ঋণী বলে মনে করতাম'।

১৯৪২ সালের গ্রীষ্মকাল। মোতাহারীর জীবনে একটি ঘটনা ঘটে গেল। পরবর্তী পর্যায়ে এই ঘটনাই তাকে বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বে রূপায়িত করে। আর এই ঘটনাটি হচ্ছে মরহুম হাজী মির্জা আলী শিরাজী ইস্পাহানীর সঙ্গে তার সাক্ষাতকার। এই সাক্ষাতকারের মাধ্যমেই তিনি 'নাহজুল বালাগা'র প্রকৃত মূল্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। 'নাহজুল বালাগা' হচ্ছে হযরত আলী (আঃ)- এর বক্তৃতা, পত্রাবলী ও বাণীসমূহের একটি সংকলন। 'নাহজুল বালাগা'র প্রতি তার এই পরিচিতি তার জন্য বিশেষ উপকারী হয়েছিল। এই সময় তিনি এই গ্রন্থ ও এর বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। নাহজুল বালাগার মধ্যে 'ভ্রমণ' নামক গ্রন্থটি হচ্ছে তার কাজের একটি অংশ বিশেষ যা তিনি আরো বর্ধিত কলেবরে বের করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তা করতে সক্ষম হননি।

১৯৪৭ সালের কথা। বস্তুবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত দর্শনশাস্ত্র সম্পর্কে তিনি পড়াশোনা শুরু করেন। যেহেতু দর্শনশাস্ত্রে এমনিতেই তার আগ্রহ ছিল, তাই তিনি অত্যন্ত গভীরভাবে এই বস্তুবাদী দর্শনের উপর অধ্যয়ন শুরু করেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি তার এ পড়াশোনা অব্যাহত রাখেন। তবে তিনি সিয়ামের আধ্যাত্মিক দর্শনের উপর যে বিশেষ বুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন তা ছিল তুলনাহীন, বিশেষ করে মোলাসদরের দর্শনের ব্যাপারে তার জ্ঞান ছিল অপরিসীম। একদিকে ইসলামী দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে তার গভীর জ্ঞান এবং অন্যদিকে পাশ্চাত্য দর্শন ও চিন্তাধারা সম্পর্কে তার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি অর্জন তাকে একটি তুলনামূলক দর্শনশাস্ত্র সৃষ্টির ব্যাপারে সক্ষম করেছিল- যে সম্পর্কে পূর্ব থেকে তার নিকট কোন নজীর বা দৃষ্টান্ত ছিল না। অবশ্য তার পূর্বেই আল্লামা তাবাতাবায়ী পাশ্চাত্য দর্শন ও চিন্তাধারা সম্পর্কে সমালোচনা শুরু করে দিয়েছিলেন। আর তার এ কাজটাই পরবর্তী সময়ে তার বিজ্ঞ ছাত্রগণ একটি নির্দিষ্ট সীমানা পর্যন্তপৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন।

১৯৫১ সালের কথা। আল্লামা তাবাতাবায়ী তুলনামূলক দর্শনশাস্ত্রের পাঠ দান শুরু করেছিলেন। তার প্রদত্ত এসব ক্লাসে উস্তাদ মোতাহারী, শহীদ ড. আয়াতুল্লাহ বেহেশতী, শহীদ ড. বাহোনার এবং আরো অসংখ্য ছাত্র অংশগ্রহণ করেছিলেন। উস্তাদ মোতাহারী এসব বক্তৃতা একটি সংকলনের মাধ্যমে প্রকাশ করেন, যার নাম দেয়া হয়েছিল 'প্রকৃত দর্শনের মূলনীতি ও পদ্ধতি'। তিনি এই সংকলনটিতে অনেক পাদটীকাও সংযোজিত করেছিলেন- যা আল্লামা তাবাতাবায়ীর গ্রন্থের কলেবর থেকে পাঁচ গুণ বড়।

কোমে অধ্যয়নকালে ইরানী সমাজের কতিপয় সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকটের প্রতি তার দৃষ্টি নিবন্ধ হয়। আর এটাই স্বাভাবিক যে, তার মতো একজন ব্যক্তিত্বের পক্ষে ইরান তথা মুসলিম বিশ্বের এ দূরবস্থা অবলোকন করে উদাসীন ও চুপ থাকা সহজ নয়। ইরানসহ মসলিম জাহানের এই করুণ অবস্থা' তাকে বাধ্য করেছিল মুসলমানদের সামাজিক, ধর্মীয়, ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক বিষয়ের ওপর কতিপয় গ্রন্থ রচনা করতে। গ্রন্থ রচনার কথা বাদ দিলেও তিনি ছিলেন একজন সুদক্ষ শিক্ষক এবং অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন একজন বক্তা ও বাগ্মী। একাধারে তার লেখা

ও বক্তৃতা ইরানের নতুন প্রজন্মের চিন্তার ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে এবং পাহলভী বংশের নতুন ঔপনিবেশিক গোষ্ঠী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ধ্বংসাত্মক ও বিশৃঙ্খল সামাজিক পদ্ধতির অসারত্বগুলো খণ্ডন করে- যা মূলত দেশ থেকে ইসলাম, ইসলামী মূল্যবোধ ও সংস্কৃতিকে বিতাড়নের লক্ষ্যে পরিচালিত হচ্ছিল।

১৯৫৩ সালের দিকে অধ্যাপক মোতাহারী তেহরান গমন করেন এবং খোরাসানের একজন প্রসিদ্ধ আলেমের কন্যাকে বিয়ে করেন। এর এক বছর পরে তথা ১৯৫৪ সালে তিনি আল্লামা তাবাতাবায়ীর বক্তৃতামালা 'প্রকৃত দর্শনের মূলনীতি ও পদ্ধতি' নাম দিয়ে প্রকাশ করেন। ১৯৫৬ সালে তাকে তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মতত্ত ও ইসলামী বিজ্ঞান শিক্ষাদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। তিনি সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং দীর্ঘ ২২ বছর যাবত সেখানে শিক্ষা দানে ব্যাপৃত ছিলেন। এই সময় তিনি ইরানী সমাজের নতুন প্রজন্মের নিকট সুযোগ্য ও মহান শিক্ষক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। ধর্মীয় ও বদ্ধিজীবীবৃন্দ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের সাথে যারা বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্য সম্পর্কে পুরোপুরি অজ্ঞ ও বিচ্ছিন্ন ছিলেন এবং আদর্শ ও চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে পড়েছিলেন, যোগাযোগের নিমিত্তে বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি সমরক্ষেত্র হিসেবে গ্রহণ করেন।

১৯৫৮- ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সময়ে এমন কি তার পরেও মুসলিম ডাক্তারদের সমিতি কর্তৃক বক্তৃতা দানের জন্য তিনি আমন্ত্রিত হন। এই সময়ে রচিত তার গ্রন্থগুলো মূলত সে সব বক্তৃতাকে ভিত্তি করে লেখা হয়েছিল। তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান ও উপস্থিতি তাকে কোমের ধর্মকেন্দ্র ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একটি যোগসূত্র প্রতিষ্ঠায় সক্ষম করেছিল। কোমের এই বিশ্ববিশ্রুত ধর্মকেন্দ্র ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যোগাযোগ ও যোগসূত্র রচনায় মোতাহারী কঠোর পরিশ্রম করেন। এই ধর্মীয় শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে পরিচালিত ইসলামী বিজ্ঞান সম্বন্ধে অধ্যয়ন করার জন্য তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপুল সংখ্যক ছাত্র ও গ্রাজুয়েটকে উদ্বুদ্ধ করেন।

এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ কিছু সংখ্যক মার্কসবাদীর উপস্থিতি লক্ষ্য করে তিনি মার্কসবাদের অজ্ঞোনিকতা ও ভ্রম সম্বন্ধে কলম ধরতে বাধ্য হন। ধর্মীয় ও দার্শনিক মতামত এবং যুক্তিতর্ক

শোনা ও বোঝার ব্যাপারে তার অপরিসীম দক্ষতা ছিল। তাই তিনি তার গ্রন্থাবলীতে প্রতিপক্ষের যুক্তিতর্কগুলোর বিরুদ্ধে সমালোচনা করার পূর্বে সেগুলোকে যথার্থ ও সুন্দররূপে বর্ণনা ও মূল্যায়ন করার প্রয়াস পান।

শাহের নব্য ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে ১৯৬৩ সালের ৫ জুন যে রক্তাক্ত গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়, ঠিক তখন থেকেই উস্তাদ মোতাহারীর রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার গুরুত্বপূর্ণ উন্মেষ ঘটে। সেই সময়কার সকল ইসলামী চিন্তাবিদগণ ইমাম খোমেনীর নেতৃত্বে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এই সময় তাদের অধিকাংশই গ্রেফতার ও কারারুদ্ধ হন। উস্তাদ মোতাহারীও গ্রেফতার হন এবং ৫ জুনের মধ্যরাতে তাকে জেলে পাঠানো হয়। এরপর জনগণের অব্যাহত চাপ ও আলেম সমাজের প্রচেষ্টায় তিনি কারামুক্ত হন।

ইমাম খোমেনী তখন জেলে। জনগণ তাদের প্রিয় নেতার সান্নিধ্য ও হেদায়েত থেকে বঞ্চিত হলো, ঠিক এই সময় অধ্যাপক মোতাহারী ব্যক্তিগতভাবে বিপ্লবের সুকঠিন দায়িত্ব তার স্কন্ধে তুলে নেন।

১৯৬৪ সালের কথা। ইমাম খোমেনীকে তুরস্কে নির্বাসনে পাঠানো হয়। ইরানের আলেম সমাজ তখন তাদেরকে সুসংগঠিত করার কাজে ব্যস্ত। পরিশেষে তারা ইসলামী চিন্তাবিদ ও আলেমদের সমন্বয়ে একটি বিপবী ও জেহাদী মোর্চা গঠন করেন। আর ইমামের প্রতিনিধি হিসেবে মোতাহারী এই বাহিনীর একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হন। অতঃপর ১৯৬৪-১৯৭৭ পর্যন্তইসলামী বিপবী বাহিনীকে একনায়ক পাহলভী প্রশাসনের বিরুদ্ধে যে মরণ সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয় উস্তাদ মোতাহারী সে বিপবী বাহিনীকে পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। আসলে ইমাম খোমেনীই তাকে এ দায়িত্ব অর্পণ করেন।

১৯৭৮ সাল। বিপ্লবের অগ্নিশিখা তখন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে। এই সময় শিক্ষাবিদ অধ্যাপক মোতাহারীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞাও চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি দৃঢ়তার সাথে নেতৃত্ব দেন। আর এই সময়ই তিনি ইমাম খোমেনীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য প্যারিস গমন করেন। প্যারিসে অবস্থানকালে ইমাম খোমেনী তাকে বিপবী কাউন্সিল গঠনের পরামর্শ দেন। ইমামের

তেহরান প্রত্যাবর্তনের পর তিনি তার সান্নিধ্যেই অবস্থান করেন এবং তার একজন উপদেষ্টা হিসেবে সার্বিক সহযোগিতা করেন।

১ মে ১৯৭৯। গভীর রাতে উস্তাদ মোতাহারী তার এক বন্ধুর বাসা থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈঠক শেষে ঘরে ফিরছিলেন। ফেরার পথে 'ফোরকান' নামক একটি খোদাদ্রোহী তথা নাস্তিক গ্রুপের জনৈক সদস্য তার উপর অতর্কিত হামলা চালায় এবং তাকে হত্যা করে।

উস্তাদ মোতাহারী শাহাদত বরণ করলেন। কিন্তু ইসলামের পুনর্জাগরণের লক্ষ্যে যে নিরলস কর্মপ্রবাহ রেখে গেছেন তা তাকে যুগ যুগ ধরে চিরঞ্জীব করে রাখবে। সবচেয়ে বড় কথা ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার জন্য তার যে স্বপ্ন তা তার জীবদ্দশায়ই সাফল্য অর্জন করে এবং তিনি তা দেখে যেতে সক্ষম হন। তার শহীদী আত্ম চির শান্তিতে থাকুক এবং সুউচ্চ মর্যাদা লাভ করুক।

১

রাসূলে আকরাম ও দু (সাঃ)'দল মুসলমান

রাসূলে আকরাম (সাঃ) মসজিদে নববীতে[১] গেলেন। দেখলেন দু'দল লোক গোল হয়ে বসে কোন কাজে লিপ্ত আছে। একদল আল্লাহ্‌র যিকির- আযকার ও ইবাদত- বন্দেগী করছিল। আরেক দল লোক (ইসলামী) শিক্ষা- দীক্ষার কাজে মশগুল ছিল। রাসূল (সাঃ) দু'দলকেই দেখে খুশি হলেন এবং তাঁর সাথের লোকদেরকে বললেন, "এ দু'দল লোকই ভালো কাজে লিপ্ত আছে এবং দু'দলের অন্তর্ভুক্ত সকল লোকই উত্তম ও পূণ্যবান।" তারপর তিনি আরো বললেন, "কিন্তু আমাকে পাঠানো হয়েছে লোকদেরকে শিক্ষা দিয়ে জ্ঞানী করে গড়ে তোলার জন্য"। এ কথা বলেই তিনি সে দলের দিকে এগিয়ে গেলেন যারা শিক্ষা দান ও গ্রহণের কাজে ব্যস্তছিলেন। সেখানে গিয়ে তিনিও তাদের সাথে বসলেন এবং শিক্ষা দানের কাজে লেগে গেলেন।[২]

২

সাহায্যপ্রার্থী এক ব্যক্তি

তিনি তার পেছনের দিনগুলোর দিকে ফিরে তাকালেন। তার মনে পড়ছিল কতই না কষ্ট- ক্লেশের মধ্য দিয়ে তার দিনগুলো কাটিয়েছেন। সে দিনগুলো তার এমন মন্দ কেটেছে যে, সারাদিন চেষ্টা করেও তিনি তার স্ত্রী ও নিষ্পাপ শিশুদের পেট ভরে খাবার যোগাড় করতে পারতেন না। মনে মনে তিনি একটি কথা চিন্তা- ভাবনা করতেন। যে কথাটি তার মনের মধ্যে জাগরণ এনে দিয়েছিল সে একটি মাত্র কথাই তার অন্তরে এক অসাধারণ শক্তি যুগিয়েছিল। সে কথাটিই তার জীবনে এনে দিয়েছিল এক বিপ্লব। বদলে দিয়েছিল তার দুর্দিনকে সুদিনে। কাল যে পরিবারটি সীমাহীন অভাব- অনটন আর সহায়- সম্বলহীন থাকার কারণে লজ্জা ও লাঞ্ছনার জীবন যাপনে বাধ্য হয়েছিল, সে পরিবারটিই আজ একটি মাত্র কথার বরকতে সুখ স্বাছন্দের জীবন যাপন করতে লাগলো।

তিনি আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সাঃ)- এর একজন সাহাবী। অভাব- অনটন আর দারিদ্র্য তার উপর ছেয়েছিল। একদিন তিনি যখন দুঃখ- কষ্টে অতিষ্ঠ হয়ে গিয়েছিলেন। তখন তার স্ত্রী তাকে পরামর্শ দিলেন, "আপনি আপনার এ দুঃখ- কষ্টের কথা আল্লাহর নবী (সাঃ)- এর কাছে গিয়ে বলুন"। স্ত্রীর পরামর্শে রাজী হয়ে স্থির করলেন যে, তিনি রাসূলের খেদমতে হাজির হয়ে নিজের অভাব- অনটনের কথা বলবেন এবং তার কাছ থেকে টাকা- পয়সা সাহায্য চাইবেন।

সুতরাং তিনি তার মনের সংকল্প নিয়ে মহানবী (সাঃ)- এর দরবারে হাজির হলেন। কিন্তু তিনি তার সাহায্য চাওয়ার আগেই রাসূলের মুখ থেকে একটি কথা শুনতে পেলেন। রাসূল (সাঃ) বললেন, 'যে ব্যক্তি আমার নিকট সাহায্য চাইবে আমি তাকে সাহায্য করবো। কিন্তু যদি কোন লোক আল্লাহর সৃষ্টি কোন মানুষের কাছে হাত পাতা থেকে বেঁচে থাকে তাহলে আল্লাহ তার অভাব মোচন করে দিবেন। এ কথা শুনে তিনি রাসূলের কাছে আর কিছু চাইতে পারলেন না এবং বাড়িতে ফিরে এলেন। ঘরে এসে দেখলেন যে, আগের মতোই দারিদ্র্য ও অভাবের পরিবেশ

ছেয়ে আছে। বাধ্য হয়ে দ্বিতীয় দিন আবার সে সংকল্প নিয়েই রাসূলের খেদমতে উপস্থিত হলেন। এ দিনও তিনি রাসূলের মুখে একই কথা শুনতে পেলেন। রাসূল (সাঃ) বললেন, 'যে ব্যক্তি আমার নিকট সাহায্য চাইবে আমি তাকে সাহায্য করবো। কিন্তু যদি কোন লোক আল্লাহর বান্দার সামনে হাত পাতা থেকে বেঁচে থাকে তাহলে সত্য সত্যই আল্লাহ তাকে অপরের মুখাপেক্ষী করে রাখবেন না'। এবারও তিনি তার মনের কথা না বলে বাড়ি ফিরে এলেন। কিন্তু ঘরের মধ্যে বিরাজমান সে অভাব- অভিযোগ ও দারিদ্র্য লেগেই আছে। সীমাহীন দুঃখ- কষ্ট ও অসহায় অবস্থা তাকে আবারও রাসূলের কাছে যেতে বাধ্য করলো। তাই সাহায্য প্রার্থনার প্রবল ইচ্ছা নিয়েই তিনি আবার মহানবীর নিকট গেলেন। এবারও তিনি রাসূলের কাছ থেকে একই কথা শুনতে পেলেন। আল্লাহর নবী (সাঃ) পূর্বের মতোই সে কথাটি আবার তাকে শোনালেন।

এবার রাসূল (সাঃ)- এর মুখ থেকে সে কথাটি শোনার পর তিনি তার অন্তরে পরম প্রশান্তিবোধ করলেন। তিনি উপলব্ধি করতে লাগলেন যেন এই একটি মাত্র কথাই তার জীবনের সমস্ত দুঃখ- কষ্ট দূর করার চাবিকাঠি। এবারে তিনি যখন রাসূলের (সাঃ) দরবার থেকে উঠে যেতে লাগলেন তখন তার মনের মধ্যে অসীম প্রশান্তি অনুভব করছিলেন। তার অন্তরে অত্যন্ত শান্তিও স্বস্তিনিয়ে তিনি নিজের বাড়ির দিকে এগিয়ে চললেন। আর মনে মনে ভাবতে লাগলেন, 'আগামীতে আর কোনদিন কারো সামনে হাত পাতবেন না। যদি কারো কাছে কিছু চাইতেই হয় তাহলে নিজের প্রভু আল্লাহর কাছে চাইবেন। আর তাঁরই উপর ভরসা রেখে নিজের বাহুবলে কাজ করবেন। তিনিই আমাকে সফলতা দান করবেন এবং আমাকে সকল প্রকারের হাত পাতা থেকে রক্ষা করবেন'।

মনে মনে ভাবতে লাগলেন, আমার দ্বারা কোন কাজ সম্ভব? তার মনে হলো, আপাততঃ তিনি জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে এনে বাজারে বিক্রি করবেন। এ কথা ভেবে- চিন্তে তিনি তার প্রতিবেশীর কাছ থেকে একটা কুঠার ধার নিলেন এবং জঙ্গলে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পরিশ্রম করে তিনি অনেক লাকড়ি জমা করলেন আর তা এনে বাজারে বিক্রি করলেন। এভাবে তিনি দেখতে পেলেন তার পরিশ্রমের ফল খুবই ভালো। তাই তিনি তার এ কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। ধীরে ধীরে

তিনি তার আয় দ্বারা একটি কুঠার কিনলেন। এরপর আরো কিছু দিনের আয় জমা করে কয়েকটি পশু ও ঘরের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনলেন। কিন্তু তিনি বনে গিয়ে কাঠ কেটে আনা ও বিক্রি করা চালিয়ে যেতে থাকলেন। এভাবে অল্প কিছু দিনের মধ্যেই তিনি একজন ধনী ব্যবসায়ী হয়ে গেলেন। তখন গোলাম (চাকর) ইত্যাদি মালিক হলেন।

একদিন রাসূলে আকরাম (সাঃ) তাঁর কাছে গেলেন এবং মুচকি হেসে বললেন, 'কি? আমি বলি নি? যে ব্যক্তি আমার নিকট সাহায্য চাইবে আমি তাকে সাহায্য করবো। কিন্তু যদি কোন লোক অপরের সামনে হাত পাতা থেকে বেঁচে থাকে তাহলে মহান আল্লাহ্ তাকে অপরের মুখাপেক্ষী হওয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখেন।'[৩]

৩

দোয়ার আবেদন

এক ব্যক্তি খুবই উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার সাথে ইমাম জা'ফর সাদিক (আঃ)- এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললো, 'আমি খুব দরিদ্র ও অভাবী মানুষ। আপনি আমার জন্য দোয়া করুন যেন আল্লাহ আমার রিযিক বাড়িয়ে দেন। আর আমি যেন সমস্ত দুঃখ- কষ্ট থেকে মুক্তি লাভ করতে পারি'।

ইমাম সাদিক (আঃ) বললেন :

'আমি তোমার জন্য কখনো এমন দোয়া করবো না'।

লোকটি একটা চাপা নিঃশ্বাস নিয়ে বললো :

'হে ইমাম! কি কারণে আপনি আমার জন্য দোয়া করবেন না'?

জবাবে ইমাম (আঃ) বললেন :

'তুমি খুব ভালভাবেই জানো যে, মহান আল্লাহ এ ব্যাপারে একটা পন্থা নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। তিনি হুকুম দিয়েছেন যে, জীবিকা অর্জনের জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ো এবং পরিশ্রম করো। কিন্তু তুমি চাচ্ছো যে, ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে জীবিকা অর্জনের পরিবর্তে দোয়ার দ্বারা রিযিক ঘরে ডেকে আনবে'।[৪]

৪

উটের কোমর বাঁধা

কাফেলাটি বহুক্ষণ পথ চলেছিল। সকলের চেহারাতেই ক্লান্তির ছাপ। বহনকারী পশুগুলোও। ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। এমন একটি স্থানে উপস্থিত হলো যেখানে কিছু পানি ছিল। কাফেলা থেমে গেল। রসুলুলাহ (সাঃ) ও এ কাফেলার সাথে ছিলেন। তিনিও উটের পিঠ থেকে নেমে এলেন। সকলেই চেষ্টা করছিল যে, তাড়াতাড়ি পানির কাছে গিয়ে অযু ইত্যাদি সেরে নামাযের জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

মহানবী (সাঃ)ও নামার পর পানির দিকে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু কয়েক ধাপ চলার পর কাউকে কিছু না বলে আবার নিজের উটের দিকে ফিরে এলেন। রাসূলের সাহাবী ও সাথীগণ আশ্চর্য হয়ে পরস্পরে বলাবলি করতে লাগলেন যে, মনে হয় যাত্রা বিরতির জন্য এ স্থানটি আল্লাহর নবীর পছন্দ হয়নি। এখনই হয়তো রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দেবেন। সকলেই রাসূলের দিকে তাকিয়ে থাকলেন এবং নতুন হুকুমের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। লোকেরা আরো অধিক আশ্চর্য হলেন তখন, যখন তারা দেখলেন যে, মহানবী (সাঃ) নিজের উটের কোমরবন্ধনী (উটের কোমর বাঁধার রশি বিশেষ) হাতে নিলেন এবং নিজের উটের কোমর বাঁধতে শুরু করলেন। তাড়াতাড়ি বাঁধার কাজ শেষ করে তিনি আবার পানির দিকে গেলেন।

চারদিক থেকে লোকেরা এসে বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এ কাজের জন্য আমাদেরকে কেন হুকুম দিলেন না? আপনি কেন এ কাজটি করতে গেলেন? এ কাজটির জন্য আপনি আবার ফিরে গেলেন। আমরা তো অত্যন্তগর্বের সাথে এ কাজটি করার জন্য প্রস্তুত ছিলাম’।

প্রিয় নবী (সাঃ) তাদের কথার জবাবে বললেন, ‘নিজের কাজে কখনো অপরের সাহায্য নেয়া উচিত নয়। আর কারো ভরসা করাও ঠিক নয়। সেটা একটি মেসওয়াকের ব্যাপারই হোক না কেন

অর্থাৎ কাজটি ছোট হোক অথবা বিরাট, অপরের ভরসায় বসে থাকার চেয়ে নিজেই করা উচিত'।[৫]

৫

হজ্বের সফর সঙ্গী

হজ্ব থেকে ফিরে এসে এক ব্যক্তি তার নিজের ও তার সঙ্গীদের হজ্বের সফরের কাহিনী ইমাম জা'ফর সাদিক (আঃ)- কে বর্ণনা করছিল। সে তার সাথীদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তির বিশেষ প্রশংসা করছিল। সে বলতে লাগলো যে, 'প্রকৃতপক্ষেই সে ব্যক্তিটি খুবই মোত্তাকী- পরহেযগার ও অত্যন্ত ইবাদতকারী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সব সময়ই মহান আল্লাহর ইবাদত- বন্দেগীতে কাটিয়েছেন। আমরা যখনই কোথাও রাত্রি যাপন করার উদ্দেশ্যে যাত্রা বিরতি করতাম তখনই তিনি এক কিনারে চলে যেতেন এবং সাথে সাথেই জায়নামায বিছিয়ে আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন হয়ে যেতেন।

ইমাম সাদিক (আঃ) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন : 'তার কাজ- কর্মগুলো আঞ্জাম দিত কে? কে তার জন্তুটির দেখাশোনা করতো'?

জবাবে লোকটি বললো : 'তার সমস্তকাজগুলো করে দেবার সৌভাগ্য আমাদেরই হয়েছিল। তিনি তো শুধু তাঁর নেক আমলের কাজগুলোতে ব্যস্ত থাকতেন। এসব কাজের প্রতি তার কোন মনোযোগ ছিল না।

ইমাম (আঃ) বললেন, 'এ কারণেই তোমরা সকলে উক্ত মোত্তাকী পরহেযগার ও ইবাদতকারীর চেয়ে অধিক উত্তম'।

৬

বনভোজন

হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) ও তাঁর সঙ্গী দল নিজ নিজ বাহনের পিঠ থেকে নিচে নামলেন। মাল সামানগুলোকে খুলে মাটিতে রাখলেন। তারপর সকলে মিলে ঠিক করলেন যে, একটি দুম্বা জবাই করে খাবার তৈরী করা হবে।

একজন সাহাবী বললেন, ‘দুম্বা জবাই করা আমার দায়িত্বে রইলো’।

আরেকজন বললেন ‘দুম্বার চামড়া ছাড়ানো এবং গোশত কাটার দায়িত্ব আমার।

তৃতীয় জন বললেন, ‘গোশত রান্না করার দায়িত্ব আমার।

চতুর্থ জন বললেন,

রসুলুলাহ (সাঃ) বললেন, কাঠ কুড়িয়ে আনার দায়িত্ব আমার।

সকল সাহাবী এক সাথে বলে উঠলেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমরা উপস্থিত থাকতে আপনি কষ্ট করবেন কেন? আপনি বিশ্রাম নিন। আমরা গর্বের সাথে সমস্ত কাজ ঠিকঠাক সেটে নিব।। রাসূল (সাঃ) বললেন, ‘আমি জানি এ কাজ তোমরা করে নিতে পারবে। কিন্তু মহান আল্লাহ সে বান্দাকে কখনো ভালোবাসেন না যে নিজের বন্ধুদের মাঝে নিজেকে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম মনে করে এবং নিজেকে অপরের চেয়ে বিশেষ ব্যক্তিত্ব জ্ঞান করে’।[৬] এ কথা বলে তিনি বনের দিকে চলে গেলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যে জ্বালানী কাঠ ও খড়- কুটো নিয়ে ফিরে এলেন।[৭]

৭

হজ্বযাত্রী এক কাফেলা

মুসলমানদের একটি কাফেলা মক্কা যাচ্ছিল। মদীনা পৌঁছেই কাফেলার লোকেরা কয়েক দিনের জন্য যাত্রা বিরতি করলো। কয়েক দিন বিশ্রাম গ্রহণের পর তারা আবার মদীনা থেকে মক্কার দিকে রওয়ানা হলো।

মক্কা ও মদীনার মাঝে এক স্থানে এসে কাফেলা আবার বিশ্রাম গ্রহণের জন্য যাত্রা বিরতি করলো। এ সময় কাফেলার লোকদের সাথে এমন এক ব্যক্তির সাক্ষাত ঘটলো যিনি কাফেলার সকল লোককে চিনতেন ও জানতেন। লোকটি যখন কাফেলার লোকদের সাথে আলাপ- আলোচনায় লিপ্ত তখন তাঁর দৃষ্টি গিয়ে পড়লো এমন এক ব্যক্তির উপর যিনি অত্যন্তহাসি মুখে কাফেলার লোকদের খেদমতে ব্যস্তছিলেন। লোকটি প্রথম দৃষ্টিতেই সে ব্যক্তিকে চিনতে পারলেন, যিনি খুব আনন্দমনে লোকদের খেদমত করে চলছিলেন। তাই অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে কাফেলার লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তোমরা কি এ ব্যক্তিকে চেনো যিনি তোমাদের খেদমতে লেগে আছেন’? জবাবে তারা বললো, ‘না, আমরা এ লোকটিকে মোটেই চিনি না। এ লোকটি তো মদীনা থেকে আমাদের কাফেলার সাথে শামিল হয়েছে। তবে এ কয়েক দিনের সফরের সাথী হিসেবে এতোখানি বলতে পারি যে, এ লোকটি একজন সৎ লোক এবং অত্যন্ত মোত্তাকী- পরহেযগার। আমরা তাকে বলিনি, আমাদের কাজ করে দাও। কিন্তু সে নিজেই অপরের খেদমতে লেগে আছে এবং সকলেরই সাহায্য- সহযোগিতা করে চলছে’।

কাফেলার লোকদের বন্ধুটি বললেন, ‘আমি জানি তোমরা তাকে মোটেও চেনো না। যদি তোমরা তাকে চিনতেই পারতে তাহলে কখনও এমন অপরাধজনক কাজ করতে পারতে না যে, একজন সাধারণ খাদেমের ন্যায় তোমাদের খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যেতে থাকবেন তিনি’। এ কথা শুনে সকলে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, ‘তিনি কে’?

লোকটি বললেন, 'তিনি হলেন আলী ইবনুল হোসাইন (আঃ) অর্থাৎ ইমাম যয়নুল আবেদীন (আঃ)'।

এ কথা শুনেই কাফেলার সমস্তলোক হতবাক হয়ে গেল এবং ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য অত্যন্ত আদবের সাথে ইমামের হাতে চুমু খাওয়ার আশায় তাঁর দিকে এগিয়ে গেল। সমস্তলোক ইমামের সামনে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে অনুযোগের সুরে বলতে লাগলো, 'হে ইমাম! আপনি আমাদের সাথে এমনটি কেন করলেন? সম্ভাবনা ছিল যে, আমরা অজ্ঞতাবশত আপনার সাথে মারাত্মক কোন অপরাধ করে বসতাম তাতে আমরা বড় গুণাহগার- পাপী হতাম'।

ইমাম বললেন, 'যেহেতু তোমরা কেউ আমাকে চিনতে না, এ জন্যই আমি তোমাদের সফর সঙ্গী হয়েছি। কেননা আমি যখন চেনা- জানা লোকদের সাথে সফর করি তখন লোকেরা রাসূলে খোদা (সাঃ)- এর খাতিরে আমাকে অত্যন্ত ভালোবেসে আমার সাথে সদয় আচরণ করে। আর তারা আমাকে ছোটখাটো কোন কাজও করতে দেয় না। এ জন্যই আমি সফরের জন্য এমন একটি কাফেলা বেছে নিয়েছি যাদের কেউ আমাকে চেনে না যাতে করে আমি নিজের কাজ নিজেই আঞ্জাম দিতে পারি। আর আমি লোকদের কাছে আমার পরিচয় এজন্য গোপন রেখেছি যাতে করে আমি আমার সাথীদের খেদমত করার সুযোগ লাভ করতে পারি'।[৮]

৮

এক মুসলমান ও এক আহলে কিতাব

সে সময় কুফা নগরী ছিল ইসলামী শাসনেরা প্রাণকেন্দ্র। সিরিয়া ছাড়াও ইসলামী সাম্রাজ্যের অন্য সকল স্থানের সকল লোকের নজর তখন সে নগরীর দিকেই নিবন্ধ থাকতো এ জন্য যে, সেখান থেকে কখন কোন নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ হুকুম জারী করা হয়।

এ শহর থেকে অনেক দূরে দুই ব্যক্তির সাথে রাস্তায় দেখা হলো। একজন মুসলমান আর অপরজন আহলে কিতাব (আহলে কিতাব মানে ইয়াহুদী বা খ্রিস্টান কিংবা যারথুস্ত্রীয়)। দুই জনেই একে অপরের গন্তব্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো। জানা গেল যে, মুসলমান লোকটি কুফা শহরে যাবে। আর আহলে কিতাব লোকটি কুফার নিকটেই অন্য এক স্থানে যাবে। দুইজনে মিলে স্থির করলে যে, তারা এক সাথে সফর করবে। কেননা, অনেক দূর পর্যন্ত দুইজনের রাস্তা একই। এক সাথে কথাবার্তা বলতে বলতে পথ চলা যাবে।

দুজনের আন্তরিক আলাপ- আলোচনা ও বিভিন্ন কথাবার্তার মধ্য দিয়ে পথ শেষ হয়ে এলো। অবশেষে তারা একটি দুই রাস্তার মোড়ে এসে উপস্থিত হলো যেখান থেকে দু'জনের রাস্তা দু'দিকে চলে গেছে। আহলে কিতাব লোকটি তার নিজের পথ ধরে চলতে লাগলো। কিছু দূর পথ চলার পর পিছনে ফিরে তাকিয়ে সে অবাক হয়ে গেলো। সে দেখতে পেলো তার মুসলমান বন্ধুটি কুফার দিকে না গিয়ে তারই পিছে পিছে চলে আসছে। এ অবস্থা দেখে সে দাড়িয়ে গেল এবং তার মুসলমান বন্ধুটিকে জিজ্ঞাসা করলো : 'কি ভাই! তুমি না বলেছিলে যে, তুমি কুফা যাবে'?

জবাবে মুসলমান বন্ধুটি বললো, 'আমি তো এখনো বলছি যে, আমি কুফা যাবো'।

আহলে কিতাব লোকটি বললো, 'তাহলে তুমি এদিকে আসছো কেন? এটা তো কুফার রাস্তা নয়। কুফা যাবার রাস্তা তো ঐটা।

মুসলমান বন্ধুটি বললো, 'আমি জানি। কিন্তু আমার মন চাইলো যে, কিছু দূর পর্যন্তআমি তোমার সঙ্গ দেবো। কেননা আমাদের নবী বলেছেন 'যখন দু'ব্যক্তি এক সাথে আলাপ- আলোচনার মধ্য

দিয়ে পথ চলে তখন একে অপরের প্রতি অধিকার লাভ করে। এখন তোমারও আমার ওপর। সতরাং আমি অধিকার রয়েছে। আমি সে অধিকার আদায় করার উদ্দেশ্য কিছু দূর পর্যন্ততোমার সাথে চলতে চাই। এরপর তো আমি আমার পথেই ফিরে যাবো'।

আহলে কিতাব বললো, 'ওহ্! তোমাদের নবী যে মানুষের উপর এতোই প্রভাব বিস্তার করেছিলেন এতো দ্রুত বিশ্বে প্রসার লাভ করেছি, এটা নিশ্চয় তাঁর এই উত্তম চরিত্রেরই গুণে ছিল।'

আহলে কিতাব লোকটি আরো বেশী অবাক হলো তখন যখন সে জানতে পারলো যে, তার সফর সঙ্গী মুসলমান বন্ধুটি আর কেউ নন, বরং মুসলিম মিলাতের বর্তমান খলিফা হযরত আলী ইবনে আবী তালিব (আঃ)। তৎক্ষণাত সে আহলে কিতাব লোকটি ইসলাম গ্রহণ করে মসলমান হয়ে গেল এবং হযরত আলীর একজন বিশ্বস্তও অনুগত সাহাবীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলো। [৯]

৯

খলিফার সান্নিধ্যে

হযরত আলী (আঃ) কুফার দিকে আসছিলেন। পথে 'আম্বার' নামক এক শহরে উপস্থিত হলেন। যেখানকার বেশীর ভাগ অধিবাসী ছিল ইরানী। ইরানী কৃষক ও মাতব্বররা যখন জানতে পারলো যে, তাদের প্রিয় খলিফা তাদেরই শহর দিয়ে অতিক্রম করবেন তখন তাদের আর আনন্দের সীমা রইলো না। সকলে তাদের খলিফাকে স্বাগতম ও খোশ আমদেদ জানাবার জন্য দৌঁড়ে এলো। হযরত আলী (আঃ)- এর বাহন যখন এগিয়ে চললো তখন লোকেরাও বাহনের আগে আগে দৌঁড়াতে লাগলো। হযরত আলী (আঃ) নিজের বাহন থামিয়ে দিয়ে লোকদেরকে ডেকে পাঠালেন। লোকেরা যখন তার কাছে এলো তখন তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা এভাবে দৌঁড়াদৌড়ি করছো কেন? এভাবে দৌঁড়াদৌঁড়ির পেছনে তোমাদের উদ্দেশ্য কি'?

লোকেরা বললো, 'আসলে এটা শাসকবর্গ ও সম্মানিত ব্যক্তিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের একটা রীতি। বহুকাল আগ থেকে প্রচলিত আমাদের একটি প্রথা'।

হযরত আলী (আঃ) তাদেরকে বললেন, 'তোমাদের এ কাজ দুনিয়াতে তোমাদেরকে কষ্ট দিচ্ছে আর পরকালেও এর কারণে অনেক শাস্তিভোগ করতে হবে। এমন কাজ কখনো করবে না, যা তোমাদের অপমান ও লাঞ্ছনা ডেকে আনে। আর তোমরাই দেখো যে, তোমাদের এ কাজের দ্বারা তোমাদের ১ নেতা ও অমীরেরই বা কি লাভ হয়?[১০]

১০

ইমাম বাক্বের ও এক খ্রিস্টান (আঃ)

ইমাম বাক্বের (আঃ)। নাম মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনিল হোসাইন (আঃ)। যার উপাধি ছিল 'বাক্বের'। বাক্বের শব্দের আভিধানিক অর্থ ভাগ- বিশেষণকারী। তাকে বলা হতো 'বাক্বেরুল উলুম' যার অর্থ হচ্ছে জ্ঞান- বিজ্ঞানের ভাগ- বিশেষণ ও ব্যাখ্যাকারী।

এক খ্রিস্টান 'বাক্বের' শব্দের বিকৃত উচ্চারণ করে ইমামের সাথে ঠাট্টা- বিদ্রুপ করতে চাইলো। সে ইমামকে উদ্দেশ্যে করে বললো, '[আনতা বাক্বার] অর্থাৎ তুমি গাভী'।

ইমাম কোন প্রকার অসন্তুষ্টি বা রাগান্বিত না হয়ে অত্যন্তসরল ও সহজ ভাষায় বললেন, 'না ভাই! আমি বাক্বার (গাভী) নই। আমি বাক্বের (বিশেষণকারী)'।

অতঃপর খ্রিস্টান লোকটি বললো, 'তুমি একটা রাঁধুনির ছেলে। ইমাম বললেন, এটা তার পেশা ছিল।এতে কোনো লজ্জা বা ঘৃণার কিছু নেই।

খ্রিস্টান লোকটি আরো বললো, 'তোমার মা ছিল কালো কুৎসিত। তার লজ্জা- শরম কিছুই ছিল না। আর তার ভাষাও ছিল বিশ্রী'।

এবারও ইমাম অত্যন্তসহজ- সরল ভাষায় বললেন, 'আমার মাতা সম্পর্কে তুমি যে সব অপবাদ দিচ্ছো তা যদি সত্য হয় তাহলে মহান আল্লাহ যেন তার গুণাহ খাতা মাফ করে দেন। আর যদি মিথ্যা হয় তাহলে যেনো তোমার অপরাধ ক্ষমা করে দেন। কেননা কারো সম্পর্কে মিথ্যা অপবাদ দেয়া বড়ই গুণাহের কাজ'।

একজন মানুষ যার জন্যে ইসলামের বহির্ভূত একজন লোককে শাস্তি দেয়ার সব ধরনের সামর্থ্য তার ছিল, অথচ এতটা ধৈর্য্য ধরলেন। এটুকুই ঐ খ্রিস্টান লোকটির মনের ভেতরে বিপ্লব সংঘটনের জন্য এবং তাকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য যথেষ্ট ছিল।

পরবর্তীতে খ্রিস্টান লোকটি মসলমানু হয়।

১১

এক আরব বেদুঈন ও রাসূলে আকরাম (সাঃ)

এক আরব বেঈদুন মদীনা শহরে এসে সোজা মসজিদে নববীতে চলে গেল। তার উদ্দেশ্য ছিল মহানবী (সাঃ)- এর কাছ থেকে সোনা- দানা টাকা- পয়সা নিবে। সে সময় প্রিয় নবী (সাঃ) তাঁর সাহাবীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন। বেদুঈন লোকটি রাসূলে আকরাম (সাঃ)- এর সামনে এসে তার আরজ পেশ করলো এবং তাকে কিছু দান করার জন্য আবেদন জানালো। আল্লাহর নবী (সাঃ) তাকে কিছু দান করলেন। কিন্তু তাতে সে সন্তুষ্ট হলো না। সে রাসূলের (সাঃ) দানকে সামান্য গণ্য করলো। তাছাড়া সে কিছু বিশ্রী শব্দ ব্যবহার করে রাসল (সাঃ) এর প্রতি বেয়াদবি করলো। এ অবস্থা দেখে রাসূল (সাঃ) এর সাহাবীরা প্রচণ্ড রেগে গেলেন এবং ঐ লোকটিকে কঠিন শাস্তিদেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। কিন্তু মহানবী (সাঃ) তাদেরকে থামিয়ে দিলেন।

এরপর রাসূলে খোদা (সাঃ) লোকটিকে সাথে নিয়ে তাঁর বাড়িতে গেলেন এবং তাকে আরো কিছু সাহায্য দান করলেন। এ সময় বেদুঈন লোকটি নিজের চোখে দেখতে পেলো যে, রাসূলে আকরাম (সাঃ)- এর জীবন ও অন্যান্য নেতা ও শাসকদের জীবনের অবস্থার মধ্যে কোন মিল নেই। আর সে রাসূলের কাছে যে সোনা দানা আশা করেছিলো আসলেই তা তারঁ কাছে নেই।

বেদুঈন আরব সন্তুষ্টি প্রকাশ করলো এবং মুখে কতৃজ্ঞতার ভাষা উচ্চারণ করলো। তখন মহানবী (সাঃ) আরব বেদঈনকে বললেন, ‘গতকাল তুমি আমার সম্পর্কে বিশ্রী কথাবার্তা বলেছ যা আমার সাহাবীদেরকে উত্তেজিত করে দেয়। তারা তোমার উপর খুবই অসন্তুষ্ট। এখন আমার ভয় হচ্ছে যে, তারা তোমার কোন ক্ষতি করে বসতে পারে। এখন তুমি আমার সামনে কৃতজ্ঞতার কথা বলেছ। অতএব এটা কি সম্ভব যে, তুমি তোমার এ কথাটি তাদের সামনেও প্রকাশ করবে যাতে তাদের রাগ দূর হয়ে যায়? জবাবে সে বললো, ‘এতে আমার কোন আপত্তি নেই’।

পরদিন বেদুঈন লোকটি মসজিদে নববীতে গেল। যখন সবাই সেখানে সমবেত ছিলেন। রাসূল (সাঃ) তাদের দিকে ফিরলেন এবং বললেন, 'লোকসকল! এ লোকটি বলছে যে আমার প্রতি সে সন্তুষ্ট হয়ে গেছে। কি? এ কথা কি সঠিক?

বেদুঈন লোকটি বললো, 'জ্বি, এটাই সঠিক।' অতঃপর সে ঐ কথাটাই বিড়বিড় করে বললো যা ইতোপূর্বে বলেছিল। রসূলে খোদা (সাঃ) এর সাহাবীরা তখন হেসে ফেললেন।

এ সময় আল্লাহর নবী (সাঃ) সকলের উদ্দেশ্যে বললেন, 'এ লোকটি আর আমার ঘটনাটির উদাহরণ হলো সে ব্যক্তির মতো, যার উট স্বীয় মালিকের প্রতি আতঙ্কিত হয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। আর লোকেরা উটের মালিককে সাহায্য করার উদ্দেশ্য নিয়ে শোরগোল শুরুকরে দিল এবং সে পলায়নকারী উটটির পিছে পিছে দৌঁড়াতে লাগলো। উটটি আরো আতঙ্কিত হয়ে দ্রুত পালাতে লাগলো। এ অবস্থা দেখে উটের মালিক সকল লোককে উদ্দেশ্য করে চিৎকার দিয়ে বললো, 'ভাইসব! অনুরোধ করছি আমার উটের পিছনে কাউকে দৌঁড়াতে হবে না। আমার উটকে কিভাবে শান্তকরতে হয় সেটা আমি ভালো জানি।

তার এ আহ্বান শুনে উটের পিছে দৌঁড়ানো লোকজন থেমে গেল। তারপর উটের মালিক এক মুষ্টি ঘাস নিজের হাতে নিয়ে আস্তে আস্তে উটের কাছে পৌঁছে গেল। আর খুব সহজে উটের বলা (লাগাম বিশেষ) নিজের হাতে নিয়ে নিল। উটটি তখন মালিকের সাথে ফিরে এলো।

গতকাল যদি আমি তোমাদেরকে বারণ না করতাম তাহলে এ আরব বেদুঈনকে তার জীবন হারাতে হতো। তোমরা তাকে জীবিত ছেড়ে দিতে না। তাতে লোকটি কুফরী ও মূর্তি পূজারীর অবস্থায় মারা যেতো। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আমি তোমাদেরকে কোন পদক্ষেপ নিতে দেইনি। আর এখন তোমরা নিজেরাই দেখতে পেলে যে, আমি আমার ভালোবাসা ও নম্র ব্যহার দ্বারা লোকটিকে একেবারেই মুগ্ধ করে ফেলেছি'।[১১]

১২

সিরিয়াবাসী এক ব্যক্তি ও ইমাম হোসাইন (আঃ)

সিরিয়াবাসী এক ব্যক্তি হজ্ব অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্য মদীনায় আসলো। মসজিদে নববীতে একদিন হঠাৎ তার নজর গিয়ে পড়লো এমন এক ব্যক্তির উপর যিনি মসজিদের এক কোণে বসেছিলেন। সে ভাবতে লাগলো যে, এ লোকটি কে? নিকটেই দাঁড়ানো অপর এক লোককে জিজ্ঞাসা করলো, 'এ লোকটি কে ভাই'? সে বললো, তিনি হোসাইন ইবনে আলী ইবনে আবী তালিব (আঃ)'। পূর্ব থেকেই ভিত্তিহীন মিথ্যা প্রচার-প্রপাগাণ্ডা [১২]তার মন-মগজকে (ইমাম হোসাইনের বিরুদ্ধে) বিগড়ে রেখেছিল।

সুতরাং এ নামটি শোনার সাথে সাথেই ক্রোধ ও ক্ষোভে তার চেহারা লাল হয়ে গেল। আর সে খোদার সন্তুষ্টি লাভের নিয়তে ইমাম হোসাইনের বিরুদ্ধে গালি-গালাজের বৃষ্টি বর্ষণ করতে লাগলো। অশ্রাব্য, বিশ্রী ও কুৎসিত শব্দ ব্যবহার করে সে ইমামকে গালি দিয়ে তার অন্তরের জ্বালা মিটালো এবং তার মনের ক্ষোভ-দুঃখ প্রকাশ করলো। ইমাম হোসাইন (আঃ) তার গালাগালিতে মোটেও রাগ করলেন না, বরং অত্যন্ত ভালোবেসে ও সদ্ব্যবহারের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আল-কোরআনের সে আয়াতগুলো তেলাওয়াত করলেন, যে আয়াতগুলোতে ভালো ব্যবহার, ক্ষমা প্রদর্শন ও মার্জনা করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। কোরআনের আয়াতগুলো পাঠ করার পর ইমাম হোসাইন (আঃ) সিরিয়ার অধিবাসী সে লোকটিকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'আমি তোমার যে কোন খেদমত ও সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত আছি'। তারপর তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি সিরিয়ার অধিবাসী'? জবাবে সে বললো, 'হ্যা! আমি একজন সিরিয়ার অধিবাসী'। তখন ইমাম তাকে বললেন, 'সিরিয়াবাসীদের এরূপ ব্যবহারের অভিজ্ঞতা আমার আছে। আর আমি খব ভালোভাবে জানি, এ দুর্ব্যবহার ও শত্রুতার কারণ কি'?

অতঃপর ইমাম লোকটিকে বললেন, 'তুমি এ শহরে একজন মুসাফির। বিদেশের বাড়িতে যদি তোমার কোন কিছুর প্রয়োজন হয় তাহলে তুমি আমাকে বলো। আমি তোমার যে কোন খেদমত

করার জন্য প্রস্তুত আছি। আমি তোমাকে আমার মেহমান করতে চাই এবং তোমাকে পোশাক-পরিচ্ছদ ও টাকা-পয়সা ইত্যাদিও দিতে চাই'। সিরিয়াবাসী লোকটি তার দুর্ব্যবহার ও গালিগালাজের জন্য একটা কঠোর পরিণতির অপেক্ষা করছিল। সে এমনটি কখনোই আশা করছিল না যে, তার এ অপরাধ ও ধৃষ্টতা একেবারেই ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে বিবেচনা করা হবে। ইমামের এ সুন্দর ব্যবহার তার মধ্যে এক আত্মিক বিপ্লব এনে দিয়েছে। সে নিজে নিজে বলতে লাগলো, 'আমার মন চায় যে, মাটি ফেটে দ্বিখন্ডিত হয়ে যাক আর আমি তাতে ঢুকে পড়ি। হায় আফসোস! নিজের অজ্ঞতার কারণে আমি যদি এ অপরাধ না করতাম! এর আগ পর্যন্ত ইমাম হোসাইন (আঃ) ও তাঁর পিতার চেয়ে বড় দুশমন আর কেউ ছিল না। আর এখন আমার দৃষ্টিতে ইমাম হোসাইন (আঃ) ও তাঁর পিতার চাইতে অধিক প্রিয় আর কেউ নেই'।[১৩]

১৩

উপদেশ প্রার্থী এক ব্যক্তি

এক আরব বেদুঈন মদীনা শহরে এসে রাসূলে আকরাম (সাঃ)- এর খেদমতে হাজির হয়ে আবেদন করলো, 'হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমাকে কিছু উপদেশ দান করুন'। মহানবী (সাঃ) তাকে বললেন, 'ক্রোধান্বিত হয়ো না'। এর বেশি তাকে আর কিছুই বললেন না।

অতঃপর লোকটি তার গোত্রের মাঝে ফিরে গেল। বাড়ি ফিরেই সে জানতে পারলো যে, তার অনুপস্থিতিতে এক মারাত্মক ঘটনা ঘটে গেছে। তারই গোত্রের যুবকরা অপর এক গোত্রের কিছু মালামাল জোরপূর্বক লুটপাট করে নিয়ে এসেছে। এর জবাবে সে গোত্রের লোকেরাও এদের অনেক মালামাল লুটপাট করে নিয়ে গেছে। এভাবে লুটপাটের এ ধারা উভয় গোত্রের মাঝে এমন এক পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হয়েছে যে, এখন দুই গোত্রের লোকেরাই এক মারাত্মক যুদ্ধ- বিগ্রহ ও খুনাখুনির পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। এ খবর শোনা মাত্রই সে লোকটি ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে গেল। তৎক্ষণাত সে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হলো এবং রণাঙ্গনের দিকে ছুটলো নিজের গোত্রের সঙ্গ দেবার জন্য।

ঠিক এমন সময় তার মনে পড়লো যে, সে মদীনায় গিয়েছিল এবং রাসূলে আকরাম (সাঃ)- এর কাছে উপদেশ প্রার্থনা করেছিল, তখন মহানবী (সাঃ) বলেছিলেন, 'নিজের ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণে রাখো'।

অতঃপর সে মনে মনে ভাবতে লাগলো, 'কেন আমি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হলাম কোন কারণে আমি এভাবে যুদ্ধ করতে এবং খুনাখুনি করতে তৈরি হয়ে গেলাম? কেনই বা আমি এরূপ ক্রোধান্বিত হয়ে গেলাম'? এসব প্রশ্ন তার মনে জেগে ওঠার পর সে ভাবলো : 'এখনই উপযুক্ত সময়, রসুলুলাহ (সাঃ) ছোট্ট উপদেশটি পালন করার।

এরপর সে এগিয়ে গেল এবং বিরোধী গোত্রের সরদারকে ডেকে বললো, এ সংঘাত কি জন্যে? যদি এ যুদ্ধের উদ্দেশ্য হয় সে সমস্ত মালামাল ফিরে পাওয়া যা আমাদের গোত্রের যুবকরা বোকামি

করে তোমাদের থেকে জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিয়ে এসেছে, তাহলে এসো আমি আমার নিজস্ব সম্পদ থেকে তোমাদের ক্ষতিপূর ণ করে দেই। এটা একটা ভালো কথা নয় যে, এর কারণে আমরা একে অপরের রক্তপিপাসু হয়ে যাবো'।

প্রতিপক্ষ গোত্রের লোকেরা যখন এ ব্যক্তির যুক্তিপূর্ণ ও উদারতাপূর্ণ কথাগুলো শুনলো তখন তাদের মধ্যেও বীরত্ববোধ জেগে উঠলো। বললো, 'আমরাও তোমাদের চেয়ে কোন অংশে কম নই। যদি এমনটিই হয় তাহলে আমরা আমাদের দাবি প্রত্যাহার করলাম'।

তখন উভয় গোত্রের লোকেরা নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে গেল।[১৪]

১৪

এক খ্রিস্টান ও হযরত আলীর লৌহ পোশাক (যেরাহ)

হযরত আলী (আঃ)- এর খেলাফতকালে একবার কুফায় তাঁর একটি যেরাহ (যুদ্ধে ব্যবহৃত লৌহ পোশাক) হারিয়ে গেল। এর কিছু দিন পরেই যেরাহটি এক খ্রিস্টান ব্যক্তির নিকট পাওয়া গেল। হযরত আলী (আঃ) সে খ্রিস্টান লোকটিকে সাথে নিয়ে কাজীর (বিচারপতির) দরবারে গেলেন এবং তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করলেন। তিনি বললেন, ‘এ যেরাহটি আমার । এটা আমি কারো কাছে বিক্রিও করিনি। আর কাউকে দান করেও দেইনি। বেশ কিছুদিন পর এখন এ যেরাহটি এ ব্যক্তির নিকট পাওয়া গেল’। কাজী সাহেব খ্রিস্টান লোকটির উদ্দেশ্যে বললেন, ‘যেরাহটির ব্যাপারে খলিফা তাঁর দাবি পেশ করেছেন। এখন এ ব্যাপারে তোমার বক্তব্য কি’? সে বললো, এটা আমার নিজের যেরাহ। এর সাথে সাথে আমি খলিফাকেও মিথ্যাবাদী বলছি না। (হতে পারে তিনি এটা চিনতে ভুল করছেন)।

কাজী হযরত আলীকে লক্ষ্য করে বললেন, ‘আপনি দাবিদার আর এ ব্যক্তি আপনার দাবি অস্বীকার করছে। সুতরাং আপনার কর্তব্য হচ্ছে আপনি আপনার দাবির পক্ষে সাক্ষ্য- প্রমাণ হাজির করুন।

হযরত আলী (আঃ) মুচকি হেসে বললেন, ‘কাজী সাহেব! সত্য কথা বলেছেন। এখন আমাকে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করা উচিত। কিন্তু এ ব্যাপারে আমার কোন সাক্ষী নেই’।

সাক্ষ্য- প্রমাণ হাজির করতে না পারার কারণে কাজী সাহেব বিচারের রায় খ্রিস্টান লোকটির পক্ষে দিয়ে দিলেন। কাজীর রায় শুনেই সে খ্রিস্টান লোকটি যেরাহটি তুলে নিয়ে নিজের বাড়ির দিকে চললো।

কিন্তু সে খ্রিস্টান লোকটি খুব ভালোভাবে জানতো যে, এ যেরাহটি প্রকৃতপক্ষে কার? সুতরাং কয়েক কদম পথ চলার পর তার মধ্যে আশ্চর্য অবস্থার সৃষ্টি হলো। তৎক্ষণাত সে ফিরে এসে বললো, ‘আপনাদের এ শাসন ব্যবস্থা এবং লোকদের সাথে আপনাদের এমন সুন্দর ব্যবহারের

ধরন পরিষ্কার বলে দিচ্ছে যে, এটা কোন সাধারণ মানুষের আচার- ব্যবহার নয়। নিঃসন্দেহে এটা নবী- রাসূলদের আচার- আচরণের মতো'। তখন সে স্বীকার করলো যে, প্রকৃতপক্ষে এ যেরাহটি হযরত আলী (আঃ)- এরই'।

শীঘ্রই লোকেরা দেখতে পেলো সে খ্রিস্টান লোকটি ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে গেছে এবং সীমাহীন আগ্রহ- উদ্দীপনা নিয়ে হযরত আলী (অঃ)- এর পতাকাতলে থেকে নাহরাওয়ান যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করে।[১৫]

১৫

ইমাম সাদিক ও একদল সুফী (আঃ)

সুফিয়ান সাওরী মদীনার একজন অধিবাসী। একদিন সে হযরত ইমাম জাফর সাদিক (আঃ)- এর খেদমতে উপস্থিত হলো। দেখতে পেলো ইমাম একটি খুব নরম ও সাদা পোশাক পরিধান করে আছেন। যেন ডিমের খোসা আর ভেতরের তরল অংশের মধ্যবর্তী পাতলা পর্দাটি। তাই সে ইমাম সাদিক (আঃ)- এর প্রতি আপত্তি করে বললো, 'এ পোশাকটি আপনার জন্য উপযোগী নয়। আপনার পক্ষে এটা কখনও সঙ্গত নয় যে, নিজেকে দুনিয়ার আরাম- আয়েশের সাথে জড়িয়ে ফেলবেন। আপনার কাছ থেকে এটাই আশা যে, খোদাভীতি ও পরহযেগারীর পথ অবলম্বন করে নিজেকে পার্থিব সুখ- স্বাচ্ছন্দ্য থেকে দূরে রাখবেন।[১৬]

ইমাম সাদিক (আঃ) বললেন, 'আমি তোমাকে এমন একটি কথা বলতে চাই যা তোমার জন্য দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতে কল্যাণকর ও উপকারী হবে। তোমার উদ্দেশ্য যদি হয় এ ব্যাপারে ইসলামের হুকুম- আহকাম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা তাহলে আমার কথা তোমার জন্য অত্যন্ত উপকারী হবে এবং তুমি এ ব্যাপারে জ্ঞান লাভ করতে পারবে। কিন্তু যদি তোমার উদ্দেশ্য হয় ইসলাম ধর্মে কোন বেদআত প্রবেশ করানো এবং সত্য ইসলাম থেকে সরলপ্রাণ মুসলমানদেরকে বিভ্রান্তির শিকারে পরিণত করা, তাহলে ভিন্ন কথা। কেননা পথভ্রষ্ট ও বেদাআত সৃষ্টিকারী লোকদের জন্য আমার কথা নিস্ফল হয়ে থাকে। সুতরাং তাতে আমার কথা তোমার কোন উপকারে আসবে না। সম্ভবত তোমার মনে রাসূলে আকরাম (সাঃ) ও তার সাহাবীবৃন্দের সহজ- সরল ও দারিদ্র্যের জীবন যাপনের কথা জেগে উঠেছে। আর তাতে তুমি এ কথা মনে করে নিয়েছো যে, কেয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের জন্য দারিদ্র্যের জীবন যাপন করা ফরজ করে দেয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ব্যাপার তা নয়। রাসূলে আকরাম (সাঃ) ও তাঁর অনুগত সাথীগণ এভাবে দারিদ্র্যের ও কষ্ট- ক্লেশের জীবন যাপন করেছিলেন তখন, যখন সমাজের চারদিকে অভাব- অনটন, দুঃখ- দারিদ্র্য, কষ্ট- ক্লেশ, অনাহার- অর্ধাহার ইত্যাদি ছড়িয়ে

ছিল। আর তখন লোকেরা সে সব মৌলিক বস্তু থেকে বঞ্চিত ছিল যা সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার জন্য অত্যন্ত জরুরী। তাই রাসূল (সাঃ) ও তাঁর অনুগত সাহাবীদের জীবন যাপনের মান তৎকালের সাধারণ মানুষের অবস্থার সাথে মিল ছিল। কিন্তু যে যুগে জীবন যাপনের যাবতীয় সামগ্রী সহজে পাওয়া যায় এবং আল্লাহর নেয়ামতসমূহ উপভোগের সুযোগ- সুবিধা বর্তমান থাকে তখন তো আল্লাহর নেয়ামতসমূহ থেকে উপকার লাভ করার সবচেয়ে বেশি অধিকার হচ্ছে তাঁর অনুগত প্রিয় বান্দাদেরই।

আল্লাহর সে সব নেয়ামতের উপর অসৎ ও ফাসেক লোকদের চাইতে তাঁর সৎ ও নেক বান্দাদের অধিকার কতোই না বেশি। নেয়ামতসমূহের অধিকার কাফেরদের লত নায়সম লমানদের কতোই না অধিক! তুমি কোন বিষয়টিকে আমার দোষের বিষয় হিসেবে নির্ণয় করেছো? মহান আল্লাহর শপথ করে বলছি, 'যেভাবে তুমি দেখতে পাচ্ছো যে, আমি আল্লাহর দেয়া নেয়ামতসমূহ ব্যবহার করছি, ঠিক তেমনিভাবে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্তআমার জীবনে এমন একটি মুহূর্তও অতিবাহিত হয়নি যে, আমি আমার মাল- সম্পদ থেকে অন্যদের অধিকার পৌঁছে দেইনি। প্রতিটি সকাল- সন্ধ্যা এ চিন্তা- ভাবনায় নিমজ্জিত থাকি যে, আমার মাল- সম্পদে যার যে হক আছে তা যেন যথাসময়ে তার কাছে পৌঁছে দিতে পারি'।

সুফিয়ান সাওরী ইমামের যুক্তিসংগত কথার জবাব দিতে পারলো না এবং মাথা ঝুঁকিয়ে চলে গেল। তারপর সে তার বন্ধু- বান্ধব ও তার মতবাদে বিশ্বাসীদের সাথে সাক্ষাৎ করে সমস্তঘটনা তাদেরকে শোনালো। তাতে তারা সকলে মিলে ফয়সালা করলো যে, তারা সকলে সম্মিলিতভাবে ইমাম সাদিক (আঃ)- এর সাথে এ বিষয়ে তর্ক- বিতর্ক করবে।

অবশেষে একদিন সুফিয়ান সাওরী ও তার সকল সাথী ইমাম সাদিক (আঃ)- এর খেদমতে হাজির হলো। তারা বললো, 'আমাদের বন্ধু তার কথাকে হক প্রমাণ করার ব্যাপারে উপযুক্ত দলিল- প্রমাণ পেশ করতে পারেনি। তাই আমরা এখন সুস্পষ্ট দলিল- প্রমাণের দ্বারা আপনাকে নিরুত্তর করতে এসেছি'।

ইমাম সাদিক (আঃ) বললেন, 'বলো! তোমাদের সে সমস্ত প্রমাণ কি যা দিয়ে তোমরা আমাকে নিরুত্তর করতে চাও'।

তারা বললো, 'আমরা কোরআনের আয়াত দিয়েই আমাদের দলিল- প্রমাণ পেশ করতে চাই'।

সাথে সাথেই ইমাম (আঃ) বললেন, 'কোরআনের চাইতে উত্তম দলিল আর কি হতে পারে? সুতরাং তোমরা তোমাদের দলিল উপস্থাপন' করো। আমি তোমাদের দলিলাদি শোনার জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত রয়েছি'। তারা বললো, 'আমরা আমাদের মতবিশ্বাসের সত্যতা প্রমাণের জন্য কোরআনের দুটি আয়াত তুলে ধরবো। আর আমাদের কথা পরিষ্কার করার জন্য এ দুটি আয়াত যথেষ্ট। আল কোরআনের এক স্থানে মহান আল্লাহ রাসূলে আকরাম (সাঃ)- এর কোন কোন সাহাবাদের প্রশংসা এভাবে করেছেন :

'যদিও তাদের নিজেদের প্রয়োজন মিটতো না এবং অভাব- অনটন ও দারিদ্র্য অবস্থায় ছিল নিমজ্জিত। তবুও অপর লোকদেরকে নিজেদের উপর প্রাধান্য দিয়েছে এবং তাদের প্রয়োজন মিটিয়েছে। আর যারা নিজেদেরকে কৃপণতা থেকে রক্ষা করেছে তারাই সফলকাম'।[১৭]

আল কোরআনের অন্য এক স্থানে' বলা হয়েছে :

'যদিও তাদের খাদ্য- খাবারের প্রয়োজন ও আগ্রহ ছিল সে অবস্থাতেও তারা নিজেদের খাবার ইয়াতিম, মিসকীন ও কয়েদিকে দান করে দিয়েছে'।[১৮]

তাদের বক্তব্য শেষ হওয়ার সাথেই সাথেই এ মজলিসে উপস্থিত এক ব্যক্তি যে এতোক্ষণ তাদের কথাবার্তাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনছিল, সে নিজের পক্ষ থেকে বলে উঠলো, 'তোমাদের এতোক্ষণের আলাপ- আলোচনায় আমি যা বুঝতে পেরেছি তা হলো- তোমাদের কথাবার্তায় তোমাদের নিজেদেরই আত্মবল নেই। আসলে এ সমস্ত দলিল দ্বারা তোমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, লোকেরা যেনো নিজেদের ধন- সম্পদ ও মালিকানার প্রতি কোন প্রকার মায়া- আকর্ষণ না রাখে এবং তার বেশির ভাগ অংশ যেনো তোমাদের মতো ফকির- মিসকিন লোকদেরকে দিয়ে দেয় যাতে তোমরা তাদের পরিবর্তে ভোগ করতে পারো।

এ কারণে বাস্তবে তোমাদেরকে দেখা যায়নি যে, তোমরা উত্তম উত্তম খাবার ত্যাগ করেছো। ইমাম (আঃ) বললেন, 'আপাতত এসব কথা বাদ দাও কোন ফল নেই'। এরপর ইমাম (আঃ) সুফীদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তোমরা তো কোরআন মজীদ থেকে দলিলাদি পেশ করছো। কিন্তু তার আগে একটা কথা বলো, তোমরা কি আল-কোরআনের 'মোহকাম-মোতাশাবেহ' ও 'নাসেখ-মানসুখ' আয়াতগুলোর মাঝে পার্থক্য করতে পারো? এই উম্মতের থেকে যারাই পথভ্রষ্ট হয়েছে তারা এ পথেই পথভ্রষ্ট হয়েছে। কারণ তারা কোরআনের সঠিক খবর না রেখেই তা আঁকড়ে ধরে।

সুফীরা বললো, 'এ বিষয়ে আমাদের জ্ঞান মোটামটি। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান আমাদের নেই'। ইমাম বললেন, তোমাদের দুর্ভাগ্য এটাই। কোরআনের আয়াতের মতো রাসূলে পাক (সাঃ)-এর হাদীসও রয়েছে। এগুলোর উপর পূর্ণ অবগতি রাখা দরকার। কিন্তু তোমরা কোরআনের যে আয়াতগুলোকে পাঠ করেছ, তাতে তো আল্লাহর নেয়ামতসমূহ ব্যবহার করা হারাম বলা হয়নি। এ আয়াতগুলো বদান্যতা, দয়া-দান ও ত্যাগের সাথে সম্পৃক্ত। এ আয়াতগুলোতে আল-কোরআন সে সকল লোকের প্রশংস্রা করছে যারা একটা বিশেষ সময়ে অপরকে নিজেদের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। অন্যদের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিয়ে তারা নিজেদের হালাল মাল নিজেরা ব্যবহার করার পরিবর্তে অপরকে দান করে দিয়েছেন। যদি তারা এ মাল না দিতেন তাহলেও তাদের কোন গুণাহ হতো না। কেননা মহান আল্লাহ তাদেরকে হুকুম করেননি যে, অবশ্যই এটা করতে হবে। তেমনি আল্লাহ তাদেরকে এ কাজ করতে বাধাও দেননি। সুতরাং তারা নিজেরা দয়া ও সহানুভূতির বশবর্তী হয়ে নিজেরা কষ্ট করেছেন এবং তাদের মাল-সম্পদ অপরকে দিয়ে দিয়েছেন। যার প্রতিদান মহান আল্লাহ তাদেরকে দেবেন। অতএব এ আয়াতগুলো ও তোমাদের দাবির মধ্যে কোন মিল নেই। কেননা তোমরা সে সমস্ত লোকের তিরস্কার ও নিন্দা করছো যারা নিজেদের মাল-সম্পদ ও খোদার দেয়া নেয়ামত ভোগ করে থাকে।

তিনি বললেন, সে সমস্তলোক, [রাসূলে খোদা (সাঃ)-এর সাহাবাগণ] সেদিন এ ধরনের দান- খয়রাতের দৃষ্টান্ত রেখেছেন। কিন্তু পরবর্তীতে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে পরিপূর্ণ

বিধান এসেছে যেখানে আল্লাহ এ কাজের একটা সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। যেহেতু এ হুকুমটি পরে এসেছে তাই তাদের (সাহাবাদের) সে আমলকে রহিত করে দিয়েছে। সুতরাং আমাদেরকে এ হুকুম মেনে চলা উচিত। সে আমলকে নয়।

মহান আল্লাহ মমিন- মসলমানদের অবস্থার সংশোধনের জন্য এবং তার বিশেষ রহমতের দ্বারা এ নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন যে, কোন লোক নিজের পরিবার- পরিজনকে কষ্টের মধ্যে রেখে তার সমস্ত সহায় অপরকে দান করে দেবে। কেননা তার পরিবারে এমন শিশু, বৃদ্ধ ও দূর্বল লোকজন থাকে যারা এ কষ্ট সহ্য করতে পারে না। ধরে নাও, আমার কাছে একটি রুটি আছে আর আমি তা অন্যকে দিয়ে দিলাম। তখন তার পরিণতি এই দাঁড়াবে যে, আমার পরিবার- পরিজন যাদের ভরণ- পোষণের দায়

দায়িত্ব আমার উপর রয়েছে তারা না খেয়ে ধ্বংসের মুখে পতিত হবে। এ জন্য রাসূলে আকরাম (সাঃ) বলেছেন, যদি কোন লোকের কাছে কিছু খোরমা অথবা কিছু রুটি কিংবা কিছু দিনার বা টাকা থাকে আর সে দান করতে চায়, তাহলে প্রথমে উচিত তার পিতামাতাকে দান করবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে নিজের ও তার স্ত্রী- সন্তানের জন্য দান করবে। তৃতীয় পর্যায়ে তার আত্মীয়- স্বজন ও মুমিন ভাইদেরকে দান করবে। আর চতুর্থ পর্যায়ে ভালো ও কল্যাণ কাজে দান করার পালা। এভাবে দান- খয়রাত ইত্যাদির পালা আসে সবার শেষে।

রসূলুলাহ (সাঃ) যখন শুনতে পেলেন যে, এক আনসার মারা গেছে, আর তার ছোট ছোট ছেলেমেয়ে বর্তমান রয়েছে, এদিকে মৃত্যুর পূর্বে সে তার সমস্ত সম্পদ আল্লাহর পথে দান করে দিয়েছে। তখন রাসূল (সাঃ) বললেন, এ সংবাদ যদি তোমরা আমাকে পূর্বেই দিয়ে দিতে তাহলে আমি তাকে মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করার অনুমতি দিতাম না। সে তার ছেলে- মেয়েদেরকে অসহায় অবস্থায় রেখে গেছে। এখন তারা অপরের সামনে হাত পাতছে।

আমার পিতা হযরত ইমাম বাকের (আঃ) আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, রাসূলে পাক (সাঃ) বলেছেন, সব সময় দানখয়রাতের ব্যাপারে নিজের সন্তানদের থেকে শুরুকরবে। এরপর আত্মীয়- স্বজনের যে যত নিকটের হবে সে ততো প্রাধান্য পাবে।

এতসব কিছু ছাড়াও আল- কোরআন তোমাদের মতবিশ্বাসের বিপক্ষে রায় প্রদান করে থাকে। আল কোরআনের এক স্থানে এভাবে বলা হয়েছে :

মোত্তাকী, পরহেযগার ও খোদাভীরুলোক তারাই যারা দান করার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়িও করে না। কৃপণতাও করে না, বরং মধ্যম নীতি অবলম্বন করে।[১৯] কোরআন মজীদের অনেক আয়াতেই যেমনিভাবে কৃপণতা করতে নিষেধ করা হয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে খরচ ও দান করার ক্ষেত্রেও অতিরিক্ত ও অপাত্রে করতে বাধা দান করেছে। এ ব্যাপারে আল- কোরআন একটি মধ্যম নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে। এটা উচিত নয় যে, কোন লোক তার সমস্তসম্পদ অপর লোকদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়ে নিজে দারিদ্র্য ও অভাবগ্রস্ত হয়ে মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করছে, 'হে পরোয়ারদিগার! আমাকে রিযিক দান করো'। মনে রাখবে যে, মহান আল্লাহ এমন লোকদের দোয়া কখনো কবুল করেন না। আল্লাহর নবী (সাঃ) বলেছেন, মহান আল্লাহ কিছু সংখ্যক লোকদের দোয়া কখনো কবুল করেন না। তারা হলো :

(ক) যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকটে নিজের পিতামাতার অকল্যাণ প্রার্থনা করে।

(খ) যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ কাউকে ধার দেয়। কিন্তু কোন সাক্ষীও রাখে না আর লিখিত কোন প্রমাণও রেখে দেয় না। এদিকে ঋণগ্রহীতা টাকাগুলো মেরে দেয়। তখন সে হাত তুলে দোয়া করে আল্লাহর কাছ থেকে সমাধান চায়। তাহলে আল্লাহ তার দোয়া কখনো কবুল করেন না। কেননা সে কোন প্রকার সাক্ষ্য- প্রমাণ না রেখে অপরকে ঋণ দিয়ে নিজেই সমাধানের পথ বিনষ্ট করে ফেলেছে।

(গ) যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর দরবারে এ দোয়া করে যে, তাকে যেনো তার স্ত্রীর অনিষ্টতা হতে মুক্তি দান করেন, তাহলে এমন ব্যক্তির দোয়া মহান আল্লাহ মোটেও শোনেন না। এ জন্য যে, স্ত্রীর অনিষ্টতা থেকে মুক্তি লাভের পন্থা ও পদ্ধতি তার নিজের হাতেই রয়েছে। যদি সত্য সত্যই সে স্ত্রীর ব্যাপারে অতিষ্ঠ হয়ে গেছে তাহলে তার অধিকার রয়েছে যে, এমন স্ত্রীকে তালাক দিয়ে নিজের মুক্তির পথ বেছে নেবে।

(ঘ) যে ব্যক্তি নিজের ঘরে হাতের উপর হাত রেখে বসে থাকে আর রিযিকের জন্য দোয়া করে আল্লাহর কাছে তখন এমন লোকের দোয়ার জবাবে আল্লাহ বলেন :

হে আমার বান্দা! আমি কি তোমার জন্যে নড়াচড়া ও চলাফেলার রাস্তা খোলা রাখিনি? আমি কি তোমাকে নিখুঁত ও মজবুত অঙ্গ- প্রত্যঙ্গ দান করিনি? আমি তোমাকে হাত- পা, কান- নাক ও আকল- বুদ্ধি দান করেছি যাতে করে তুমি এগুলো দিয়ে দেখে- শুনে ও চিন্তা- ভাবনা করে হাত- পা ইত্যাদি ব্যবহার করে রিযিকের সন্ধানে বেরিয়ে পড়তে পারো। এ সকল অঙ্গ- প্রত্যঙ্গ সৃষ্টির একটা উদ্দেশ্য আছে। এ নেয়ামতগুলোর কৃতজ্ঞতা হচ্ছে যে, তুমি এগুলোর সদ্ব্যবহার করবে। এভাবে আমি আমার ও তোমার মাঝে উসিলা নির্ধারণ করেছি যাতে করে তুমি প্রতিটি জিনিস হাসিল করার জন্য তোমার মেহনতের দ্বারা পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারো। আর শ্রম- সাধনার সাথে সম্পৃক্ত কাজগুলো পালন করতে পারো এবং অন্যের কাঁধের বোঝা যেনো তোমাকে হতে না হয়। তোমার চেষ্টা যদি আমার ইচ্ছা মোতাবেক হয় তাহলে আমি তোমাকে যথেষ্ট পরিমাণে রিযিক দান করবো। আর যদি সংগত কোন কারণে তোমার উন্নতি না হয় তাহলেও তুমি অন্তত এ প্রশান্তিলাভ করতে পারবে যে, তোমাকে চেষ্টা করতে বলা হয়েছিল, তুমিও চেষ্টা করেছো। এখানে তোমার কোনো দোষ নেই।

(ঙ) সে ব্যক্তি যাকে মহান আল্লাহ অনেক ধন- সম্পদ দিয়েছেন। আর সে দান করতে গিয়ে তার সমস্তসম্পদ শেষ করে দিয়েছে। এর পরে সে আল্লাহর কাছে এ দোয়া করে : হে আমার প্রভু! আমাকে রিযিক দান করো। তখন আল্লাহ এমন লোকের জবাবে বলেন :

আমি কি তোমাকে অনেক অনেক রিযিক দান করিনি? তুমি কেন মধ্যম নীতি অবলম্বন করোনি? আমি কি এ হুকুম দেইনি যে, দান করার ব্যাপারে মধ্যম নীতি অবলম্বন করো? আমি কি দান- খয়রাতের বেলায় বেহিসাবে খরচ করার ব্যাপারে তোমাদেরকে নিষেধ করিনি? (চ) সে ব্যক্তির দোয়াও কবুল হয় না, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর দরবারে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে দোয়া করে। আর যে আল্লাহর কাছে এমন জিনিস প্রার্থনা করে যা দ্বারা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হওয়াটা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।

মহান আল্লাহ কোরআন পাকে বিশেষভাবে তাঁর রাসূলকে দান করার পদ্ধতি শিখিয়েছেন। একটি ঘটনা এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহর নবী (সাঃ)- এর নিকট কিছু স্বর্ণমূদ্রা ছিল। তিনি তা দরিদ্র লোকদের মধ্যে বন্টন করে দিতে চাচ্ছিলেন। তিনি চাননি যে, এক রাতের জন্যও সে স্বর্ণমুদ্রাগুলো তার ঘরে পড়ে থাকুক। তাই তিনি সারাদিন ধরে সে মুদ্রাগুলো লোকদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। পরদিন সকালে একজন ভিক্ষুক তাঁর বাড়িতে আসলো এবং সাহায্য প্রার্থনা করলো। সে ভিক্ষুকটি তার প্রয়োজনের তাগিদে বার বার সাহায্যের প্রার্থনা করলো। সে ভিক্ষুকটি তার প্রয়োজনের তাগিদে বার বার সাহায্যের আবেদন জানাচ্ছিল। কিন্তু নবী (সাঃ)- এর কাছে তাকে দেবার মতো কিছুই ছিল না। এতে তিনি খুবই দুঃখিত হলেন। তখন কোরআন মজীদের এ আয়াত অবতীর্ণ হলো যেখানে মহান আল্লাহ দান করার ব্যাপারে তাঁর বিধান জারি করেছেন :

নিজের হাতকে মুষ্টিবদ্ধ করো না। আর না এতোখানি খুলে রেখো, যাতে করে পরে খালি হাত হয়ে যেতে হয় এবং ভিক্ষুকের সাহায্য প্রার্থনার সময় লজ্জিত ও দুঃখিত হতে হয়।[২০]

এগুলো সে সমস্ত হাদীস যা হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। আর আল-কোরআনের আয়াতসমূহ এ হাদীসগুলোতে বর্ণিত বিষয়াদিকে সমর্থন করে। তাহলে আল-কোরআনে বিশ্বাসী ঈমানদার লোক যারা, তারা কোরআনে বর্ণিত বিষয়াদির প্রতি ও ঈমান রাখে।

মৃত্যুর সময়ে হযরত আবু বকরকে বলা হয়েছিল : আপনার ধন- সম্পদ সম্পর্কে অসিয়ত (অন্তিম উপদেশ) করুন। তিনি বললেন, আমার সম্পদের এক- পঞ্চমাংশ দান করে দিও। আর অবশিষ্টাংশ উত্তরাধিকারীদের জন্য রইলো। এক- পঞ্চমাংশ সম্পদ কম নয়। বস্তুত হযরত আব বকর স্বীয় সম্পদের এক- পঞ্চমাংশের ব্যাপারে অসিয়ত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে একজন রোগীর অধিকার হচ্ছে মৃত্যু রোগের সময়ও সে তার সম্পদের এক- তৃতীয়াংশেরই অসিয়ত করবে। যদি জানতেন যে তার সমুদয় অধিকারকে কাজে লাগানো উত্তম হবে তাহলে এক- তৃতীয়াংশেরই ওসীয়ত করে যেতেন।

হযরত সালমান ফারসী ও হযরত আবু যার গিফারীর খোদাভীতি- পরহেযগারী ও অন্যান্য ফজিলত ও মর্যাদার কারণে সবাই তাদেরকে খবু ভালোভাবে চেনে। তাদের জীবন যাপনের পদ্ধতি ও চরিত্র- আখলাকও ছিল এরূপ।

হযরত সালমান ফারসী যখন বাইতুলমাল থেকে নিজের বাৎসরিক ভাতা গ্রহণ করতেন তখন সেখান থেকে এক বছরের খরচাদিকে বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় টাকা- পয়সা নিজের কাছে সংরক্ষিত রাখতেন যাতে করে পরবর্তী বছরের ভাতা পাওয়া পর্যন্তকোন অসুবিধায় পড়তে না হয়। লোকেরা সালমানকে জিজ্ঞাসা করলো :

আপনি এতো বড় একজন মোত্তাকী পরহেযগার লোক হয়েও এক বছরের পুঁজি জমা করে রাখার চিন্তা- ভাবনা করছেন! ধরুন আজকালের মধ্যেই আপনার মৃত্যু হয়ে গেল এবং বছরের শেষ পর্যন্তজীবিত থাকতে পারলেন না তাহলে এক বছরের পুঁজি জমা করে রাখার পেছনে ফায়দা কি? তাদের প্রশ্নের জবাবে হযরত সালমান ফারসী বললেন, হতে পারে আমি মরবো না। তোমরা কেন এ কথা ধরে নিয়েছো যে, আমি মরেই যাবো। এর বদলে তোমরা এটাও ধরে নিতে পারো যে, আমি আগামী বছর পর্যন্তবেঁচে থাকবো। আর যদি আমি জীবিত থেকে যাই তাহলে আমার জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় খরচাদির সর্বাবস্থায় দরকার হবে। হে অজ্ঞ লোকেরা! তোমরা এ বাস্তব সত্য সম্পর্কে মোটেও ধারণা রাখো না যে, মানুষের কাছে যদি জীবন যাপনের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বর্তমান না থাকে তাহলে তার মন আল্লাহর আনুগত্য করার ব্যাপারে বেপরোয়া হয়ে যায় এবং আলার আনুগত্য করার জন্য অন্তরের যে স্বস্তিও প্রশান্তিদরকার তার মধ্যে সেটার অভাব দেখা দেয়। আর যদি জীবনযাপন সামগ্রী তার কাছে পুরোপুরি বর্তমান থাকে তাহলে সে আল্লাহর আনুগত্য করার ক্ষেত্রে মোটেও অবহেলা করে না।

কিন্তু হযরত আবু যার গিফারীর নিকট কিছু উট ও ভেড়া- বকরী ছিল, যেগুলোর দুধ পান করে তিনি জীবন যাপন করতেন। কখনো যদি তার গোশত খাবার ইচ্ছা হতো কিংবা বাড়িতে যদি কোন মেহমান আসতো অথবা কোন দরিদ্র- গরিব মানুষের অভাব- অনুভব করতেন তাহলে সে

জন্তুগুলো দ্বারা প্রয়োজন মেটাতেন। অন্য লোকদের মাঝে গোশত বন্টন করার সময় নিজের অংশটুকুনও রেখে নিতেন।

তাদের চাইতে বড় মোত্তাকী ও পরহেযগার লোক আর কে ছিলেন? মহানবী (সাঃ) তাদের সম্পর্কে যা কিছু বলেছেন তা তোমরা ভালো করে জানো। তারা তাকওয়া- পরহেযগারীর নামে নিজেদের সব কিছু বিলিয়ে দেননি। আজ তোমরা জীবন যাপনের যে পন্থা ও মতবাদ উদ্ভাবন করেছো এবং প্রচার করে বেড়াচ্ছো যে, লোকেরা যেন নিজেদের পরিবার- পরিজনের চিন্তা- ভাবনা না করে নিজেদের সমস্ত অর্থ সম্পদ থেকে হাত গুটিয়ে নেয় এবং দুনিয়া ত্যাগ করে বৈরাগ্যবাদ গ্রহণ করে। পক্ষান্তরে রাসূলে পাকের সাহাবাগণ কখনো এ পন্থা অবলম্বন করেননি।

আমি আনুষ্ঠানিকভাবে এ হাদীসটি বর্ণনা করছি, যা আমার পিতা ও তার পিতৃ পুরুষগণ রসুলুল্লাহর মাকবুল (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। আমি তোমাদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছি। রাসূলে আকরাম (সাঃ) বলেছেন :

ঈমানদার লোকেরা আশ্চর্যজনক গুণ- বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে থাকে। যদি তার দেহকে কেটে টুকরো টুকরো করা হয় তাতেও তার জন্য মঙ্গল ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আর যদি তাকে পৃ থিবীর পূর্ব ও পশ্চিমের সমস্তদেশগুলোর রাজত্ব দান করা হয় তাহলে সেটাও তার জন্য মঙ্গল ও কল্যাণের ব্যাপারই হবে।

ঈমানদার লোকদের কল্যাণ ও মঙ্গল কি এতেই নিহিত যে, সে অবশ্যই দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তহবে? মুমিনদের উচ্চ মর্যাদা নির্ভর করে ঈমান ও আকীদা বিশ্বাসের উপর। তাই সে দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত অবস্থায় থাকুক অথবা সম্পদের প্রাচুর্যে ডুবে থাকুক, কর্তব্যগুলো যথারীতি আঞ্জাম দিয়ে থাকে। এটাই সে বিশেষ ও ব্যতিক্রম গুণ- বৈশিষ্ট্য যা একজন মর্দে মুমিনের মধ্যে পরিপূর্ণরূপে পাওয়া যায়। আর এ কারণেই যে কোন প্রকারের কষ্ট ও অভাব- অনটন এবং আরাম ও সুবিধা তার জন্য কল্যাণ ও মঙ্গল হয়ে যায়।

আমি জানি না এ বিষয়ে এতোক্ষণ পর্যন্ত আমি যে বক্তব্য রেখেছি, তা তোমাদের জন্য যথেষ্ট কিনা? নাকি এ বিষয়ে আমাকে আরো কিছু বলতে হবে? তোমরা জানো যে, ইসলামের প্রথম

দিকে মুসলমানদের সংখ্যা খুবই কম ছিল। তখন জিহাদের বিধান ছিল এই যে, একজন মুসলমান দশজন কাফেরের মোকাবিলায় লড়াই করবে। আর যে এমনটা না করতো সে গুণাহগার, নাফরমান ও অপরাধী বলে বিবেচিত হতো। কিন্তু যখন মুসলমানদের সংখ্যা বেড়ে গেল এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অস্ত্র- সরঞ্জাম ও সুযোগ- সুবিধা বৃদ্ধি লাভ করলো তখন মহান আল্লাহ তাঁর দয়া ও মেহেরবানী দ্বারা সে বিধানের পরিবর্তন করে দিলেন। তখন প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব হলো সে দুইজন কাফেরের সাথে মোকাবিলা করবে। এর চেয়ে বেশির সাথে লড়াই করা তার কর্তব্য নয়।

আমি তোমাদেরকে ইসলামের বিচার আদালত এবং বিচার আইন বিষয়ে প্রশ্ন করবো। ইসলামে মজলুমের প্রতি ন্যায়- ইনসাফ করার এবং অপরাধীর শাস্তি প্রদার্নের ব্যাপারে কি বিধানের ব্যবস্থা্' রয়েছে? ধরো তোমাদের মধ্যে থেকে কারো বিরুদ্ধে ইসলামী আদালতে তার স্ত্রীর খোরপোষের বিষয়ে মামলা দায়ের করা হয়েছে। আর বিচারক তার বিরুদ্ধে এ রায় প্রদান করলো যে, তাকে তার স্ত্রীর খোরপোষ দিতে হবে। তখন সে কি ওযর- আপত্তি পেশ করবে এবং নিজের স্ত্রীর খোরপোষের ব্যবস্থা কিভাবে করবে? তখন কি সে এ ওযর- আপত্তি পেশ করবে যে, আমি একজন মোত্তাকী- পরহেযগার মানুষ এবং আমি দুনিয়ার অর্থ- সম্পদ পরিত্যাগ করার নীতি অবলম্বন করেছি? তখন কি তার এ আপত্তি গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে? আর এটা কি সঙ্গত হবে? তোমাদের আকীদা বিশ্বাস মতে কি বিচারকের এ নির্দেশ ন্যায়- ইনসাফ ভিত্তিক নয়? নাকি সেটা অন্যায়- অবিচার ভিত্তিক? যদি তোমরা বলো যে, বিচারকের এ হুকুম অন্যায় ও অবিচার ভিত্তিক তাহলে তার অর্থ এ দাঁড়াবে যে, তোমরা পরিষ্কার মিথ্যা বলছো। শুধু তাই নয়, বরং তোমাদের এ মিথ্যা দ্বারা তোমরা সমস্ত মুসলমানের সাথে অন্যায় ও বেইনসাফীর কাজ করছো। আর যদি বলো যে, বিচারকের এ বিচার সঠিক তাহলে তার অর্থ হবে যে, তোমাদের ওযর- আপত্তি গ্রহণযোগ্য নয় এবং তা বাতিল। সুতরাং তোমরা এ কথা স্বীকার করে নাও যে, তোমাদের জীবন পদ্ধতি ও মতবাদ ভ্রান্তও বাতিল।

এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মানুষের জীবনে এমন অনেকগুলো অবস্থা আছে যেখানে মুসলমানরা অনেক জরুরি ও অজরুরি খরচ আঞ্জাম দিয়ে থাকে। যেমন কখনো যাকাত দিতে হয়। আবার কখনো কাফফারা (অপরাধের শরীয়তী মাশুল) দিতে হয়, তাহলে যদি তোমাদের মনগড়া সংশোধন মেনে নেয়া হয় এবং সমস্তলোক (তোমাদের মতের) মোত্তাকী পরহেযগার হয়ে যায় আর সকল লোকই যদি জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তখন এমন অবস্থায় এ সমস্ত ফরজ সদকা ও কাফফারার কি হবে? সোনা-রূপা, ভেড়া-বকরী, গরু-মহিষ, উট- দুম্বা ও অন্যান্য জন্তু-জানোয়ার, খোরমা, কিশমিশ ইত্যাদির যাকাত দেয়া ফরজ। তাহলে এসব জিনিসের ফরজ যাকাতের কি হবে? যাকাত কি এ জন্য ফরজ করা হয়নি যে, এর দ্বারা গরিব ও অসহায় লোকদের জীবনকে সুন্দর করে গড়া যায়? আর গরিব লোকও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন যাপন করতে পারে? দান-উপহারের দ্বারা সৌভাগ্যবান হতে পারে? ইসলামের এ বিধানটি নিজেই এ কথার সাক্ষ্য-প্রমাণ বহন করে যে, ইসলামের সমস্ত আইন-কানুনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের জীবনযাত্রাকে সুখ-সমৃদ্ধির পান্তে পৌঁছে দেয়া এবং তার সুখ নিশ্চিত করা। আর যদি দ্বীনের উদ্দেশ্য হতো দারিদ্র্য ও দুনিয়া ত্যাগ এবং দ্বীনের শিক্ষা-দীক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যদি এটা হতো যে, মানুষ এ দুনিয়া ও তার ধন-সম্পদ থেকে দূরে থাকবে এবং ফকির ও দরিদ্রের জীবন বেছে নেবে, তাহলে তো তার অর্থ এ দাঁড়াবে যে, যারা গরিব-মিসকিন তারা জীবনের আসল ও উচ্চ লক্ষ্য হাসিল করে ফেলেছে। কাজেই তাদেরকে আর কোন কিছু দেয়া উচিত হবে না যাতে করে তাদের এ মঙ্গল ও কল্যাণকর অবস্থা থেকে সরে যেতে না পারে। এর সাথে সাথে গরিব-মিসকীনদের উচিত হবে যে, তারা কারো কাছ থেকে কোন দান ইত্যাদি কখনোই গ্রহণ করবে না যাতে করে তাদের কল্যাণ ও মঙ্গলকর অবস্থা স্থায়ী থেকে যায় ।

মূল কথা হলো যে, যদি তোমাদের কথা সত্য হিসাবে মেনে নেয়া হয় তাহলে তো কোন লোককেই তার ধন-সম্পদ তার কাছে রেখে দেয়া উচিত নয়, বরং তার সমস্ত সম্পদ অন্যদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া উচিত। ফলে যাকাতের কোন অবকাশই বাকি থাকে না।

তাহলে এখন এ কথা পরিষ্কারভাবে জানা গেল যে, তোমরা একটা মারাত্মক ও খারাপ রাস্তা অবলম্বন করেছো এবং একটা মন্দ পথে লোকদেরকে আহবান করছো। তোমরা যে মতবাদে বিশ্বাস করছো এবং অপরাপর লোকদেরকেও সে পথের দিকে আহবান করছো তার ভিত্তি হলো মুর্খতা, কোরআনী শিক্ষা সম্পর্কে এবং রাসূল (সাঃ)- এর হাদীস ও সুন্নত সম্পর্কে অজ্ঞতা। এ হাদীসগুলো সে হাদীস নয় যা সন্দেহের চোখে দেখা যেতে পারে, বরং এগুলো সে হাদীস যার সত্যতা ও বিশুদ্ধতার সাক্ষী স্বয়ং আল- কোরআন। কিন্তু তোমরা সে নির্ভরযোগ্য ও সনদ যুক্ত হাদীসগুলো গ্রহণ করতে অস্বীকার করছো কারণ সেগুলো তোমাদের মনগড়া মতাদর্শের মোতাবেক নয়। আর এটাও তোমাদের আরেকটা মুর্খতা। তোমরা আল- কোরআনের আয়াতের মধ্যে নিহিত উত্তম ও আশ্চর্যজনক ভেদগুলোর প্রতি চিন্তা- ভাবনা করো না। নাসেখ- মানসখ ও মোহকাম- মোতাশাবেহ আয়াতগুলোর মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয় করতেও তোমরা অনভিজ্ঞ। আর আদেশ ও নিষেধগুলোও তোমরা নির্ণয় করতে পার না।

তোমরা আমাকে হযরত সুলাইমান ইবনে দাউদ (আঃ)- এর কাহিনীর ব্যাপারে জবাব দাও- যিনি মহান আল্লাহর দরবারে এমন একটি রাজত্ব চেয়েছিলেন যার চাইতে বৃহৎ আর কোন রাজ্য কেউ পেতে না পারে।[২১] আর মহান আল্লাহ তাকে ঠিক তেমনি একটি রাজত্ব দানও করেছিলেন। আর এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, আল্লাহর নবী সুলাইমান (অঃ) তার প্রাপ্য অধিকার ব্যতীত প্রার্থনা করতে পারবে না। মহান আল্লাহ কোরআন মজীদে এটাকে সুলাইমানের দোষের বিষয় বলে সাব্যস্ত করেননি আর কোন মুমিন দোষের বিষয় বলে সাব্যস্ত করেননি। আজ পর্যন্ত কাউকে এ কথা বলতে দেখা যায়নি যে, হযরত সুলাইমান (আঃ) এ পৃথিবীতে এতো বিস্তৃত ও নজিরবিহীন রাজত্ব কেন প্রত্যাশা করলেন? এমনিভাবে হযরত সুলাইমান (আঃ) এর পূর্বে (তার পিতা) হযরত দাউদ (আঃ) এর ঘটনা স্মরণযোগ্য। অনুরূপভাবে হযরত ইউসফু (আঃ)- এর ঘটনাতেও দেখা যায় হযরত ইউসুফ (আঃ) তৎকালীন বাদশার নিকট সরকারিভাবে একথা বলছেন : রাজ্যের কোষাগারের তথা অর্থনৈতিক বিষয়াদির দায়- দায়িত্বের কাজটি আমার উপরে ছেড়ে দিন। কেননা আমি নির্ভরযোগ্য, বিশ্বস্তও অভিজ্ঞ।[২২]

অতঃপর অবস্থা এই দাঁড়ালো যে, মিশর থেকে ইয়ামেন পর্যন্ত বিস্তৃত বিরাট সাম্রাজ্যের সমস্তদায়- দায়িত্বই তার উপর ন্যস্ত হলো। তিনি হলেন সাম্রাজ্যের বাদশাহ। এ সময় আশপাশের দেশগুলোতে দেখা দিল দুর্ভিক্ষ। সে সব দেশের লোকেরা তার রাজ্য থেকে শাক- সবজি, খাদ্য- খাবার ইত্যাদি কিনে নিয়ে যেতো। কিন্তু না, হযরত ইউসুফ (অঃ) কোনদিন কারো সাথে বেইনসাফী ও অন্যায় কাজ করেছেন। আর না তার থেকে কোন দোষের কথা আল্লাহ কোরআনে বলেছেন। ঠিক তেমনিভাবে জনাব যুলকারনাইনের কাহিনীও কারো অজানা নয়। তিনি খোদার এমন এক বান্দা ছিলেন যে, মহান আল্লাহকে ভালোবাসতেন। আর আল্লাহও তাকে ভালোবাসতেন। তাই তো জাগতিক কারণসমূহ তার অধিকারে চলে আসে। তিনি পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত জগতের অধিপতি হন।

শোনো হে সুফীদল! এ ভ্রান্তপথ পরিত্যাগ করো এবং ইসলামের প্রকৃত ভিত্তিগুলো আঁকড়ে ধরো। মহান আল্লাহ যে সব বিষয়ে বিধি- নিষেধ আরোপ করেছেন তার সীমা লংঘন করো না। আর নিজেদের মনগড়া কোন কিছু আবিষ্কার করো না। যে সব বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান নেই সেখানে হস্ত ক্ষেপ করো না। সে সব বিষয়ের জ্ঞান জ্ঞানী লোকদের কাছ থেকে অর্জন করো। নাসেখ, মানসুখ, মোহকাম, মোতাশাবেহ ও হালাল- হারামের জ্ঞান হাসিলের চেষ্টায় লিপ্ত থাকো। এতে কেবল তোমাদের জ্ঞান অর্জনের কল্যাণই নয়, বরং তোমাদেরকে অজ্ঞতা ও মুর্খতার অভিশাপ থেকে মুক্তি দেবে। অজ্ঞতা থেকে দূরে থাকো। কেননা অজ্ঞতার পক্ষপাতিত্বকারীদের সংখ্যা অনেক। তার বিপরীতে জ্ঞানের সমর্থক বড়ই কম। মহান আল্লাহ বলেন, জ্ঞান গরিমা ও বদ্ধিমত্তা, জ্ঞানী বুদ্ধিমানদের চাইতেও বড়।[২৩]

১৬

হযরত আলী ও আছেম (আঃ)

জাঙ্গে জামাল বা উষ্ট্রের যুদ্ধ[২৪] শেষ হবার পর হযরত আলী (আঃ) একবার বসরা শহরে গেলেন। বসরায় অবস্থানকালে একদিন তিনি তাঁর এক অসুস্থ বন্ধু আলা ইবনে যিয়াদ হারেছীকে দেখতে বাড়িতে গেলেন। তার বাড়িটি ছিল খুব প্রকাণ্ড ও জাঁকজমকপূর্ণ। হযরত আলী (আঃ) তাঁর বন্ধুর এ বিরাট বাড়ির সৌন্দর্য দেখে তাকে বললেন, 'এ দুনিয়াতে তোমার এতো বিরাট ও সুন্দর একটা বাড়ি কোন্ কাজের জন্য, তুমি যখন পরকালে একটা প্রশস্তও সুন্দর বাড়ির অধিক দরকার মনে করছো? কিন্তু তুমি যদি এখন চাও তবে দুনিয়াতে তোমার এ বাড়িটিকে আখেরাতের একটি জাঁকমজকপূর্ণ বাড়ি লাভ করার উসিলা বানাতে পারো। তার পন্থা হলো যে, তুমি তোমার এ বাড়িতে মেহমানদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করবে। লোকদের সাথে নম্র ও ভালোবাসার মন নিয়ে আচার- ব্যবহার করবে। এ বাড়িতে মুসলমানদের যে হক অধিকার রয়েছে তা যথাযথ আদায় করো এবং লোকদেরকে তাদের হক অধিকার প্রদানের ব্যাপারে সম্ভাব্য সব রকমের সাহায্য- সহযোগিতা করবে যাতে করে লোকেরা এ বাড়িটিকে তাদের প্রাপ্য অধিকার পাওয়ার কেন্দ্র বলে স্বীকার করে নেয়। আসল কথা হলো তুমি এ বাড়িটিকে কেবল তোমার নিজের কাজের জন্যই ব্যবহার করবে না, বরং সাধারণ মুসলমানদের উপকার ও কল্যাণের কেন্দ্র বানিয়ে দাও দেবে।

আলা : হে আমীরুল মুমিনীন (আঃ)! আমি আমার ভাই আছেম সম্পর্কে আপনার কাছে একটি অভিযোগ পেশ করতে চাই।

বলো, তোমার কি অভিযোগ? সে দুনিয়াকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করেছে এবং ছেঁড়া- ফাঁড়া জামা- কাপড় পরিধান করে বৈরাগ্যবাদ গ্রহণ করেছে। কারো সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই।

তাকে আমার সামনে হাজির করো।

আছেমকে তাঁর সামনে হাজির করা হলো। হযরত আলী (আঃ) তাকে বললেন, হে নিজের জীবনের দুশমন! শয়তান তোমার জ্ঞান- বুদ্ধি হরণ করে নিয়েছে। আমি বুঝতে পারছি না যে, তোমার স্ত্রী ও সন্তানদের প্রতি কেন তোমার মায়া- দয়া হচ্ছে না? তুমি কি এ কথা মনে করে নিয়েছো যে, যে মহান আল্লাহ এ দুনিয়ার সমস্ত পাক- পবিত্র নিয়ামত তোমার জন্য হালাল ও বৈধ বলে ঘোষণা করেছেন, তিনিই আবার তোমার উপর এ কারণে নারাজ হয়ে যাবেন যে, তুমি সে সমস্ত নেয়ামত উপভোগ করছো? তুমি কি খোদার কাছে এ নিয়ামতসমূহ থেকে তুচ্ছ?

জবাবে আছেম বললো, ‘হে আমীরুল মোমিনীন! আপনিও তো আমার মতোই। আপনিও তো নিজের ওপর অনেক কষ্ট দিচ্ছেন। আপনিও তো নরম কাপড়- চোপড় পরিধান করেন না এবং রুচিসম্পন্ন খাদ্য খাবার খাচ্ছেন না। এভাবে আমিও সে সমস্ত কাজই করছি যা আপনি করছেন। আমি সে পথেরই অনুসরণ করে চলেছি যে পথে আপনি চলছেন।

হযরত আলী (আঃ) বললেন, হে আছেম! তুমি ভুল করছো। আমার ও তোমার মাঝে একটা পার্থক্য রয়েছে। আমি যে পদে অধিষ্ঠিত আছি তুমি তা নও। আমি উম্মতের নেতা, শাসক ও পথ প্রদর্শকের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। আর শাসক ও পথ প্রদর্শকের জীবন যাপনের পদ্ধতি ও দায়-দায়িত্ব সাধারণ মানুষদের চাইতে ভিন্নতর অর্থাৎ একজন শাসন কর্তার যে কর্তব্য একজন সাধারণ মানুষের তা নয়। মহান আল্লাহ ন্যায়পরায়ণ শাসকদের জন্য ফরজ করে দিয়েছেন যে, সে তার জাতির দুর্বল ও নিম্নস্ত রের লোকদের জীবন যাপনের প্রতি দৃষ্টি রেখে নিজের জীবন পরিচালনা করবে। মহান আল্লাহর হুকুম মোতাবেক ন্যায়পরায়ণ শাসকের এভাবে জীবন যাপন করা উচিত যেভাবে গরিব ও নিম্নস্তরের লোকদের অন্তরে দুঃখ না থাকে এবং দারিদ্র্য ও অভাব-অনটন তাদের অন্তরে কোন প্রভাব বিস্তার করতে না পারে। এ কারণে আমার কর্তব্য এক রূপ আর তোমার কর্তব্য অন্যরূপ।[২৫]

১৭

ধনী ও দরিদ্র

হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) তাঁর সব সময়ের নিয়ম মোতাবেক নিজের বাড়িতে দরবারে বসেছিলেন। তাঁর সাথী ও বন্ধুগণ আশপাশে তাঁকে এভাবে ঘিরে রেখেছিল, যেমন আংটির মাঝে পাথর। এমন সময় ছেঁড়াফাঁড়া জামা- কাপড় পরিহিত একজন গরিব লোক রাসূলের (সাঃ) এ মজলিসে হাজির হলো। ইসলামী রীতিনীতির দৃষ্টিতে মজলিসে উপস্থিত প্রত্যেকেই সমমর্যাদার অধিকারী এবং বৈঠকের আদব ও রীতি হচ্ছে নবাগত ব্যক্তি যেখানেই খালি স্থান দেখবে সেখাবেই বসে যাবে। কারো এটা মনে করা উচিত হবে না যে, অমুক স্থান আমার মর্যাদার সাথে মানানসই নয়। সে হিসাবে উক্ত গরিব লোকটি বসার জন্য একটি খালি জায়গা খুঁজতে লাগলো। সে চারদিকে তাকিয়ে এক কোণায় একটি খালি জায়গা দেখতে পেলো। তাই চুপচাপ সেখানে গিয়ে বসে পড়লো। ঘটনাক্রমে সেখানে পূর্ব থেকেই একজন ধনী লোক বসা ছিল। ঐ গরীব লোকটিকে তার পাশে বসতে দেখে সে তার মূল্যবান জামাকাপড় টেনে নিল এবং এক পাশে সরে গেল। রাসূলে খোদা (সাঃ) খুব লক্ষ্য করে এ দৃশ্যটি দেখছিলেন। ধনী লোকটির এ আচরণ দেখে মহানবী (সাঃ) তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তুমি ভয় পেয়েছো যে, এ গরিব লোকটির দারিদ্র্য ও অভাব অনটনের ছায়া আবার তোমার উপরও যেন না পড়ে।

সে বললো, না! হে আল্লাহর রাসূল! এমনটা নয়।

রাসূল (সাঃ) বললেন, তাহলে এমন কি কারণ ছিল যে, তমি্ু এ গরিব লোকটিকে দেখেই এক পাশে সরে গেলে?

সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার ভুল হয়ে গেছে। আমি আমার অন্যায় স্বীকার করছি। এখন আমি এ অপরাধের কাফফারা দিতে প্রস্তুত আছি। আমি আমার এ অপরাধের কাফফারা হিসাবে আমার সম্পদের অর্ধেক অংশ এ গরিব ভাইকে দান করে দিতে চাই।

ধনী লোকটির এ কথা শুনে সে গরিব লোকটি বলে উঠলো, কিন্তু আমি তা গ্রহণ করার জন্য মোটেও প্রস্তুত নই।

রাসূল (সাঃ)- এর দরবারে বসা অন্য সমস্তলোকেরা জিজ্ঞাসা করলো, কেন?

উত্তরে সে বললো, আমার ভয় হচ্ছে যে, আবার ধন- সম্পদের প্রাচুর্যে একদিন আমিও এরূপ অহংকারী হয়ে না যাই। আমিও আমার অপর মুসলিম ভাইয়ের সাথে এধরনের আচরণ শুরুকরে না দেই, যেমনটি আজ এ ব্যক্তি আমার সাথে করেছে।[২৬]

১৮

এক দোকানী ও এক পথিক

উঁচু- লম্বা ও প্রশস্তদেহের অধিকারী এক ব্যক্তি একদিন কুফার বাজারের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলেন। তার চেহারায় এমন সব নিদর্শন পরিলক্ষিত হচ্ছিল, যেগুলোকে রণাঙ্গনের স্মৃতিচিহ্ন বলা যেতে পারে। তার চোখের পাশ দিয়ে কাটা চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল। এদিকে এক দোকানি তার দোকানে বসেছিল। বন্ধুদেরকে হাসানোর জন্য সে এক মুষ্টি ময়লা তার উপর নিক্ষেপ করলো। দোকানদারের এ অভদ্র আচরণের জন্য সে পথিক কোন প্রকার রাগ বা ক্রোধ প্রকাশ না করে অত্যন্ত প্রশস্তিও নিশ্চিন্তমনে এভাবে পথ এগিয়ে চললেন যেন কোন কিছুই ঘটেনি। পথিক কিছু দূর চলে যাবার পর দোকানির এক বন্ধু তাকে বললো, তুমি যে পথিকের উপর ময়লা নিক্ষেপ করে তার অবমাননা করেছো, তিনি কে তা কি তুমি জানো? দোকানি বললো, না, অমি তো তাকে মোটেও চিনি না। আমি তো মনে করেছি সহস্র পথিকের ন্যায় তিনিও একজন। তোমার যদি জানা থাকে তাহলে বলো, এ লোকটি কে?

বন্ধুটি বললো, আসলেই তুমি তাকে চেন না? বড় আশ্চর্যের বিষয়! তিনি আর কেউ নন। তিনি হলেন ইসলামী সেনাবাহিনীর প্রখ্যাত সেনাপতি জনাব মালিক আশতার নাখঈ। বড় আশ্চর্যের কথা! তিনি বিখ্যাত সেনাপতি মালিক আশতার? সেই মালিক আশতার, যার ভয়ে বাঘের কলিজাও পানি হয়ে যায়। যার নাম শুনে শত্রুপক্ষের দেহ- মন কেপেঁ ওঠে!

: হ্যাঁ! হ্যাঁ!! তিনি সে মালিক আশতার।

: হায় অফসোস! আমি তো অনেক বড় অন্যায় করে ফেলেছি। এক্ষণই তিনি হুকুম দিবেন আমার অপরাধের কঠিন শাস্তি দেয়া হোক! আমি এক্ষণই তার পিছু পিছু দৌঁড়ে যাই এবং তার কাছে নিবেদন করি যে, আমার অপরাধ ক্ষমা করে দিন। না জেনে আমি এ অন্যায় কাজ করে ফেলেছি।

এ কথা বলেই দোকানদার জনাব মালিক আশতারের পেছনে পেছনে দৌঁড়াতে লাগলো। কিছু দূর যাবার পর সে দেখতে পেলো যে, মালিক আশতার একটা মসজিদের দিকে যাচ্ছেন। দোকানীও তার পিছে পিছে মসজিদে প্রবেশ করলো। দেখতে পেলো তিনি নামায আদায় করছেন। কিছুক্ষণ পর্যন্ত সে সেখানে অপেক্ষা করলো। নামায শেষ হবার সাথেই সাথেই দোকানি জনাব মালিক আশতারের সামনে এসে অত্যন্ত লজ্জিত ও বিনম্রভাবে নিজের পরিচয় দিয়ে বললো, আমি সে লোক, যে নিজের অজ্ঞতা ও বোকামির কারণে আপনার সাথে অন্যায় করেছি। হযরত মালিক আশতার বললেন, খোদার কসম করে বলছি, মসজিদে আসার আমার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। আমি তো কেবল তোমার জন্যই এখানে এসেছি। কেননা আমি বুঝতে পারলাম যে, তুমি একটা অজ্ঞ, জাহেল ও পথভ্রষ্ট লোক। আর লোকদেরকে অন্যায়ভাবে কষ্ট দিয়ে থাকো। তোমার এ অজ্ঞতা দেখে আমার মনে ব্যথা পেলাম। তাই আমি মসজিদে চলে এসেছি এ জন্য যে, আল্লাহর নিকট তোমার সঠিক পথে হেদায়েত লাভের জন্য দোয়া করবো। তুমি যে ভয় পাচ্ছ তেমন কোনো উদ্দেশ্য আমার ছিল না।[২৭]

১৯

ইমাম গাযযালী ও ডাকাত দল

ইসলামী জ্ঞান রাজ্যের প্রখ্যাত পন্ডিত ব্যক্তি ইমাম গাযযালী ইরানের তুস নগরীর অধিবাসী ছিলেন। পবিত্র মাশহাদের নিকটতম একটি এলাকার নাম তুস। সেকালে নিশাপুর ছিল ইসলামী শিক্ষা- দীক্ষার প্রাণকেন্দ্র।

পঞ্চম হিজরী শতাব্দীর কথা। নিশাপুর শহরটি তখন ইসলামী জ্ঞানের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত হতো। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা অর্জনের জন্য এখানে আসতো। তাই গাযযালীও জ্ঞান অর্জনের জন্য এখানে আসলেন। দীর্ঘদিন পর্যন্ত সুযোগ্য ওস্তাদ ও ওলামাগণের তত্ত্বাবধানে বিশেষ মনোযোগ ও আগ্রহের সাথে জ্ঞান শিক্ষা করতে থাকেন। তার নিয়ম ছিল এই যে, অভিজ্ঞ আলেম ও পন্ডিত ব্যক্তিদের সান্নিধ্যে বসে যে সব জ্ঞান অর্জন করতেন তা তিনি খাতায় লিপিবদ্ধ করতেন যাতে ওস্তাদের সে শিক্ষা ভুলে না যান এবং প্রয়োজনের সময় তা দ্বারা আরো বেশী উপকার লাভ করতে পারেন। এভাবে ছাত্র জীবনে জনাব গাযযালী বিভিন্ন বিষয়ের উপর এক মূল্যবান জ্ঞান- ভাণ্ডার জমা করলেন যা তার নিকট নিজের জীবনের চাইতেও অধিক মূল্যবান ও প্রিয় ছিল।

কয়েক বছর পর্যন্ত নিশাপুরে ছাত্র জীবন অতিবাহিত করার পর যখন গাযযালী নিজের দেশে ফিরে যাবার মনস্থ করলেন তখন নিজের জমাকৃত সমস্ত জ্ঞান- ভাণ্ডার একত্র করে একটি পুটুলি বাঁধলেন এবং তা সাথে নিয়ে দেশের দিকে যাত্রা করলেন।

পথে একদল ডাকাত তাদের কাফেলার উপর আক্রমণ করলো। ডাকাতরা কাফেলাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে লোকদের জিনিসপত্র মালামাল ও টাকা- পয়সা ছিনিয়ে নিয়ে এক জায়গায় জমা করতে লাগলো।

এভাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই ডাকাত দল ইমাম গাযযালীর মালামালের নিকট এসে গেল। ডাকাতরা ইমাম গাযযালীর নিকট এসে তার পুটুলি ছিনিয়ে নিতে চাইল। এমন সময় তিনি ডাকাতদের

সামনে দাঁড়িয়ে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলেন এবং ডাকাতদের বললেন, দেখো এ পুটুলি ব্যতীত তোমরা আর যা কিছু নিতে চাও সব নিয়ে যাও। কিন্তু আমার নিবেদন হচ্ছে এটি তোমরা আমার কাছেই রেখে দাও।

গাযযালীর কথা শুনে ডাকাতরা ভাবলো মনে হয় পুটুলিতে অনেক টাকা রয়েছে। এ জন্যই লোকটি এটি হাতছাড়া করতে চায় না। তাই তারা এটা কেড়ে নিল। যখন তারা সেটা খুললো তখন দেখলো যে, এর মধ্যে কাগজের জমাকৃত স্তুপ ব্যতীত আর কিছুই নেই। তারপর ডাকাতরা ইমাম গাযযালীকে জিজ্ঞাসা করলো, এ পুটুলিতে কি এমন বিরাট সম্পদ ছিল যা রক্ষা করার জন্য তুমি এভাবে হাউমাউ করে কাঁদছিলে? আমাদের চিন্তায় আসে না যে, এসব কাগজপত্র দিয়ে তুমি কি উপকর লাভ করবে? এ কাগজগুলো তোমার কি কাজে আসবে?

ইমাম গাযযালী বললেন, এ পুটুলিতে যা আছে নিঃসন্দেহে তা তোমাদের কোন কাজে আসবে না। কিন্তু আমার জন্য তা অনেক উপকারী ও মূল্যবান সম্পদ।

: কিন্তু এ কথাও তো বলবে যে, এগুলো তোমার কোন কাজের জন্য?

: এ কাগজগুলো আমার এ পর্যন্তকার ছাত্র জীবনের মূল্যবান সম্পদ যা আমি আমার উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ওস্তাদগণের সাহায্যে জমা করেছি। তোমরা যদি আমার এ জ্ঞান- ভাণ্ডার ছিনিয়ে নাও তাহলে আমার সমস্ত জ্ঞান- ভাণ্ডার ধ্বংস হয়ে যাবে। আর আমার এতো বছরের মেহনত হবে বৃথা। : এটাই কি সত্য কথা যে, তোমার সারা জীবনের সমস্ত জ্ঞান- ভাণ্ডার এ পুটুলিতে রয়েছে?

: জ্বী হ্যাঁ!

: যে জ্ঞান কোন পুটুলি কিংবা সিন্ধুকের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখা যায় বা চোর- ডাকাত ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারে প্রকৃতপক্ষে তা জ্ঞানই নয়। যাও এবং নিজের অজ্ঞতা ও বোকামির উপর চিন্তা- ভাবনা করো। আমাদের ভেবে পাই না, সেটা কি ধরনের ও জ্ঞান যা চোর- ডাকাতরা চুরি করে নিয়ে যেতে পারে?

ডাকাতদের এ সহজ- সরল ও সাধারণ কথায় গাযযালীর মতো যোগ্য ও পরিশ্রমী ছাত্রের অন্তরে দাগ কাটলো। যে গাযযালী এতদিন ওস্তাদের কাছ থেকে শোনা প্রতিটি কথাই খাতায় লিখে রাখতেন এখন তিনিই এ চেষ্টায় লিপ্ত হলেন যে, চিন্তা- ভাবনা দ্বারা নিজের জ্ঞান- বুদ্ধির লালন করবেন। আর অনুসন্ধান ও যাচাই- বাছাই করে নিজের স্মৃতির খাতায় লিখে রাখবেন।

ইমাম গাযযালী নিজেই বলেছেন, ডাকাতদের মুখ থেকে নিঃসৃত কথা আমার জন্য ছিল উত্তম উপদেশ এ উপদেশই আমার জীবনে চিন্তা- গবেষণার দিকনির্দেশনা দান করেছে।[২৮]

২০

ইবনে সীনা ও মাসকুবিয়্যাহ

আবু আলী ইবনে সীনা বিশ বছর বয়সেই জ্ঞানের সকল বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করে নিয়েছিলেন। খোদাতত্ত্ব, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান গণিতশাস্ত্র ও ধর্মতত্ত্বে ইবনে সীনা ছিলেন তার সময়ে শ্রেষ্ঠতম পন্ডিত। একদিন তিনি সেকালের বিখ্যাত ও নামকরা বিজ্ঞ আলেম জনাব ইবনে মাসকুবিয়্যাহর এক ক্লাসে গেলেন এবং অত্যন্তগর্ব ও অহংকারের সাথে একটি আখরোট ফল ইবনে মাসকুবিয়্যাহর সামনে রেখে বললেন, এ আখরোটটির পরিধি কতো?

ইবনে মাসকুবিয়্যাহ তার রচিত কিতাবো তাহারাতুল আ'রাক নামক গ্রন্থটি ইবনে সীনার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, প্রথমে তুমি তোমার চরিত্র সংশোধন করো। আর আমি এ আখরোটটির পরিধি বের করি। এ আথরোটটির পরিধি নির্ণয় করা আমার জন্য যতটা না প্রয়োজন তার চেয়ে তোমার নিজের চরিত্র সংশোধন করা তোমার জন্য বেশি প্রয়োজন।

আবু আলী ইবনে সীনা জনাব ইবনে মাসকুবিয়্যাহর কথা শুনে খুবই লজ্জিত হলেন। আর আজীবন এ কথাটিকে তার চরিত্রের পথনির্দেশক হিসাবে স্থান দিলেন।[২৯]

২১

দুনিয়াত্যাগীর উপদেশ

গ্রীষ্মকাল। প্রচণ্ড গরম ও প্রখর রৌদ্রতাপে মদীনা শহর ও তার আশপাশের বাগ- বাগিচা ও ক্ষেত- খামারগুলো ঝলসে যাচ্ছিল। এমন সময় মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির নামে এক ব্যক্তি যে নিজেকে একজন বড় মোত্তাকী, পরহেযগার, খোদাভীরু ইবাদতকারী ও দুনিয়াত্যাগী মনে করতো, ঘটনাক্রমে কোন এক কাজে মদীনা শহর থেকে বের হলো। হঠাৎ তার দৃষ্টি এমন একজন স্বাস্থ্যবান লোকের উপর পড়লো যিনি প্রখর রোদের পরোয়া না করে নিজের কিছু সংখ্যক সাথীকে সাথে নিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। মোটা- তাজা দেহের অধিকারী সে লোকটির চলার ধরনে বোঝা যাচ্ছিল যে, তিনি তার ক্ষেত- খামার দেখাশুনার জন্য যাচ্ছিলেন। আর তার সাথের লোকজন চাকর- বাকর ইত্যাদি হবে।

দুনিয়াত্যাগী সে লোকটি ভাবলো, এ লোকটি কে যিনি এ কঠোর গরমের দিনে রোদের মধ্যেও নিজেকে দুনিয়াদারীর মধ্যে লিপ্ত রেখেছে? এ কথা ভেবেই দ্রুত পদে সে লোকটির নিকট পৌঁছে গেল। তার নিকটে পৌঁছে সে আরো আশ্চর্য হলো যে, তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনিল হোসাইন (আঃ)। অর্থাৎ ইমাম মুহাম্মদ বাক্বের (আঃ)।

দুনিয়াত্যাগী লোকটি ভাবতে লাগলো, এ সম্ভ্রান্ত লোকটি এভাবে দুনিয়াদারীর পিছনে কেন লেগে আছে? যাই হোক না কেন, আমার তো একটা কর্তব্য আছে। আমি এ সম্ভ্রান্ত লোকটিকে কিছু উপদেশ দেবো যাতে করে তিনি দুনিয়াদারী থেকে বিরত থাকেন।

এ কথা ভেবে দুনিয়াত্যাগী লোকটি হযরত ইমাম বাক্বের (আঃ)- এর নিকট এসে তাকে সালাম জানালো। ইমাম (আঃ) নিজের ঘাম মুছতে মুছতে তার সালামের জবাব দিলেন। দুনিয়াত্যাগী লোকটি বললো, এটা কি সঙ্গত কাজ হবে যে, আপনার মত একজন সম্ভ্রান্তব্যক্তি এ প্রচণ্ডগরম রোদের মধ্যে দুনিয়াদারীর পিছনে ঘর থেকে বের হবেন, বিশেষত আপনার মতো একজন স্থুল দেহের অধিকারী লোকের জন্য তো এ রোদ ও গরম আরো অধিক কষ্টদায়ক।

সে আরো বললো, মৃত্যুর সংবাদ কে জানে? কেই বা জানে যে, সে কখন মত্যর সাথে আলিঙ্গন করবে? হতে পারে এখনই আপনার মৃত্যু এসে যাবে। আল্লাহ্ এমনটি না করুন, যদি এ অবস্থায় আপনার মৃত্যু এসে যায় তাহলে আপনার কি অবস্থা হবে? আমার মতে আপনার মতো লোকদের পক্ষে শোভা পায় না যে, এতো কড়া রোদে ও এতো কঠোর গরমের মধ্যে এভাবে কষ্ট করবেন। যা হোক আমি আপনাকে পরামর্শ দেবো যে, আপনার মতো লোকের পক্ষে এভাবে দুনিয়াদারীতে লিপ্ত হওয়াটা কখনই উচিত হবে না।

হযরত ইমাম বাক্বের (আঃ) তার একজন সাথীর কাঁধে হাত রেখে একটা দেয়ালের সাথে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে তাকে বললেন, 'যদি এ সময় আমার মৃত্যু এসে যায় তাহলে আমার মৃত্যু হবে ইবাদতরত অবস্থায় এবং আমি মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অপির্ত ফরজ কাজ পালনরত অবস্থায় এ পৃথিবী থেকে বিদায় নেবো। তোমার হয়তো জানা নেই যে, এখন আমি যে কাজে লিপ্ত আছি তা আল্লাহ্র প্রকৃত আনুগত্য ও ইবাদত- বন্দেগীরই একটা কাজ। তুমি মনে করে নিয়েছো যে, শুধু আল্লাহ্র যিকির, নামায ও দোয়া করাটাই আল্লাহ্র ইবাদত। আমারও তো নিজের জীবন আছে। আমি যদি পরিশ্রম ও কষ্ট না করি তাহলে আমার জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও খরচাদির জন্য তোমার বা তোমার মতো অন্যদের কাছে হাত পাততে হবে। আমি এখন রিযিকের সন্ধানে ও জীবন সামগ্রীর তালাশে যাচ্ছি যাতে করে আমার প্রয়োজনের সময় অপরের সাহায্য গ্রহণ করতে না হয়। মৃত্যুর ভয় তো মানুষকে তখন করা উচিত যখন সে গুণাহের কাজ, অন্যায় ও আল্লাহ্র হুকুমের বরখেলাফ কাজ করবে। মানুষ যখন আল্লাহ্র ইবাদতে লিপ্ত থাকবে তখন নয়। আমি এ সময় আল্লাহ্র হুকুমের আনুগত্য করছি। যিনি আমাদের জন্য ফরজ করে দিয়েছেন যে, অপরের স্কন্ধের বোঝা হয়ো না, বরং নিজের শ্রম- সাধনার দ্বারা নিজের আয়- রুজীর ব্যবস্থা করো।

দুনিয়াত্যাগী লোকটি বললো : আমি তো একটা আশ্চর্যজনক বিভ্রান্তিও অজ্ঞতার শিকার ছিলাম। আমি নিজের মনে ধারণা করে রেখেছিলাম যে, এ ব্যাপারে অন্যদেরকে উপদেশ দেবো। কিন্তু এখন বুঝতে পারলাম যে, আমি নিজেই একটা ভুলের মধ্যে লিপ্ত ছিলাম। আমি একটা

ভ্রান্তধারণা পোষণ করে ভুলের মধ্যে জীবন যাপন করছিলাম এবং আমার নিজেরই সংশোধনের প্রয়োজন ছিল অতীব জরুরী।[৩০]

২২

খলিফার দরবারে

মুতাওয়াককিল একজন স্বৈরাচারী আব্বাসীয় শাসক। সে হযরত ইমাম হাদী (আঃ)- এর প্রতি জনগণের আধ্যাত্মিক টান প্রত্যক্ষ করে সব সময় ভীত- সন্ত্রস্ত থাকতো। তার মনঃকষ্টের শেষ ছিল না যখন দেখতো লোকেরা আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধার সাথে ইমামের হুকুম ও নির্দেশবালীর আনুগত্য করার জন্য প্রস্তুত। শাসকের পরামর্শদাতারা তাকে আগেই বলে রেখেছিল যে, আলী ইবনে মুহাম্মদ আন নাকী (আঃ) অথার্ৎ ইমাম হাদী (আঃ) আপনার শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গোপনে বিদ্রোহ ও বিপ্লব করার ইচ্ছা রাখে। কাজেই এটা অসম্ভব কিছু নয় যে, তার বাড়ী থেকে এমন সব কাগজপত্র ও সাজ সরঞ্জাম বেরিয়ে পড়বে যা এ কথাকে প্রমাণ করবে। তাই মুতাওয়াককিল এক রাত্রে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়লো, মধ্য রাতের নীরব নিশীথে তার একদল জলাদ প্রকৃতির নির্দয় লোককে হুকুম দিল যে, ইমাম হাদী (আঃ)- এর ঘর তলাশি করো। তারপর তাকে আমার দরবারে হাজির করো। মুতাওয়াককিল এ সিদ্ধান্তটি তখন নিয়েছিল যখন সে তার শরাবখোর বন্ধুদের সাথে মদ্যপানে লিপ্ত ছিল।

যা হোক, মুতাওয়াককিলের নির্দেশ পাওয়া মাত্র তার লোকেরা আনন্দ- উলাস করে ইমামের বাড়িতে হানা দিল। তারা সর্বপ্রথম ইমাম (আঃ)- কেই খুঁজে বের করলো। দেখতে পেলো ইমাম (আঃ) একটি কক্ষ নির্জন করা এবং কার্পেটটি একপাশে গোটানো। আর তিনি বালু ও নুড়ির উপর বসে বসে আল্লাহর যিকির ও তার সাথে মনের গোপন ভেদ প্রকাশের কথাবার্তায় মশগুল আছেন। তারপর শাসক সেবাদাসরা ইমামের ঘর তলাশি শুরু করলো। তারা ঘরের আনাচে- কানাচে তলাশি করছিল। তারা যা চাচ্ছিল তেমন কিছুই হস্তগত হলো না বাধ্য হয়ে তারা কেবল ইমাম (আঃ)- কে ধরে এনে মুতাওয়াককিলের সামনে হাজির করলো।

হযরত ইমাম হাদী (আঃ) যখন উপস্থিত হলেন তখন দেখতে পেলেন মদ্যপানের আসর জমজমাট। আর মুতাওয়াককিল তার মাঝে বসে মদ পানে লিপ্ত। ইমামকে দেখে সে বললো,

‘তাকে আমার পাশেই বসার আসন দাও। ইমাম বসলেন। মুতাওয়াককিল ইমামের দিকে মদের পেয়ালা এগিয়ে দিল। তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন এবং বললেন, খোদার কসম। আমার রক্ত- মাংসে কোন দিন মদ প্রবেশ করেনি। সুতরাং এ বিষয়ে তুমি আমাকে ক্ষমা করো। মুতাওয়াককিল ইমামের আপত্তি মেনে নিল এবং বললো, তাহলে কিছু কবিতা আবৃত্তি করে শোনান। গযলের মন- মাতানো ছন্দের সূরে আমাদের এ আসরকে আরো সৌন্দর্য- মন্ডিত ও আনন্দদায়ক করে তুলুন।

ইমাম (আঃ) বললেন, আমি কোন কবি নই। পূর্বতন কবিদের কবিতা সামান্যই আমার স্মরণে আছে। মুতাওয়াককিল বললো, উপায় নেই। কবিতা আপনাকে পড়তেই হবে।

ইমাম (আঃ) কবিতা আবৃত্তি আরম্ভ করলেন।[৩১] যার বিষয়বস্তু এই :

* অনেক লোকেরাই এ পৃথিবীতে নিরাপদ- নিশ্চিন্তে ও আরাম- আয়েশে বসবাস করার জন্য উঁচু উঁচু বিরাট বিশাল দালান- কোঠা ও মজবুত দুর্গ গড়ে তুলেছে। তাদের নিরাপত্তা ও হেফাযতের জন্য তারা সব সময় সশস্ত্র সান্ত্রী পাহারাদার নিয়োগ করে রেখেছে। কিন্তু সশস্ত্র এ সিপাহী- লশকররা কেউই তাদের মৃত্যুর সাথে মোকাবিলা করতে পারেনি। আর না তাদের বিপদের সময় তাদেরকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে সফলতা লাভ করতে পেরেছে।

* অবশেষে একদিন তাদেরকে এসব উঁচু উঁচু অট্টালিকা, সুরম্য মহল ও সুদৃঢ়- মজবুত কিলাথেকে টেনে- হেঁচড়ে কবর বাড়ির ছোট্ট অন্ধকার কবরের গর্তের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অতীব দুর্ভাগ্যজনকভাবে ও অত্যন্ত অসহায় অবস্থার মতো ছোট্ট একটি সংকীর্ণ পরিসরে নিস্প্রদীপ আঁধার গোরে, চিরদিনের জন্য বসবাসের ঠিকানা বানাতে বাধ্য হয়েছে।

* এমতাবস্থায় অদৃশ্য আহবানকারী ডেকে জিজ্ঞেস করে তাদের তোমাদের সে শান- শওকত আর তখত ও তাজ কোথায় চলে গেছে আজ? কোথায় রেখে এসেছো তোমাদের প্রভাব- প্রতিপত্তি আর অহংবোধ?

* কোথায় তোমাদের সে চেহারাটি, যা তোমরা নাজ- নেয়ামত খেয়ে খেয়ে নাদুশ- নুদুশ করে লালন করেছিল? চকচকে ঝলমল রেশমী মিহি পর্দার আড়ালের গর্ব- অহংকারে ভরপুর সে মুখটি কোথায়, যা তোমরা গণমানষ থেকে অনেক দূরে লুকিয়ে রেখেছিলে?
* ভাগ্য বিপর্যয় কবর দিয়েছে তাদেরকে পরিণতি লাঞ্ছনা আর অবমাননার। ভোগ- বিলাসে লালিত দেহটিকে সঁপে দিয়েছে লোকেরা সে মাটির দয়ার কাছে, যে মাটিকে পদতলে পিষে চলতো দম্ভ অহংকার ভরে।
* দীর্ঘকাল ধরে এরা পৃথিবীতে স্বাদ- আস্বাদের রকমারি খাদ্য খাবার ভক্ষণ করে চলে এসেছিল। কিন্তু আজ তারাই পরিণত হয়েছে মাটির খাদ্যরূপে। আর তারা মাটির গর্ভেই তাদের পরিণতি ভুগতে থাকবে চিরকাল- চিরদিন।[৩২]
হযরত ইমাম (আঃ) নিজস্ব বিশেষ ভঙ্গিতে এ কবিতাটি আবৃত্তি করলেন এমনভাবে যে, উপস্থিত সকলের এমন কি স্বয়ং মুতাওয়াককিলের অন্তরের গভীরে গিয়ে দাগ কেটেছে। কবিতা আবৃত্তি শেষ হবার সাথে সাথে মদ্যপানের এ আসরে অংশগ্রহণকারী সকলের মদের নেশা কেটে গেল। মুতাওয়াককিল মদের পেয়ালাটি ছুঁড়ে মারলো। আর তার চোখ দিয়ে অশ্রুপ্রবাহিত হতে লাগলো। এভাবে মদ্যপানের এ আসরটির পরিসমাপ্তি ঘটলো। প্রকৃত সত্যের আলো একজন জালিম প্রকৃতির শাসকের অন্তরে বিরাজিত গর্ব- অহংকারের কালিমাকে পরিষ্কার করে দিল, যদিও তার প্রতিক্রিয়া অল্প কিছুক্ষণই অবশিষ্ট ছিল।[৩৩]

২৩

ঈদের নামায

মামুন একজন চালাক- চতুর, সচেতন ও পরিণামদর্শী আব্বাসীয় খলিফা। সে স্বীয় ভাই মুহাম্মদ আমীনকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে তাকে হত্যা করে। সময়কার বিস্তৃত সাম্রাজ্যের সমস্ত অঞ্চলই সে নিজের করতলগত করে। তার এ ব্যস্ততার সময় সে মারভ নামক স্থানে অবস্থান করছিল। মারভ খোরাসানের একটা এলাকা ছিল। মারভে থেকে মামুন একটি পত্র হযরত ইমাম রেজা (আঃ)- এর নামে মদীনায় পাঠায়। পত্রে সে ইমামকে মারভে আসার আমন্ত্রণ জানায় । জবাবে হযরত ইমাম রেজা (আঃ) বিভিন্ন কারণে অপারগতা প্রকাশ করে বলেন, এ মুহূর্তে মদীনা ত্যাগ করার মতো অবস্থা আমার নেই। মামুন তার ইচ্ছা থেকে নিবৃত্ত হলো না। তাই সে পরপর কয়েকটি চিঠি ইমামের খেদমতে পাঠালো। প্রতিটি চিঠিতেই ইমামকে মারভে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। এভাবে ইমাম বুঝতে পারলেন যে, খলিফা মামুন তার ইচ্ছা থেকে পিছু হটবার পাত্র নয়।

অবশেষে ইমাম রেজা (আঃ) মদীনা থেকে রওনা হলেন এবং মারভে এসে উপস্থিত হলেন। মামুন প্রস্তাব দিল, আসুন! খেলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করুন। ইমাম (আঃ) মামুনের মনের ভেদ সম্পর্কে অবগত ছিলেন। সুতরাং তাঁর বুঝতে দেরী হলো না যে, এ প্রস্তাবের একশ ভাগই রাজনৈতিক চালাকির অংশ বিশেষ। তাই তিনি খেলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণে অস্বীকার করলেন। প্রায় দুই মাস এভাবে অতিবাহিত হয়ে গেল। একপক্ষ থেকে প্রবল চাপ আর অপর পক্ষ গ্রহণ না করার সিদ্ধান্তে অটল।

অবশেষে যখন মামুন বুঝতে পারলো যে, ইমাম রেজা (আঃ) খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণে মোটেও রাজী নন, তখন সে তার পরবর্তী যুবরাজ পদে প্রস্তাব রাখলো। ইমাম এ প্রস্তাবটি এ শর্তসাপেক্ষে গ্রহণ করলেন যে, তার ওপর কোন দায়- দায়িত্ব অর্পণ করা যাবে না। রাষ্ট্রীয় কোন ব্যাপারে ইমাম কোন হস্তক্ষেপ করবেন না। মামুন ইমামের সমস্ত শর্ত মেনে নিল।

অতঃপর মামুন লোকদের কাছ থেকে ইমামের যুবরাজ পদে বাইয়াত (শপথ) আদায় করলো। রাজ্যব্যাপী ফরমানও জারি করে পাঠালো। মামুন আরো হুকুম জারি করলো যে, ইমাম রেজা (আঃ) এর নামে মুদ্রা চালু করা হবে এবং সারা দেশের সমস্ত মসজিদগুলোর মিম্বার থেকে ইমামের নামে খোৎবা পাঠ করা হবে। সুতরাং সমগ্র দেশ জুড়েই মামুনের নির্দেশ পালিত হলো।

কোরবানীর ঈদ এসেছে। মামুন এক ব্যক্তিকে ইমামের খেদমতে পাঠালো এবং নিবেদন করলো : এ বছর ঈদের নামায আপনি পড়াবেন যাতে করে লোকদের দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে যায় যে, পরবর্তীতে খেলাফতের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি আপনিই।

ইমাম (আঃ) বার্তা পাঠালেন, আমাদের মধ্যে এ অঙ্গীকার হয়েছিল যে, আমি সরকারী কোন কাজেই হস্তক্ষেপ করবো না। সুতরাং এ কাজটি আঞ্জাম দিতে আমি অপারগ।

মামুন উত্তর পাঠালো : সময়ের দাবি হচ্ছে আপনি লোকদের ঈদের নামায পড়াবার জন্য ঈদগাহে যাবেন। তাতে করে যুবরাজের বিষয়টি পুরোপুরি প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। মোদ্দাকথা মামুন এতো বেশী জিদ ধরলো যে, অবশেষে ইমাম (আঃ) জবাব দিলেন, যদি তুমি আমার অপারগতা মেনে নাও তাহলে সেটাই উত্তম। আর যদি ঈদের নামায পড়াবার জন্য আমাকে অবশ্যই যেতে হয় তাহলে আমি খোদার এ বিধানটিকে এমনভাবে পালন করবো, যে ভাবে মহানবী (সাঃ) ও হযরত আলী ইবনে আবী তালিব (আঃ) পালন করতেন।

মামুন বললো, আপনার পূর্ণ অধিকার ও স্বাধীনতা রয়েছে। যেভাবে চান সেভাবেই পড়াবেন। ঈদের দিন সকালে সেনাবাহিনীর বড় বড় কর্মকর্তা ও ঊর্ধ্বতন নেতাবর্গ, অভিজাত মহল ও সাধারণ লোকজন খলিফাদের সময়কার প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী মূল্যবান নতুন নতুন পোশাক পরিধান করে সুসজ্জিত ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে ঈদের নামাযে শরীক হবার জন্য ইমামের বাড়ির সামনে পৌঁছে গেল। অন্যান্য লোকজনও অলিতে- গলিতে দাঁড়িয়ে যুবরাজের রাজসিক আগমন প্রত্যক্ষ করার জন্য তার বাহনের অপেক্ষায় অপেক্ষা করতে থাকে। যাতে করে তারাও ঈদগাহ পর্যন্ত যুবরাজের বাহনের পেছনে পেছনে ঈদগাহে যেতে পারে। এমনকি অগণিত নারী- পুরুষ নিজেদের ঘর- বাড়ির ছাদের উপর দাঁড়িয়ে ইমামের শান- শওকত, পূর্ণ যাত্রার অপেক্ষায়

রইলো। সকলের দৃষ্টি ইমামের বাড়ির আঙ্গিনার দিকে নিবদ্ধ ছিল এবং অধীর আগ্রহে সকলেই ইমামের অপেক্ষা করছিল।

অপরদিকে হযরত ইমাম রেজা (আঃ) পূর্ব থেকেই খলিফা মামুনের কাছ থেকে এ অঙ্গীকার নিয়ে রেখেছিলেন এবং এ শর্তসাপেক্ষে তিনি ঈদের নামাযে অংশগ্রহণে রাজী হয়েছিলেন যে, খোদায়ী এ বিধান পালন করার ক্ষেত্রে খলিফাদের নয়, বরং মহানবী (সাঃ) ও হযরত আলী (আঃ)- এর নিয়ম অনুসরণ করবেন। সে মতে তিনি ঈদের দিন সকালে সর্বপ্রথম গোসল করলেন। মাথায় পরিধান করলেন সাদা পাগড়ি। পাগড়ির এক মাথা বুকের উপর ঝুলিয়ে দিলেন এবং অপর মাথাটি দুই কাঁধের মাঝামাঝি রেখে দিলেন। অতঃপর জামার আঁচলকে উপরে ওঠালেন ও খালি পা হয়ে গেলেন। তারপর তার সাথীগণকে বললেন, তোমরাও আমার মতো হয়ে যাও। এরপর তিনি লাঠিটি হাতে নিলেন যার অগ্রভাগ ছিল লোহার। এবার তিনি তাঁর সাথীদেরকে সাথে নিয়ে ঘর থেকে বাইরে আসলেন। ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সাথে সাথেই ইমাম (আঃ) এদিনে ইসলামী সুন্নত মাতাবেক তাকবীর ধ্বনি উচ্চরণ করলেন : (আলাহু আকবার, আল্লাহু আকবার)।

লোকেরা ইমামের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে উচ্চস্বরে তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করলো। এ সময় মনে হচ্ছিল যে, আসমান- যমীন ও প্রতিটি দেয়াল থেকে তাকবীর ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। ইমাম (আঃ) কিছুক্ষণ বাড়ির সম্মুখে দাঁড়ালেন এবং অতি উচ্চ স্বরে এ কথাগুলো বললেন : (আলাহু আকবার, আলাহু আকবার, আলাহু আকবার, আলা- মা- হাদানা, আল্লাহু আকবার আলা- রাজাকানা মিন বাহীমাতিল আনআমি, আল হামদুলিলাহি আলা- মা- আবালানা।

সমস্তলোকেরা উচ্চ স্বরে সম্মিলিতভাবেও পরস্পর সমস্বর এ বাক্যটি পুনরাবৃত্তি করলো।

অবস্থা তখন এমন ছিল যে, সকলে অঝোরে কাঁদছিল। লোকদের চোখ দিয়ে বেরিয়ে আসা অশ্রু‘‘এ কথারই সাক্ষ্য দিচ্ছিল যে, সমবেত প্রত্যেকটি লোকের মধ্যেই জোশানুভূতি জেগে উঠেছিল। সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা ও অন্যান্য প্রশাসনিক কর্মকর্তা, যারা মূল্যবান সরকারী পোশাক পরিধান করে উত্তম ঘোড়ায় আরোহণ করে এসেছিল, যারা নিজেদের মনে এ ধারণা

পোষণ করে রেখেছিল যে, খলিফার যুবরাজ অত্যন্তশান- শওকতপূর্ণ খুব দামী পোশাক পরিধান করে ঈদগাহে গমন করবেন। কিন্তু তারা যখন দেখতে পেলো যে, ইমাম (আঃ) একেবারে সাধারণ পোশাক পরে এবং খালি পদে ঘর থেকে বের হলেন আর পরিপূর্ণরূপে মহান আল্লাহর প্রতি অন্তর নিবদ্ধ আছেন, তখন তারা এমন আবেগময় হয়ে উঠলো যে, তাদের অজান্তেই চোখ দিয়ে অশ্রুপ্রবাহিত হতে লাগলো। তারাও সব জোরেশোরে তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করতে করতে নিজেদের বাহনের পিঠ থেকে নেমে পড়লো এবং নিজেদের জুতার ফিতা চাকু দিয়ে কেটে ফেললো। যাতে করে খালি পা হতে দেরী না হয়। প্রত্যেকের চেষ্টা ছিল যে, সে তার অপরাপর সাথীদের আগেই শূন্য পদ হবার সৌভাগ্যের অধিকারী হবে।

মারভ্ শহরের সর্বত্র আবেগ, উত্তেজনা আর কান্নার আওয়াজ ছড়িয়ে পড়েছিল। ইমাম (আঃ) প্রতি দশ কদমে একবার দাঁড়িয়ে যাচ্ছিলেন এবং উচ্চ ¯স্বরে চারবার তাকবীর বলছিলেন। বিরাট সংখ্যক একদল লোক অত্যন্ত জোশানুভূতির সাথে ইমামের সাথে সাথে এগিয়ে চলছিল। জনগণ যারা বস্তুগত ও জাগতিক জাকজমক প্রত্যক্ষ করার অপেক্ষায় ছিল, মুহূর্তেই যেন তাদের সে প্রত্যাশা উঠে গেল।

এ সংবাদ খলিফা মামুনের নিকট পৌঁছে গেল। মামুনের সাথী- বন্ধুরা তাকে পরামর্শ দিয়ে বললো যদি এ অবস্থা আরো কিছুক্ষণ স্থায়ী থাকে এবং ইমাম আলী ইবনে মূসা আর রেজা (আঃ) ঈদগাহে পৌঁছে যান তাহলে বিপ্লব ঘটে যাবার বিপদ রয়েছে। মুহূর্তেই মামুন কেঁপে উঠলো। তৎক্ষণাৎ সংবাদ পাঠালো : (হে ইমাম) আপনি ফিরে আসুন। তা না হলে আপনার সাথে কোন দুঃখজনক ঘটনার অবতারণা হয়ে যেতে পারে। ইমাম (আঃ) নিজের জুতা ও জামা কাপড় চেয়ে পাঠালেন এবং সেগুলো পরিধান করে বাড়ী ফিরে গেলেন। আর বললেন, আমি তো আগেই বলেছিলাম যে, এ কাজ করতে আমি অপারগ।[৩৪]

২৪

মায়ের দোয়া শ্রবণ

সে রাত্রে। মা ঘরের এককোণে কেবলার দিকে মুখ করে আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন ছিলেন। পাশে থেকেই সন্তান মায়ের মুখ থেকে নিঃসৃত প্রতিটি কথাই মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। মায়ের রুকু-সেজদা ও ওঠা- বসা অত্যন্ত গভীরভাবে লক্ষ্য করেছিল। যদিও শিশু ছিল কিন্তু শবে জুমআ'য় মাতা সমস্ত মুসলমান নরনারীর জন্য মঙ্গল কামনা করে দোয়ায় লিপ্ত আছেন, একজন একজন করে সকলের নাম নিচ্ছেন আর মহান আল্লাহর দরবারে তাদের কল্যাণ, উন্নতি ও মঙ্গল চেয়ে প্রার্থনা করছেন, দেখতে হবে তার নিজের জন্য কি প্রার্থনা করেন?

রাত কেটে গেল। তার মাতা সারা রাত অন্য মুসলমান নরনারীদের জন্য মঙ্গল কামনা করে দোয়া করতে থাকলেন। এভাবে ইবাদত- বন্দেগী ও দোয়ার মধ্যে দিয়ে সকাল হয়ে গেল। কিন্তু ইমাম হাসান (আঃ) তার মায়ের মুখে তার নিজের ব্যাপারে কোন দোয়া করতে শুনতে পেলেন না। তাই তিনি সকাল বেলা তার মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আম্মাজান! আমি সারা রাত জেগে জেগে আপনার দোয়া মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম। কিন্তু আপানি মহান খোদার দরবারে কেবল অন্য লোকদের জন্য দোয়া করতে থাকলেন। নিজের জন্য তো কোন দোয়া করলেন না?

মাতা হযরত ফাতিমা যাহরা (আঃ) স্নেহভরা কণ্ঠে বললেন, হে আমার প্রিয় সন্তান! প্রথমে পাড়া-প্রতিবেশীকে দেখতে হয়। তারপর নিজের ঘর।[৩৫]

২৫

বিচারকের দরবারে

একজন অভিযোগকারী তদানীন্তন প্রতাপশালী খলিফা ওমর ইবনে খাত্তাবের দরবারে তার অভিযোগ পেশ করলো। উভয় পক্ষকে বিচারালয়ে হাজির হতে হবে শুনানীর জন্য। যার বিরুদ্ধে অভিযোগটি দায়ের করা হয়েছিল তিনি ছিলেন আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী ইবনে আবী তালিব (আঃ)।

হযরত ওমর উভয় পক্ষকে তলব করলেন। ইসলামী বিধি- বিধান মোতাবেক উভয় পক্ষকেই পরস্পরের পাশাপাশি বসতে হবে যাতে আদালতের দৃষ্টিতে সকলের মর্যাদা সমান এটা বাস্তবায়ন হয়। খলিফা বাদীকে তার নাম ধরে ডাকলেন এবং নির্দেশ দিলেন যে, বিচারকের সামনে নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়াতে। অতঃপর খলিফা হযরত আলীর দিকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আবুল হাসান (হাসানের পিতা)! আপনিও বাদীর পাশে দাঁড়িয়ে যান। এ কথা শুনে হযরত আলী (আঃ)- এর চেহারায় অসন্তুষ্টি ও রাগের চিহ্ন দেখা গেল। খলিফা জিজ্ঞাসা করলেন, হে আলী! আপনি কি আপনার বাদীর পাশে দাঁড়াতে অপছন্দ করছেন?

জবাবে হযরত আলী (আঃ) বললেন, আমার অসন্তুষ্টি ও রাগের কারণ এটা ছিল না যে, আমি আমার বাদীর পাশে দাঁড়াতে নারাজ, বরং আমি অসুন্তষ্ট এ জন্য যে, আপনি ন্যায়পরায়ণতাকে পুরোপুরিভাবে অনুসরণ করেননি। কারণ আমাকে আমার কুনিয়ত (আবুল হাসান) বলে ডাকলেন। কিন্তু আমার প্রতিপক্ষ বাদীকে তার সাধারণ নাম ধরেই ডেকেছেন। প্রকৃতপক্ষে আমার রাগ ও অসন্তুষ্টির কারণ এটাই।[৩৬]

২৬

মিনার ময়দানে

হজ্বের উদ্দেশ্যে আগত লোকেরা মিনার ময়দানে সমবেত ছিল। ইমাম জাফর সাদিক (আঃ) একদল সাহাবীদেরকে নিয়ে ময়দানের এক কোণে বসে তাদের সামনে রাখা আঙ্গুর খাচ্ছিলেন। এমন সময় এক ভিক্ষুক এসে কিছু সাহায্য চাইল। ইমাম তাকে কিছু আঙ্গুর দিতে চাইলেন। ভিক্ষুক আঙ্গুর নিতে অস্বীকার করে বললো, আমাকে আঙ্গুর নয়, বরং কিছু টাকা পয়সা দিন। ইমাম বললেন, আমার কাছে তোমাকে দেবার মতো পয়সা নেই। নিরাশ হয়ে ভিক্ষুক চলে গেল।

কিছু দূর গিয়ে সে লজ্জিত হলো এবং ফিরে এসে ইমামকে বললো, সে আঙ্গুরই আমাকে দিন। ইমাম বললেন, না, সে আঙ্গরও এখন দেয়া যাবে না।

এর অল্প কিছুক্ষণ পর আরেকজন ভিক্ষুক এসে সাহায্য চাইলো। ইমাম তাকে একটি আঙ্গুরের ছড়া দিলেন। সে আঙ্গুর হাতে নিয়ে বললো, মহান আল্লাহর শুকুর যে, তিনি আমাকে রিযিক দান করলেন। ইমাম (আঃ) তার এ কথা শুনে তাকে দাঁড়াতে বললেন। তারপর ইমাম স্বীয় অঞ্জলি ভরে তাকে আরো আঙ্গুর দিলেন। এবারও আঙ্গুর হাতে নিয়ে সে আল্লাহর শুকুর আদায় করলো। আবারও ইমাম (আঃ) তাকে বললেন, থামো! যেয়ো না। তারপর ইমাম পাশেই দাঁড়ানো তাঁর এক সাথীকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কাছে কত টাকা আছে? সে তালাশ করে দেখলো, প্রায় বিশ দিরহাম আছে। ইমাম বললেন, সমস্ত টাকাটাই তাকে দিয়ে দাও। টাকা পেয়ে ভিক্ষুক তৃতীয়বারের মতো মহান আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বললো, হে আল্লাহ! সমস্তপ্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা তোমারই। হে খোদা! তুমিই সমস্ত নেয়ামতের দাতা। তোমার কোন অংশীদার নেই।

এ কথা শুনে ইমাম (আঃ) নিজের গায়ের জামা খুলে তাকে দিয়ে দিলেন। এখানে এসে ভিক্ষুক তার ভাষা বদল করে স্বয়ং ইমাম জাফর সাদিক (আঃ)- এর শানে কৃতজ্ঞতাসূচক কিছু কথা

বললো। তারপর ইমাম তাকে আর কিছুই দিলেন না। সে চলে গেলো। সেখানে উপস্থিত ইমামের সাহাবীরা বললেন, আমরা তো মনে করেছিলাম যে, এভাবে ভিক্ষুক যদি খোদার শুকুর আদায় করতে থাকতো, তাহলে ইমামও তার দান করেই যেতেন। কিন্তু যেহেতু ভিক্ষুকের ভাষা বদলে যায় এবং সে স্বয়ং ইমামের শুকরিয়া আদায় করে, সে কারণে ইমাম তাঁর দানের হাতকে থামিয়ে দিলেন।[৩৭]

২৭

ভার উত্তোলন প্রতিযোগিতা

একদল মুসলমান যুবক শক্তি পরীক্ষা ও ভার উত্তোলন প্রতিযোগিতায় লিপ্ত ছিল। সেখানে খুব ভারী একটা পাথর পড়ে ছিল। যুবক দল সে ভারী পাথরটি উত্তোলন করার ক্ষেত্রে নিজেদের শক্তি ও বাহাদুরী প্রদর্শন করছিল। প্রত্যেকেই নিজের শক্তি অনুযায়ী সে পাথরটি উত্তোলনের চেষ্টা করছিল। এমন সময় রাসূলে আকরাম (সাঃ) সেখানে পৌঁছলেন এবং যুবকদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি করছো?

যুবকরা বললো, আমরা শক্তি পরীক্ষা করছি। আমরা দেখতে চাই যে, আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী কে?

রাসূল (সাঃ) বললেন, তোমরা যদি বলো তাহলে আমি বলে দিতে পারি তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক শক্তিশালী কে? তারা বললো, জী হ্যাঁ! অবশ্যই! এর চেয়ে উত্তম আর কি হতে পারে যে, আপনার মতো ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি আমাদের প্রতিযোগিতার বিচারক হবেন?

সকলেই আগ্রহের সাথে অপেক্ষা করছিল যে, রাসূলে আকরাম (সাঃ) কাকে সব চাইতে শক্তিশালী বলে ঘোষণা করেন। কেউ কেউ ভাবছিল যে, এখনই রাসল (সাঃ) তার হাত ধরে সকলের সামনে ঘোষণা দেবেন যে, তোমাদের মধ্য থেকে এ ছেলেটি সবচেয়ে শক্তিশালী।

আল্লাহর নবী (সাঃ) বললেন, সবচাইতে শক্তিশালী সে ব্যক্তি, যার কোন জিনিস খুব পছন্দ হয় আর সে ঐ জিনিসের প্রতি আসক্তও হয়ে পড়ে। কিন্তু সে জিনিসের আসক্তি তাকে সত্য পথ ও মানবতা থেকে বিচ্যুত করতে পারে না। আর মন্দের দ্বারা কলুষিত করে না। আর যদি সে ব্যক্তি কোন বিষয়ে অসন্তুষ্ট হয় এবং রাগ ও ক্ষোভের কারণে অগ্নিশর্মা হয়ে যায় তাহলে সে অবস্থাতেও সে নিজেকে সংযত রাখে, সত্য ছাড়া মিথ্যা বলে না। সে যদি প্রতাপশালী হয় এবং বাধাসমূহ তার সামনে থেকে সরে যায় তাহলেও তার অধিকারের বাইরে সে হাত বাড়ায় না।[৩৮]

২৮

নওমুসলিম

দুই প্রতিবেশী! একজন মুসলমান ও অন্যজন খ্রিস্টান। তারা মাঝে মাঝে ইসলাম ধর্ম নিয়ে পরস্পরে আলাপ- আলোচনা করতো। মুসলমান লোকটি ছিল খুবই দ্বীনদার- ইবাদতকারী। আলাপ- আলোচনার সময় সে ইসলাম ধর্মের এতো প্রশংসা ও শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরতো যে, তার খ্রিস্টান বন্ধুটি ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গেলো। অবশেষে কিছুদিন পর সে খ্রিস্টান লোকটি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নিলো।

রাতের বেশীর ভাগ সময় পার হয়ে সেহরীর সময় হয়েছিল। নও মুসলিম সে খ্রিস্টান লোকটি বুঝতে পারলো যে, কেউ তার ঘরের দরজায় টোকা দিচ্ছে। সে ত্রস্ত- ব্যস্তহয়ে দরজার নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলো, কে?

দরজার বাহির থেকে জবাব এলো, আমি অমুক অর্থাৎ দরজায় আওয়াজ দেয়া লোকটি নিজের পরিচয় দিল। এ সেই মুসলমান প্রতিবেশী লোকটি যার হাতে খ্রিস্টান লোকটি কয়েকদিন পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিল। সে নও মুসলিম খ্রিস্টান লোকটি প্রতিবেশী বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলো, এতো রাতে কি দরকারে এসেছো?

মুসলমান বন্ধুটি বললো, তাড়াতাড়ি অযু করে নাও। তারপর কাপড়- চোপড় পরে বেরিয়ে এসো। ফজরের নামায পড়ার জন্য মসজিদে যেতে হবে। সে নতুন মুসলমানটি জীবনে প্রথমবারের মতো অযু করলো। তারপর মুসলমান বন্ধুটির সাথে মসজিদে চলে গেল। এখনও সকাল হতে অনেক দেরী। রাতের নফল নামাযের সময় আছে। দই্ বন্ধু বেশ কিছুক্ষণ ধরে নফল নামায আদায় করলো। এমন সময় সেহরীর সময় পার হয়ে সাদা আভা দেখা দিল অর্থাৎ ফজরের নামাযের সময় হলো। তারা ফজরের নামায আদায় করলো। এরপর দোয়া- দরুদ ইত্যাদিতে লিপ্ত হলো। এভাবে পূর্ণ সকাল হয়ে গেল। তাই নও মুসলমানটি মসজিদ থেকে বাড়ি যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালো। তার মুসলমান বন্ধুটি জিজ্ঞাসা করলো, কোথায় যাচ্ছো?

জবাবে নও মুসলিমটি বললো, বাড়ি যাচ্ছি। সকালের নামায তো পড়ে নিলাম। এখন আর এখানে কি কাজ?

মুসলমান বন্ধুটি বললো, আর একটু দেরী করো। নামাযের পরের দোয়া- দরুদ ইত্যাদিও পড়ে নাও। এরই মধ্যে সূর্যও উদয় হয়ে যাবে।

নও মুসলিম বন্ধুটি বললো, বেশ ভালো।

এ কথা বলে সে মসজিদে বসে গেল এবং খোদার যিকির- আযকারে লিপ্ত হলো। সূর্য উঠে গেল। সে আবার বাড়ি যাবার জন্য উঠছিল। এমন সময় তার মুসলমান বন্ধুটি কোরআন মজীদ তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, আপাতত কিছুক্ষণ কোরআন তিলাওয়াত করো। এতে করে সূর্যটা ও ভালোভাবে উঠে যাবে। আর আমি তোমাকে উপদেশ দেবো যে, আজ তুমি রোযার নিয়ত করে নাও। তুমি কি জানো না রোযা কত সওয়াব ও ফজিলতের কাজ?

এভাবে ধীরে ধীরে যোহরের নামাযের সময় হয়ে এসেছে। সে মুসলমান বন্ধুটি বললো, আর একটু দেরী করো। যোহরের নামাযের সময় প্রায় হয়ে গেছে। যোহরের নামাযও মসজিদে পড়ে নাও। যোহরের নামাযও পড়া হলো। তারপর মুসলমান বন্ধুটি বললো, আর অল্প কিছুক্ষণ দেরী করো। আসরের নামাযের ফজিলতের সময় খুবই নিকটবর্তী। এ নামাযটাও ফজিলতের সময়ে আদায় করে নেয়া যাক। আসরের নামায শেষ হবার পর তার নও মুসলিম বন্ধুটিকে বললো, সূর্যাস্ত খুব নিকটে। আর অল্প পরেই মাগরিব নামাযের সময় হয়ে যাবে। নও মুসলিম লোকটি মাগরিব নামাযের পর বাড়ি যাবার ইচ্ছা করলো। সারা দিন রোযা রাখার পর এখন ইফতার করবে। তার মুসলমান বন্ধুটি বললো, এখন একমাত্র এশার নামাযই বাকি আছে। আর খানিক সময় অপেক্ষা করো। ঘণ্টা খানিকের মধ্যে এশার নামাযের ফজিলতের সময়। এভাবে এশার নামাযও সে নওমুসলিম লোকটি মসজিদে আদায় করলো। এরপর বাড়ি ফিরে গেলো।

দ্বিতীয় রাতে সেহরীর সময় সে নও মুসলিমের কানে দরজা টোকানোর শব্দ এলো। সে জিজ্ঞাসা করলো, কে?

জবাব এলো, আমি তোমার প্রতিবেশী অমুক। অযু করে কাপড়- চোপড় পরে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসো। এক সাথে মসজিদে গিয়ে ফজরের নামায আদায় করবো।

নওমুসলিম বললো, আমি গতকাল মসজিদ থেকে ফিরে এসে তখনই ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করেছি। তুমি চলে যাও। আমার থেকে বেকার কোন লোক খুঁজে নাও যার কাছে নামায, রোযা ও আল্লাহর ইবাদত ব্যতীত দুনিয়ার আর কোন কাজ নেই। সে তার সমস্ত সময় মসজিদে কাটিয়ে দেবে। আমি দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তলোক। তা ছাড়া আমার উপর আমার পরিবার- পরিজনের ভরণ- পোষণের দায়িত্ব রয়েছে। সুতরাং আমার নামায- রোযা ও খোদার ইবাদত ছাড়া আরো কাজ- কর্ম রয়েছে। আমাকে আমার পরিবারের লোকদের জন্য খাওয়া পরার ব্যবস্থাও করতে হবে।

হযরত ইমাম জাফর সাদিক (আঃ) তাঁর সাহাবীদের নিকট এ ঘটনাটি বর্ণনা করার পর বলেন, এভাবে এ কঠোর ও চরম ইবাদতকারী পরহযেগার লোকটি একজন অমুসলিমকে মুসলমান তো বানালো, কিন্তু নিজের কট্টর মনোভাব অবলম্বনের কারণে সে তার নিজেরই হাতে করা নওমুসলিম বন্ধুটিকে ইসলামের গন্ডী থেকে বেরিয়ে যেতে বাধ্য করেছে। অতএব তোমাদেরকে সর্বদা এ সত্যটি সামনে রাখতে হবে যে, লোকেরা তোমাদের কঠোর মনোভাব ও চরম পন্থা অবলম্বনের কারণে যেনো বিরক্ত না হয়ে যায়। তাদের সামর্থ্য ও সক্ষমতার প্রতি দৃষ্টি রেখে কাজ হবে যাতে করে তারা দ্বীন ইসলাম ও এর সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নিজে নিজেই ইসলামের প্রতি অনুপ্রাণিত হয়। ইসলাম থেকে যেন সরে না পড়বে। তোমাদের কি এ কথা জানা নেই যে, কঠোরতা ও বলপ্রয়োগ উমাইয়া শাসকদের নীতি ছিল? কিন্তু আমাদের নীতি হচ্ছে। মধুর চরিত্র, নম্র আচরণ, ভালোবাসা ও পরস্পর আন্তরিকতা ভিত্তিক। নির্ভেজাল ইসলামী চরিত্র ও উত্তম আচরণের দ্বারা লোকদের অন্তর জয় করে নেয়াই আমাদের পন্থা।[৩৯] .

২৯

খলিফার দস্তরখান

শারীক ইবনে আব্দুল্লাহ নাখায়ী দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীর খ্যাতনামা ফকীহদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তাকওয়া-পরহেযগারীর জগতে এক উলেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। আব্বাসীয় খলিফা মাহদী ইবনে মানসুরের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যে, তাকে প্রধান বিচারপতির পদটি দেয়া হবে। কিন্তু শারীক ইবনে আবদুল্লাহ জুলুম-অত্যাচার ও বেইনসাফীর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত শাসন ব্যবস্থা থেকে নিজেকে দূরে রাখার জন্য সে পদটি গ্রহণ করতে রাজী ছিলেন না। খলিফার আরো একটি ইচ্ছা ছিল যে, শারীক ইবনে আবদুল্লাহ কে তার সন্তানদের বিশেষ শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করবে যাতে করে তার সন্তানরা শারীকের মতো যোগ্য ওস্তাদের কাছ থেকে হাদীসশাস্ত্রে পান্ডিত্য অর্জন করতে পারে। কিন্তু তিনি সে প্দটাও গ্রহণ করতে রাজী ছিলেন না। বস্তুত তিনি দারিদ্র্য ও স্বাধীন জীবন যাপনেই পরিতৃপ্ত ছিলেন।

একদিন খলিফা তাকে দরবারে ডেকে পাঠালো এবং বললো, আমি আপনার সামনে আজ গুরুত্বপূর্ণ তিনটি প্রস্তাব রাখছি। আপনি এ তিনটির যে কোন একটি বেছে নিতে পারেন। হয় বিচারপতির পদটি গ্রহণ করবেন অথবা আমার ছেলে-সন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষা দানের দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন কিংবা আজ দুপুরে আমার সাথে একই দস্তরখানে বসে খাবার খাবেন।

জনাব শারীক কিছুক্ষণ চিন্তা-ভাবনা করে বললেন এ ভাবে জোর যবরদস্তী ও বাড়াবাড়ির পরিস্থিতিতে এ তিনটি প্রস্তাবের মধ্যে তৃতীয় প্রস্তাবটি আমার জন্য সহজতর। খলিফা তার বিশেষ বাবুর্চিকে ডেকে হুকুম দিল যে, আজ জনাব শারীক ইবনে আব্দুল্লাহর মতো বিজ্ঞ ব্যক্তির জন্য অতি উত্তম ও রুচিসম্মত খাদ্য-খাবার প্রস্তুত করো। খলিফার নির্দেশ পেয়ে শাহী খেদমতগাররা রকমারী খাদ্য খাবার দিয়ে দস্তরখানা সাজিয়েছিল।

শারীক এর পূর্বে এমন সব খাদ্য-খাবার কখনও দেখেননি। সুতরাং রং-বেরংয়ের খাদ্যসামগ্রী দেখে তার ক্ষুধা বেড়ে গেল। তিনি খুব পরিতৃপ্ত হয়ে খাওয়া খেলেন। তার খাওয়ার ধরন দেখে

খানসামা খলিফার কানে আস্তেকরে বললো, খোদার কসম! এখন আর এ ব্যক্তি আমাদের থাবা থেকে ছাড়া পাবে না।

এরপর খুব বেশী দিন দেরী হলো না শারীক খলিফার সন্তানদের শিক্ষা দেয়ার দায়িত্বভারটি গ্রহণ করে নিলেন। এরপর বিচারপতির পদটিও গ্রহণ করলেন। বাইত মাল থেকে তার মাসিক ভাতাও নির্ধারিত হলো।

একদিন ভাতা গ্রহণের সময় লেনদেনের ব্যাপারে কোষাধ্যক্ষের সাথে শারীকের ঝগড়া হয়ে গেলো। খাজাঞ্চী তাকে বললো, আপনি তো আমার কাছে গম বিক্রি করেননি যে, হিসাব কিতাবে এ রকম পাই পাই হিসাব করবেন।

শারীক বললো, তুমি হয়তো জানো না যে, আমি গম থেকে আরো অনেক মূল্যবান ও উত্তম জিনিস বিক্রি করে দিয়েছি।আমি তো আমার দ্বীন- ধর্ম বিক্রি করে দিয়েছি।[৪০]

৩০

প্রতিবেশীর অভিযোগ

এক ব্যক্তি রাসূলে খোদা (সাঃ)- এর খেদমতে এসে তার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করলো। সে বললো, আমার প্রতিবেশী আমাকে এমন বিরক্ত করে যে, আমার বেঁচে থাকা দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রাসূলে আকরাম (সাঃ) বললেন, ধৈর্য ধারণ করো, প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে শোরগোল করো না, বরং নিজের চাল- চলনে কিছুটা পরিবর্তন আনয়ন করো। কিছু দিন পর সে লোকটি আবার রাসূলের খেদমতে এসে প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলো। এবারও রাসল (সাঃ) বললেন, ধৈর্য ধারণ করো। এরপর আরো কিছুদিন পর সে তৃতীয়বার অভিযোগ নিয়ে আল্লাহর নবীর খেদমতে হাজির হলো। সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমার এ প্রতিবেশী তার মন্দ কাজ থেকে বিরত হচ্ছে না। আগের মতোই সে আমাকে ও আমার পরিবারবর্গকে বিরক্ত করেই চলেছে।

এবার মহানবী (সাঃ) তাকে বললেন, শুক্রবার দিন আসলে তোমার ঘরের সমস্ত মালামাল বের করে রাস্তার মাথায় এমন এক স্থানে রেখে দেবে, যেখান দিয়ে লোকেরা যাতায়াত করার সময় তা দেখতে পায়। তোমার মালপত্র রাস্তার উপর পড়ে থাকতে দেখে লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞাসা করবে যে, তোমার সমস্ত মালামাল এভাবে রাস্তার উপর রেখে দেয়ার কারণ কি? তুমি লোকদেরকে বলবে, আমি আমার প্রতিবেশীর দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে খুবই বিপদগ্রস্থ এভাবে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরো।

অভিযোগকারী মহানবী (সাঃ)- এর কথা মতো ঠিক তাই করলো। কষ্টদানকারী প্রতিবেশী ভেবেছিল যে, আল্লাহর নবী সর্বদা ধৈর্য্য ধারণ করার উপদেশই দিয়ে যাবেন। তার এ কথা জানা ছিল না যে, যখন জুলুম- অত্যাচার ঠেকাবার ও অধিকার বাঁচাবার প্রশ্ন দেখা দেয় তখন সীমা লংঘনকারীর কোন মর্যাদা ইসলামের দৃষ্টিতে অবশিষ্ট থাকে না। যখনই সে এ বিষয়ে খবর

পেল তখন সে খুব ভয় পেয়ে গেল এবং সে লোকটির কাছে গিয়ে অনুনয়- বিনয় করতে লাগলো, ভাই, তোমার মালামাল নিয়ে ঘরে চলো। শুধু তাই নয়, বরং সে তার সাথে অঙ্গীকার করলো যে, আগামীতে সে আর কখনও কষ্ট দেবে না এবং বিরক্ত করবে না।[৪১]

৩১

খুরমা গাছ

এক আনসারীর বাগানে সামারাতা বিন জুনদার নামের এক ব্যক্তি একটি খুরমা গাছ লাগিয়েছিল। সে আনসারীর বসতবাড়িও এ বাগানের মধ্যেই ছিল যেখানে তার পরিবার- পরিজনও বসবাস করতো। সামারাহ মাঝে মাঝে তার গাছটি দেখাশোনা করার জন্য অথবা খুরমা তোলার জন্য সে আনসারীর বাগানে যাতায়াত করতো। ইসলামী বিধান মতে সে আনসারীর ঘরে আসা- যাওয়া করার অধিকার সামারার ছিল, গাছের পরিচর্যা উপলক্ষে বাগানে আসা- যাওয়ার সুবাদে।

সামারাহ তার গাছের পরিচর্যাকল্পে বাগানে গেলে সে আনসারীর বাড়িতে আকস্মিকভাবে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করতো। ঘরে প্রবেশ করার সময় তার দৃষ্টি ঘরের অন্য লোকদের উপরও পড়তো।

একবার ঘরের মালিক সামারাকে বললো, ঘরে প্রবেশ করার সময় আকস্মিকভাবে প্রবেশ করা উচিত নয়। সঙ্গত কাজ হচ্ছে ঘরে প্রবেশ করার আগে শব্দ ইত্যাদি করা। সামারাহ এ কথা মেনে নিতে অস্বীকার করলো। ঘরের মালিক বাধ্য হয়ে মহানবী (সাঃ)- এর খেদমতে এসে অভিযোগ করে বললো, এ লোকটি আকস্মিকভাবে অনুমতি ছাড়াই আমার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে। আপনি তাকে একটু বলে দিন যেনো সে ঘরে প্রবেশ করার পূর্বে তার আগমন সংবাদ দিয়ে দেয় যাতে করে আমার পরিবারের লোকেরা তার দৃষ্টি থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারে।

হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) সামারাকে ডেকে বললেন, অমুক ব্যক্তি তোমার বিরুদ্ধে এ অভিযোগ করেছে যে, তুমি সংবাদাদি না দিয়েই ঘরে ঢুকে পড়ো। আর তুমি তার পরিবারের লোকদেরকে এমন অবস্থায় দেখে নাও যা তাদের নিকট অপছন্দনীয়। কাজেই আগামীতে সে ব্যক্তির ঘরে প্রবেশ করার আগে আওয়াজ দিয়ে তাদেরকে তোমার অগমন সম্পর্কে সতর্ক করে দেবে। কারো ঘরে তার অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করা উচিত নয়। সামারাহ রাসূল (সাঃ)- এর এ কথায় সম্মত হলো না।

রাসূল (সাঃ) তাকে বললেন, আমার এ কথা যদি তোমার নিকট গ্রহণযোগ্য না হয় তাহলে তুমি তোমার গাছটি বিক্রি করে দাও। সে এ কথাতেও রাজী হলো না। রাসূল (সাঃ) গাছের মূল্য আরো কিছু বাড়িয়ে দিলেন। তাতেও সে নিজের জিদে অটল থাকলো। কোন মূল্যেই সে গাছটি বিক্রি করতে প্রস্তুত হলো না। রাসূলে অকরাম (সাঃ) বললেন, যদি তুমি এ কাজ করো তাহলে বেহেশতেও তোমাকে একটি ফলের গাছ দেয়া হবে। এতসব কথা শোনার পরও সে গাছটি বিক্রি করতে প্রস্তুত হলো না। সে তার গোঁয়ার্তুমীতে অনড় থাকলো। সে বললো, আমি এ গাছটি বিক্রি করবো না আর এ বাগানে প্রবেশ করার সময় বাগানের মালিকের কাছ থেকে অনুমতিও নেবো না।

সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে আল্লাহর নবী (সাঃ) বললেন, তুমি একজন অনিষ্টপ্রিয় ও পাষাণ হৃদয়ের লোক। ইসলামে কাউকে কষ্ট দেয়া বা কারো ক্ষতি করার কোনই অধিকার দেয়া হয়নি। অতঃপর রাসলে আকরাম (সাঃ) সে বাগানের মালিক আনসারীর প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, যাও বাগান থেকে খুরমার গাছটি উপড়ে ফেলো এবং সামারার সামনে ফেলে দাও।

রাসূলের কথা মতো তারা বাগানে গেল এবং সমস্তকাজ সম্পাদন করলো। রাসূলে খোদা (সাঃ) সামারাকে বললেন, যাও আল্লাহর যমীন খোলা আছে। যেখানে তোমার মন চায় সেখানে গিয়ে তোমার গাছ লাগাও।[৪২]

৩২

উম্মে সালমার ঘরে

সে রাতে রাসূলে আকরাম (সাঃ) উম্মে সালমার ঘরে রাত যাপন করছিলেন। মধ্য রাতে উম্মে সালমা ঘুম থেকে জেগে গেলেন। দেখতে পেলেন আল্লাহর নবী (সাঃ) তার বিছানায় নেই। তিনি চিন্তায় পড়ে গেলেন যে, ঘটনা কি? নারীসুলভ ঈর্ষার কারণে তিনি খুঁজতে লাগলেন রাসূলে আকরাম (সাঃ) কোথায় গেলেন? তিনি দেখলেন যে, আল্লাহর নবী (সাঃ) ঘরের এক অন্ধকার কোণে দাঁড়িয়ে আসমানের দিকে হাত তুলে কেঁদে কেঁদে মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করে বলছেন :

হে পরোয়ারদিগার! যে সমস্ত নেয়ামত তুমি আমাকে দান করেছো তা আমার থেকে ফেরত নিও না। হে আমার প্রভু! আমার দুশমন ও বিদ্বেষীদের দুঃখ- কষ্টে আনন্দিত হওয়া থেকে আমাকে রক্ষা করো। হে বিশ্ব জাহানের মালিক! যে সমস্ত মন্দ ও গর্হিত কাজ থেকে আমাকে দূরে রেখেছো সে গুলোর দিকে আমাকে কখনও নিয়ে যেয়ো না। হে খোদা! এক মুহূর্তের জন্যও আমাকে তুমি আমার নিজের ওপর ছেড়ে দিও না।

হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)- এর মুখে এ কথাগুলো শুনে উম্মে সালমা কেঁপে উঠলেন। তিনি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না। ঘরের এক কোণে গিয়ে বসে কাঁদতে লাগলেন। হযরত উম্মে সালমার কান্না এমন আকার ধারণ করলো যে, অবশেষে নবী (সাঃ) স্বয়ং তার কাছে আসলেন এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলেন :

হে উম্মে সালমা! তুমি এভাবে কাঁদছো কেন?

উম্মে সালমা বললেন, আমি কেন কাঁদবো না? মহান আল্লাহর দরবারে আপনার বিরাট মর্যাদা ও সম্মান রয়েছে। আপনি তার নিকটতম বান্দা। তারপরও আপনি খোদার ফরিয়াদ করছেন এক মুহূর্তের জন্যও যেন নিজের ওপর ছেড়ে না দেন।

মহানবী (সাঃ) বললেন,   হে উম্মে সালমা! আমি কেমন করে অস্থির না হয়ে থাকতে পারি? আর কি করেই বা নিশ্চিত থাকতে পারি? যেখানে ইউনুস (আঃ)- কে। এক মুহূর্তের জন্য আল্লাহ তাকে তার নিজের হালে ছেড়ে দিয়েছিলেন। এতেই তার মাথার উপর যে বিপদ আসার ছিল তাই এলো।[৪৩]

৩৩

কালোবাজার

পরিবারে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে হযরত ইমাম জাফর সাদিক (আঃ)- এর খরচাদি অনেক বেড়ে গেলো। তাই তিনি সাংসারিক খরচাদি মেটাবার জন্য ব্যবসা- বাণিজ্য বা অন্য কোন উপায়ে আয়ের উৎস বাড়ানোর চিন্তা- ভাবনা করতে লাগলেন। একবার তিনি এক হাজার দিনার যোগাড় করে তার গোলাম মুসাদিফকে দিয়ে বললেন, এ এক হাজার দিনার নিয়ে মিসরে গিয়ে ব্যবসা করার প্রস্তুতি গ্রহণ করো।

মুসাদিফ সে দিনার দিয়ে এমন সব মালামাল খরিদ করলো সাধারণত মিসরের বাজারে যেগুলো চাহিদা বেশী। এরপর মিসরগামী একটা ব্যবসায়ী কাফেলার সাথে শামিল হয়ে মিসরের দিকে চললো।

মিসরের নিকট পৌঁছলে মিসর থেকে প্রত্যাগত অপর একটি ব্যবসায়ী কাফেলার সাথে তাদের সাক্ষাৎ হলো। উভয় কাফেলার লোকেরা পরস্পরের হাল অবস্থা জিজ্ঞাসা করলো। আলাপ- আলোচনা ও কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে তারা জানতে পারলো যে, মুসাদিফ ও তার সফর- সাথীদের সাথে যে মালামাল রয়েছে, মিসরের বাজারে তার খুব চাহিদা আছে। চাহিদা সম্পন্ন মালামালের অধিকারীরা খুশিতে আত্মহারা। ঘটনাক্রমে তাদের কাছে যে মালামাল ছিলো তা সাধারণ মানষদের অতি প্রয়োজনীয়। যে কোন মূল্যে মানুষ এসব মালামাল খরিদ করতে বাধ্য। ব্যবসায়ীরা এ খুশির সংবাদ পেয়ে সকলে মিলে এ সিদ্ধান্তনিলো যে, আমরা আমাদের মালামাল শতকরা এক শত ভাগ লাভ না করে বিক্রি করবো না।

মিসরে পৌঁছেই তারা বুঝতে পারলো যে, রাস্তায় প্রাপ্ত খবর সম্পূর্ণ সত্য। তাদের মধ্যে কৃত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তারা প্রথমে কালোবাজারির পরিবেশ সৃষ্টি করলো। কেউ তাদের মাল দ্বিগুণ দামের কমে বিক্রি করলো না। যেহেতু বাজারে সে সব মালের সরবরাহ কম ছিলো এবং চাহিদা ছিল বেশী। তাই অল্প দিনের মধ্যেই তাদের সমস্তমালামাল দ্বিগুণ দামে বিক্রি হয়ে গেলো।

অন্যান্য ব্যবসায়ীর ন্যায় মুসাদিফও এক হাজার দিনার মুনাফা নিয়ে মদীনায় ফিরে আসলো। সে খুব আনন্দিত মনে ইমাম সাদিক (আঃ)- এর খেদমতে উপস্থিত হলো। এক হাজার দিনার করে দুটি থলি ইমামের সামনে রেখে দিলো। ইমাম জিজ্ঞাসা করলেন, এগুলো কি? জবাবে মুসাদিফ বললো, এর মধ্যে একটি থলিতে সে টাকা যা আপনি আমাকে পুজিঁ হিসেবে দিয়েছিলেন। আর দ্বিতীয় থলিতে ব্যবসায়ের মুনাফার টাকা যা পুঁজির সমান।

ইমাম (আঃ) বললেন, মসাদিফ! অনেক বেশী মুনাফা দেখা যাচ্ছে। বলো তো, কিভাবে তোমরা এতো বেশী লাভবান হয়েছো?

মুসাদিফ বললো, ঘটনাটি ছিলো এই যে, আমরা যখন মিসরের কাছাকাছি পৌঁছলাম তখন সংবাদ পেলাম যে, আমরা যে সব মালামাল নিয়ে যাচ্ছিলাম সেগুলোর মিশরে খুবই চাহিদা। তারপর আমরা ব্যবসায়ীরা সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্তনিলাম যে, শতকরা এক শ ভাগ মনাফা না করে আমরা কেউ মাল বিক্রি করবো না। এ সিদ্ধান্তঅনুযায়ী আমরা কাজ করলাম।

ইমাম (আঃ) বললেন, সুবহানাল্লাহ! তোমরা এমন একটি কাজ করেছো! তোমরা আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছো যে, মুসলমানদের মধ্যে কালোবাজারির পরিবেশ সৃষ্টি করবে। তোমরা কসম করেছো যে, পুঁজির সমান মুনাফা না করে মাল কেউ বিক্রি করবে না। আমি এ ধরনের ব্যবসা ও লাভ কোনদিন কখনও পছন্দ করি না।

অতঃপর হযরত ইমাম জাফর সাদিক (আঃ) একটি থলি তুলে নিলেন এবং বললেন, এটা আমার পুঁজি। দ্বিতীয় থলিটি সেখানে পড়ে থাকলো। ইমাম বললেন, ও টাকার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

এরপর ইমাম (আঃ) বললেন, হে মুসাদিফ। হালাল রুজির মোকাবিলায় তলোয়ার চালনা সহজতর।[৪৪]

৩৪

কাফেলা থেকে বিচ্ছিন্ন

রাতের অন্ধকারে এক যুবকের করুণ আহ্বান দূর থেকে শোনা যাচ্ছিল। সে অত্যন্তকরুণ কণ্ঠে সাহায্যের আবেদন করছিলো এবং সে আম্মাজান, আম্মাজান করে ডাকছিল। আসলে তার দুর্বল রোগা উটটি কাফেলা থেকে পিছিয়ে পড়েছিল। শেষ পর্যন্ত উটটি ক্লান্তহয়ে যমীনে শুয়ে পড়েছিল। সব রকমের চেষ্টা করেও সে উটটিকে ওঠাতে সক্ষম হলো না। কোন উপায়ান্তর না দেখে সে উটটির মাথার কাছে দাঁড়িয়ে ক্রন্দন করতে লাগলো। এমন সময় মহানবী (সাঃ), যিনি সর্বদা কাফেলার সকলে পিছে চলে থাকেন, যাতে করে কোন দুর্বল ও বৃদ্ধ লোক কাফেলা থেকে পিছে পড়ে গেলে একা অসহায় না হয়ে পড়ে, তিনি দূর থেকে সে যুবকের ফরিয়াদ শুনতে পেলেন। তিনি যখন যুবকটির কাছে পৌঁছলেন তখন জিজ্ঞাসা করলেন, কে তুমি?

যুবকটি বললো, আমি জাবের। রাসূল (সাঃ) বললেন, তুমি এতো অস্থির ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত কেন?

যুবক বললো, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমার উটটি দুর্বল ও ক্লান্তির কারণে কাফেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এখন সে বসে পড়েছে আর উঠতেই চায় না। ওদিকে কাফেলা এগিয়েই চলেছে।

রাসূল (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কাছে কোন লাঠি আছে কি?

সে বললো, জী হ্যাঁ। রাসূল (সাঃ) বললেন, দাও। আমাকে দাও। এরপর মহানবী (সাঃ) লাঠির সাহায্যে উটটিকে ধাক্কা দিলেন। উটটি উঠে দাঁড়ালো। তিনি আবার সেটিকে বসিয়ে দিলেন। তারপর তিনি স্বীয় হাতকে পাদানী বানিয়ে ধরলেন এবং জাবেরকে বললেন, আরোহণ করো।

জাবের উটের পিঠে চড়ে রাসূলে আকরাম (সাঃ)- এর সাথে সাথে চললেন। এবার জাবেরের উটটি আগের চেয়ে আরো দ্রুত চলতে লাগলো। পথে আল্লাহর নবী (সাঃ) জাবেরের প্রতি সর্বদা দয়া প্রদর্শন করছিলেন। জাবের গণনা করে দেখলেন যে, রাসূল (সাঃ) পথ চলতে চলতে প্রায় পঁচিশবার তার জন্যে মহান আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন।

পথে রাসূল (সাঃ) জাবের ইবনে আবদুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার পিতা থেকে তোমরা কতো ভাইবোন আছো?

জাবের বললেন, ইয়া রাসূলুলাহ! আমার সাতটি বোন আছে। আর আমিই একমাত্র ভাই।

রাসূল (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি তোমার পিতার সমস্তঋণ পরিশোধ করে দিয়েছো? নাকি এখনো কিছু বাকী আছে?

জাবের বললেন, না! এখনো কিছু লোকের ঋণ বাকি আছে।

রাসূল (সাঃ) বললেন, মদীনায় পৌঁছে তুমি পাওনাদারদের সাথে ঋণ পরিশোধের বিষয়ে কথাবার্তা বলে নিও। আর যখন খুরমা তোলার সময় আসবে তখন আমাকে খবর দিও।

: আচ্ছা! ঠিক আছে।

: তুমি কি বিয়ে শাদী করেছো?

: জ্বী হ্যাঁ।

: কাকে বিয়ে করেছো?

: আমি অমুকের মেয়ে অমুককে বিয়ে করেছি। সে মদীনার একজন বিধবা রমণী।

: তুমি একটি কুমারী মেয়েকে কেন বিয়ে করলে না? তোমার মতো একজন যুবকের জন্য তো কুমারী মেয়েই সঙ্গত ছিলো।

: হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমার কয়েকটি অনভিজ্ঞ যুবতী বোন আছে। এ জন্য অনভিজ্ঞা যুবতী মেয়েকে বিয়ে করতে চাইনি। বরং কল্যাণকর মনে করলাম যে, একজন বুদ্ধিমতী অভিজ্ঞা বিধবা নারীকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করি।

: এটা তুমি একটা উত্তম কাজ করেছো। এ উটটি তুমি কতো টাকা দিয়ে কিনেছো? দুইশত দিরহাম ।

: এই টাকা মূল্যেই উটটি আমাকে দাও। মদীনায় এসে তুমি আমার কাছ থেকে তা নিয়ে নিও। এভাবে কয়েকদিন সফর করে কাফেলা মদীনায় এসে পৌঁছলো। জাবের তার উটটি নিয়ে রাসূলে খোদার খেদমতে হাজির হলেন উটটি হস্তান্তর করবেন বলে। রাসূল (সাঃ) জাবেরকে দেখেই

বিলালকে ডেকে বললেন,   জাবেরকে দুইশত দিরহাম দিয়ে দাও। এটা তার উটের মূল্য। তাকে আরো একশ বিশ দিরহাম দিয়ে দাও যাতে তার বাবার ঋণ পরিশোধ করতে পারে। তার সাথে এ উটটিও তাকে ফেরত দিও। এটা তারই থাকবে।

এরপর রাসূল (সাঃ) জাবেরকে জিজ্ঞাসা করলেন,   পাওনাদারদের সাথে কি তোমার কোন কথাবার্তা হয়েছে?

জাবের বললেন,   না! হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)!

রাসূল (সাঃ) আরো জিজ্ঞাসা করলেন,   তোমার পিতা যে সম্পদ রেখে গেছেন তা দিয়ে কি তোমার বাবার ঋণ পরিশোধ করা যথেষ্ট হবে?

জাবের বললেন,   না। হে আল্লাহর নবী (সাঃ)! তা যথেষ্ট নয়।

রাসূল (সাঃ) বললেন,   তাহলে খুরমা তোলার সময় হলে আমাকে খবর দিও।

এর কিছুদিন পরেই খুরমা তোলার মওসম এসে পৌঁছল ।জাবের রাসূল (সাঃ)- কে খবর দিলেন। মহানবী (সাঃ) নিজে গিয়ে সমস্তঋণ পরিশোধ করে দিলেন। আর জাবেরের পরিবার- পরিজনের ভরণ- পোষণের জন্য যথেষ্ট টাকা অবশিষ্ট রেখে দিলেন।[৪৫]

৩৫

জুতার ফিতা

হযরত ইমাম জাফর সাদিক (আঃ) কতিপয় সাহাবীকে নিয়ে তাঁর এক আত্মীয়কে সান্ত্বনা দানের জন্য তার বাড়িতে যাচ্ছিলেন। পথে ইমামের জুতার ফিতা ছিড়ে গেলো। তাতে ইমাম জুতা পায়ে দিয়ে চলতে পারছিলেন না। তিনি জুতা খুলে হাতে নিলেন এবং খালি পায়ে চলতে লাগলেন।

এ অবস্থা দেখে তাঁর অন্যতম সাহাবী ইবনে আবী ইয়াফুর তৎক্ষণাৎ স্বীয় পায়ের জুতা খুলে ফেললো। সে তার জুতার ফিতা খুলে ইমামের দিকে এগিয়ে দিলো যাতে করে ইমাম জুতা পায়ে দিয়ে চলতে পারেন। আর সে নিজে খালি পায়ে চলবে।

ইমাম সাদিক (আঃ) আবদুল্লাহ ইবনে আবী ইয়াফুরের এ কাজে অসন্তুষ্ট হয়ে তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কোন অবস্থাতেই তার ফিতা গ্রহণ করতে রাজী হলেন না। তিনি বললেন, যদি কারো উপর কোন বিপদ এসে পড়ে তখন সে বিপদ বহন করা তার জন্যই উত্তম কাজ। এটা কিছুতেই সঙ্গত কাজ হতে পারে না যে, বিপদ আসবে একজনের উপর আর তা বহন করবে অন্যজন।[৪৬]

৩৬

হিশাম ও ফারাযদাক

দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীর প্রথম দিকের কথা। তখন উমাইয়্যাদের শাসন ক্ষমতা একেবারে তুঙ্গে। হিশাম ইবনে আবদুল মালেক খলিফার পরবর্তী স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত হয়েছে। খেলাফতের পরবর্তী উত্তরাধিকারী হিশাম একবার হজ্ব করতে গেলো। সে কাবাঘর তওয়াফ করার পর হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করার জন্য সব রকমের চেষ্টা করলো। কিন্তু লোকদের ভিড়ের চাপের কারণে তার মনের আশা পূরণ হলো না। সে হাজরে আসওয়াদের নিকটে পৌঁছতে ব্যর্থ হলো। সকলেই ইহরামের পোশাক পরা। মুখে মুখে আল্লাহর যিকির জারি ছিলো। হাজীগণ একই আমল অনুশীলন করছেন। মোট কথা সকলে মিলে এক আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলে পাক- পবিত্র ধ্যান- ধারণা ও নেক চিন্তা- ভাবনায় এমনই নিমজ্জিত ছিলো যে, হিশামের পার্থিব ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য করার সময় তাদের ছিল না। হিশামের সাথে আগত সাথীরা অবশ্য এ ব্যাপারে খুবই তৎপর ছিল যে, যুবরাজের ব্যক্তিত্ব ও শান- শওকত যেনো সুরক্ষিত থাকে। তাদের কাছে হজ্বের আরকান- আহকাম ও আমল- অনষ্ঠানের তেমন কোন গুরুত্ব ছিল না। তাদের নিকট আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের চাইতে খলিফার উত্তরাধিকারীর সন্তুষ্টির চিন্তাই বড় ছিল।
যা হোক, হিশাম নিজেকে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত পৌঁছাবার জন্য সম্ভাব্য সব রকমের চেষ্টাই করেছে যাতে করে হজ্বের নিয়ম অনুযায়ী স্বীয় হাতকে সে পবিত্র পাথরের সাথে স্পর্শ করতে পারে। কিন্তু ঠাসা ভিড়ের কারণে তার সব চেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। বাধ্য হয়ে সে ফিরে এলো। তার সেবাদাস সাথীরা একটা চেয়ার এনে একটু উঁচু এক স্থানে রেখে দিলো। হিশাম সে চেয়ারটিতে বসে হজ্বের দৃশ্য দেখতে লাগলো। সিরিয়া থেকে আগত তার সাথীরা তাকে ঘিরে দাঁড়ালো। হিশামের সাথে তারাও খোদার আশেক বান্দাদের আকীদা- বিশ্বাস ও আগ্রহ- উদ্দীপনার দশ্য দেখতে থাকলো।

ঠিক এমনি সময়ে এক সুদর্শন ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটলো যার চেহারায় অতীব তাকওয়া-পরহেযগারীর নিদর্শনাদি পরিদৃষ্ট হচ্ছিল। তার শরীরেও ছিলো অপরাপর হাজীদের ন্যায় একটা সাদা পোশাক। তার চেহারা থেকে খোদার ইবাদত- বন্দেগীর নিদর্শন প্রকাশিত হচ্ছিলো। প্রথমে তিনি কাবাঘর তাওয়াফ করলেন। অতঃপর অত্যন্ত প্রশস্তিও প্রশান্তঅন্তরে হাজরে আসওয়াদের দিকে ধীরে ধীরে এগুতে লাগলেন। প্রচণ্ড সেই ভিড় সত্ত্বেও লোকেরা যখনই তাকে দেখলো সাথে সাথে সরে গিয়ে পথ বের করে দিল। তিনি হাজরে আসওয়াদের নিকট পৌঁছে গেলেন। সিরিয়া থেকে আগত হিশামের সঙ্গী- সাথীরা এ দৃশ্যটি খুব ভালোভাবে প্রত্যক্ষ করছিলো। এর আগে তারা দেখেছিলো যে, খলিফার যুবরাজ এতো শান- শওকত নিয়ে আপ্রাণ চেষ্টা করেও হাজরে আসওয়াদের নিকট পৌঁছতে পারেনি। সুতরাং এ দৃশ্যটি তাদেরকে বিস্মিত করে দেয়। তাদের মধ্যে থেকে একজন স্বয়ং হিশামকেই জিজ্ঞাসা করলো, এ ব্যক্তিটি কে?

হিশাম খুব ভালোভাবেই জানতো যে, তিনি হযরত আলী ইবনিল হোসাইন (অঃ) অর্থাৎ ইমাম যায়নুল আবেদীন (আঃ)। কিন্তু সে না চেনার ভান করে বললো, আমি তাকে চিনি না।

এমতাবস্থায় হিশামের ভয়- ভীতির সামনে কার এ সাহস ছিল যে, ইমামের পরিচয় তুলে ধরার জন্য মুখ খুলবে? সকলেই জানে যে, হিশামের তলোয়ার থেকে সর্বদা রক্ত ঝরতে থাকে। এ সময় মুখ খোলা মানেই হচ্ছে হিশামের তলোয়ারে নিচে গর্দান পেতে দেয়া। কিন্তু এমনি মুহূর্তেও তৎকালীন আরবের বিখ্যাত কবি হাম্মাম ইবনে গালিব যিনি কবি ফারাযদাক নামে খ্যাত ছিলেন, তিনি তার আবেগের জোশ দমন করে রাখতে পারলেন না। সাথে সাথেই নির্ভয়ে বলে উঠলেন, কিন্তু আমি তাকে খুব ভালোভাবেই চিনি। এতটুকুন বলেই তিনি থামলেন না। বরং নিকটেই একটি উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং ইমামের প্রশংসা করে অত্যন্তজোশ ও উদ্যমের সাথে নিজস্ব বিশেষ সুরে হিশামের মুখের সামনেই কবিতা আবত্তি শুরু করলেন। ফারাযদাকের এ কবিতা আরবী সাহিত্যে শীর্ষস্থানের অধিকারী। কবিতাটি পাঠ করলে মনে হয় যেনো তার জযবা জোশ ও উদ্দীপনার সাগরে জোয়ার এসেছিল। তিনি তার আত্মিক জযবাকে কবিতার ছন্দে যেভাবে রূপ দিয়েছেন তার জন্য দরকার একটি মুক্ত পরিবেশ। অথচ বাস্তব অবস্থা্ ' ছিল সম্পূর্ণ

বিপরীত। ফারাযদাকের চোখের সামনেই হিশামের খোলা তলোয়ার চমকাচ্ছিল। তবুও তিনি তার মুখের উপরই কবিতা রচনা করেই চলছিলেন। কবি ফারাযদাক তার কবিতায় হযরত ইমাম যায়নুল আবেদীন (আঃ)- এর পরিচয় তুলে ধরে এভাবে বলেন :

* তিনি সেই ব্যক্তি যাকে মরু- মক্কার প্রতিটি পাথরকণা খুব ভালোভাবে চেনে। এ পবিত্র কা'বাঘর তার পরিচয় সম্পকে যথাযথ অবগত। পবিত্র হেরেম শরীফের ধুলা- বালির প্রতিটি অণু- পরমাণুর কাছে রয়েছে তার পরিচিতি। হেরেমের বাইরে মাটির কাছেও তিনি অজানা অপরিচিত নন।

* তিনি মহান আল্লাহর অতি প্রিয় বান্দার সন্তান। যার তাকওয়া পরহেযগারীর কোন তুলনা হয় না। পুত- পবিত্র আত্মার অধিকারী ব্যক্তিত্ব বলে সারা বিশ্বে তার খ্যাতি ছড়িয়ে আছে। এরপর হিশাম ইবনে আবদুল মালিককে লক্ষ্য করে তিনি ইমামের প্রশংসা এভাবে তুলে ধরেন : *তুমি বলছো যে, তুমি তাকে চেনো না। কিন্তু তোমার এ বলার দ্বারা তার কিছুই আসে যায় না অর্থাৎ তোমার এ কথা বলার দ্বারা উচ্চ মর্যাদার অধিকারী এ ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদায় বিন্দুমাত্র কমবে না। যদি ধরে নেয়া যায় যে, তুমি একা তাকে চেনো না তাহলে সেটা খুব বড় কথা নয়। কেননা আরব- অনারবের সকলের কাছেই তিনি খুব ভালোভাবে পরিচিত আছেন।

কবি ফারাযদাকের এ কবিতা শুনে হিশাম ক্রোধে অগ্নিমূর্তি ধারণ করলো। সাথে সাথেই হুকুম জারি করলো বাইতুলমাল থেকে ফারাযদাককে যে ভাতা দেয়া হতো তা বন্ধ করে দেয়া হলো। শুধু এখানেই শেষ নয়, বরং তাকে গ্রেফতার করে মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী অসফান নামক স্থানে বন্দী করে রাখা হলো। ফারাযদাককে এসব শাস্তি এ জন্য দেয়া হয়েছিল যে, তিনি বীরত্ব প্রদর্শন করে নিজের আকীদা- বিশ্বাসের প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ফারাযদাকের দৃষ্টিতে এরূপ পার্থিব কষ্ট- ক্লেশ ও বিপদে পতিত হওয়াটা একেবারেই স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। তার বাহাদুরী ও সাহসিকতার নমুনা এমন ছিল যে, বন্দী দশার জীবনেও তিনি হিশামের কর্মকাণ্ডের কঠোর সমালোচনা করে তার ভর্ৎসনা করা থেকে বিরত হননি।

হযরত ইমাম যায়নুল আবেদীন (আঃ) যখন জানতে পারলেন যে, তার সরকারী ভাতা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে এবং তিনি বন্দীশালায় আটক রয়েছেন তখন তিনি তার জন্যে কিছু টাকা- পয়সা

জেলখানায় পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু ফারাযদাক তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে বললেন, আমি আমার সে কবিতাটি কেবল আমার ঈমান- আকীদার তাগিদে ও আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের জন্যই রচনা করেছিলাম। অতএব আমি তার বদলে টাকা পয়সা গ্রহণ করতে চাই না।

ইমাম আলী ইবনিল হোসাইন (আঃ) পুনরায় সে টাকা পাঠিয়ে দিয়ে সংবাদ দিলেন, আল্লাহ তোমার নিয়ত ও ইচ্ছা সম্পর্কে অবগত আছেন। সে অনুযায়ী তোমাকে প্রতিদানও দেবেন। তুমি যদি আমার পাঠানো এ সাহায্য গ্রহণ করো তাহলে সেখান থেকে কমে যাবে না। এ পর্যায়ে ইমাম তাকে গ্রহণ করার ব্যাপারে কসম দিয়েছিলেন। আর তিনিও তা গ্রহণ করে নেন।[৪৭]

৩৭

বুযনতী

আহমদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবী নছর বুযনতী সেকালের সম্মানিত ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ওলামা ও জ্ঞানীদের মধ্যে পরিগণিত হতেন। অনেক দিন পর্যন্ততার ও ইমাম আলী রেজা (আঃ)- এর মধ্যে পত্র বিনিময় হচ্ছিল। বুযনতী অসংখ্য প্রশ্ন লিখে ইমামের কাছে পাঠাতেন। ইমাম (আঃ) তার প্রতিটি প্রশ্নের জবাব অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণভাবে দিতেন। অবশেষে বুযনতী ইমামের ইমামতে বিশ্বাসী হয়ে গেলেন। একদিন তিনি ইমামের কাছে আবেদন জানালেন, সরকারে পক্ষ থেকে আমার উপর চলাফেরার ব্যাপারে কোন বিধি- নিষেধ নেই। যে কোন স্থানে যাতায়াতের স্বাধীনতা আমার আছে। অতএব আমার মনের অনেক আশা যে, একদিন আমি আপনার বাড়িতে আসবো এবং আপনার জ্ঞান- গরিমা থেকে আরো উপকৃত হবো।

একদিন ইমাম আলী রেজা (আঃ) নিজের বিশেষ বাহন পাঠিয়ে বুযনতীকে নিজের মেহমান হিসেবে ডেকে পাঠালেন। জ্ঞান- গর্ভ বিষয় নিয়ে আলাপ- আলোচনা ও প্রশ্ন- উত্তরের মধ্যে দিয়ে আধা রাত পেরিয়ে গেলো। বুযনতী একের পর এক প্রশ্ন করতে থাকেন এবং ইমাম (আঃ) অত্যন্ত বিজ্ঞতার সাথে জবাব দিতে থাকেন। বুযনতী নিজের মনে এ ধারণা পোষণ করে অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত ছিলেন যে, আজ ইমাম তাকে মেহমান হিসেবে ডেকে পাঠিয়েছেন আর তিনি ব্যক্তিগতভাবে ইমামের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করার সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছেন।

রাত অতিবাহিত হতে লাগলো। এভাবে ঘুমের সময় হলো। ইমাম (আঃ) তার খাদেমকে ডেকে বললেন, আমি যে বিছানায় শয়ন করি সে বিছানাটি এনে বিছিয়ে দাও। তাতে বুযনতী বিশ্রাম নিবে।

এমন আন্তরিক ভালোবাসা বুযনতীর হৃদয়ে একটা অসাধারণ দাগ কাটে। তিনি কল্পনার জগতে হারিয়ে গেলেন। মনে মনে ভাবতে লাগলেন, আজ আমার চেয়ে বেশী সৌভাগ্যবান লোক দুনিয়াতে আর কেউ নেই। ইমাম আমার আসার জন্য তার নিজের বিশেষ বাহন পাঠিয়েছেন।

আমি সেই ব্যক্তি যার সাথে ইমাম রেজা (আঃ) অর্ধরাত পর্যন্ত আলাপ- আলোচনা করেছেন এবং আমার প্রশ্নাবলীর জবাব দিয়েছেন। আমি সে সৌভাগ্যবান, যখন আমার বিশ্রাম নেয়ার সময় হয়েছে তখন ইমাম নির্দেশ দিলেন তার নিজের বিছানা আমার জন্য বিছিয়ে দিতে। কাজেই জগতে আমার চেয়ে বেশী ভাগ্যবান আর কে হতে পারে?

এ দুনিয়া ও দুনিয়ার সব কিছুকে নিজের পায়ের নিচে দেখছিলেন। হঠাৎ ইমাম (আঃ) বসা থেকে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বুযনতীকে ইয়া আহমদ বলে ডাকলেন। ইমামের ডাকে তার কল্পনার রাজ্যে ছেদ গেলো। অতঃপর ইমাম (আঃ) তাকে বললেন, আজ তোমার সাথে যা কিছু ঘটেছে সেটাকে তুমি নিজের জন্য গর্ব করার এবং অপরাপর মুসলমানদের উপর নিজেকে শ্রেষ্ঠ ভাববার বিষয় হিসাবে গ্রহণ করো না। কেননা ছা'ছায়া ইবনে ছোহান হযরত আলী (আঃ)- এর বড় সাহাবী ছিল। একবার সে অসুস্থ হলে হযরত আলী (আঃ) তাকে দেখার জন্য তার বাড়িতে গেলেন। অনেকক্ষণ পর্যন্ত তার সাথে আন্তরিক ভালোবাসা ও স্নেহসুলভ আচরণ করলেন। দীর্ঘক্ষণ ধরে তার মাথায় হাত বলালেন। কিন্তু সেখান থেকে যাবার সময় আলী (আঃ) তাঁর বন্ধুকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আজকের আমার এ আচরণ তোমার জন্য গর্ব ও বড়াই করার বিষয় হিসাবে নিয়ো না। কেননা এটা তোমার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্বের নিদর্শন নয়। আমি এ কাজগুলো আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য কাজ মনে করে আঞ্জাম দিয়েছি। সুতরাং কখনো কারো এ চিন্তা করা উচিত নয় যে, এ জাতীয় কাজ তার জন্য শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন।[৪৮]

৩৮

আলীর মেহমান আকীল

আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (আঃ)- এর খেলাফতকাল। তার ভাই জনাব আকীল একবার কুফায় তার বাড়িতে মেহমান হলেন। হযরত আলী (আঃ) তার বড় ছেলে ইমাম হাসানকে ইঙ্গিত করলেন যে, স্বীয় চাচা আকীলকে একটি জামা উপহার দাও। ইমাম হাসান একটি জামা ও নিজের পক্ষ থেকে একটি রিদা (চাদর) চাচার খেদমতে উপহার হিসেবে পেশ করলেন। দিন শেষে রাত এলো। গ্রীষ্মকাল। হযরত আলী ও তাঁর ভাই আকীল দারুল খেলাফতের ছাদে বসে আলাপ- আলোচনা করছিলেন। কথাবার্তার মধ্য দিয়ে রাতের খাবার সময় হয়েছে। জনাব আকীল নিজেকে খলিফার মেহমান হিসাবে ভাবছিলেন। তাই তার আশা ছিল যে, আজ দস্তরখানে রকমারী ও রং বেরংয়ের মজাদার খাবার সাজানো থাকবে। কিন্তু তার আশার বিপরীত অত্যন্তসাধারণ খাবার দস্তরখানে দেখতে পেলেন। অবাক হয়ে দস্তরখানের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, খাবার জন্যে তোমাদের যা প্রস্তুতি তা কি শুধু এই?

আলী (আঃ) বললেন, এগুলো কি খোদার নেয়ামত নয়? আমি তো খোদার এ নেয়ামতগুলোর জন্যই লাখ লাখ শুকুর আদায় করি।

জনাব আকীল বললেন, তাহলে আমার প্রয়োজনের কথাটা তোমাকে বলে তাড়াতাড়ি এখান থেকে বিদায় নেবো। আসল কথা হলো, আমি ঋণের দায়ে জর্জরিত আছি। এখন তুমি হুকুম দাও খুব তাড়াতাড়ি যেন বাইতুলমাল থেকে আমার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করা হয়। এ ছাড়াও ভাই হিসাবে যতদূর তোমার পক্ষে সম্ভব আমাকে সাহায্য করো যেন প্রশান্তির মন নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারি।

হযরত আলী (আঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার ঋণ কত টাকা?

জনাব আকীল বললেন, এক লাখ দিরহাম।

হযরত আলী (আঃ) বললেন, উহ্! এক লাখ দিরহাম? এতো বিরাট অংকের টাকা? অত্যন্ত আফসোসের সাথে বলতে হচ্ছে যে, আমার কাছে এতো টাকা নেই যে, আপনার ঋণ পরিশোধ করতে পারি। কিন্তু কিছুদিন অপেক্ষা করুন। আমার মাসিক ভাতা পাওয়ার সময় নিকটবর্তী। আমার ভাতার টাকা থেকে আমি আমার নিজের অংশটা আপনাকে দিয়ে দেবো। ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের যে অধিকার রয়েছে সে ব্যাপারে আমি বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করবো না। যদি পরিবার- পরিজনের দায়- দায়িত্ব আমার উপর না থাকতো তাহলে আমি আমার সমস্ত পয়সাই আপনাকে দিয়ে দিতাম। আমার নিজের জন্য কিছুই রাখতাম না।

জনাব আকীল বললেন, তুমি এসব কি বলছো? আমি তোমার বেতন পাওয়া অবধি অপেক্ষা করবো? তুমি এ ধরনের কথাবার্তা কেন বলছো? দেশের সমস্ত টাকা পয়সা ও বাইতুলমাল তোমার হস্তগত। আর তুমি নাকি আমাকে বলছো বেতনের সময় নিকটবর্তী। কাজেই বেতন হওয়া অবধি আমি অপেক্ষা করতে থাকবো। তারপর তুমি তোমার বেতনের কিছু অংশ আমাকে দেবে। অথচ বাইতুলমাল তোমার হাতেই। তুমি যত ইচ্ছা বাইতুলমাল থেকে নিতে পারো। তাহলে কেন আমাকে বেতনের হাওয়ালা দিচ্ছো? আর কতো টাকাই বা তুমি বাইতুলমাল থেকে বেতন পাও? ধরে নাও তুমি তোমার সমস্ত বেতনটাই আমাকে দিয়ে দিলে, তাতেও তো আমার ব্যথার উপশম হবে না।

হযরত আলী (আঃ) বললেন, আপনার চিন্তা- ভাবনার উপর আমি অবাক হচ্ছি। রাষ্ট্রের বাইতুলমালে টাকা পয়সা আছে কি নেই তাতে আমার আর আপনার কি আসে যায়? আমার ও আপনার তো ততটুকু অধিকার যতোটুকু আর সব মুসলমান ভাইয়ের রয়েছে। এ কথা সত্য যে, আপনি আমার ভাই। অতএব আমার কর্তব্য রয়েছে যে, যথাসাধ্য আপনার সাহায্য করা। কিন্তু সে সাহায্য বাইতুলমাল থেকে নয়, বরং ব্যক্তিগত অর্থ থেকে।

এভাবে দুই ভাইয়ের মধ্যে আলাপ- আলোচনা চলতে থাকে। জনাব আকীল স্বীয় ভ্রাতা আলীকে বার বার বলতে থাকলেন যে, বাইতুলমালের দ্বার খুলে দিয়ে সেখান থেকে তার প্রয়োজনীয় অর্থ

তাকে দিয়ে দিতে যাতে করে তিনি লোকদের পাওনা পরিশোধ করে স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতে পারেন।

তারা যেখানে বসে কথাবার্তা বলছিলেন সেখান থেকে কুফার বাজার পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। ব্যবসায়ী- বণিকদের নিজেদের টাকা পয়সা রাখার সিন্দুকগুলোও দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। জনাব আকীল বার বার তার ভাই আলীর কাছে খোশামোদের ভাষায় জিদ করছিলেন, আমাকে বাইতুলমাল থেকে প্রয়োজনীয় টাকা পয়সা দিয়ে দাও, যাতে করে আমি ঋণমুক্ত হতে পারি।

হযরত আলী (আঃ) বললেন, আপনি খালি খালি জিদ করছেন আর আমার কথা বুঝতে চাচ্ছেন না। আপনি যদি আমার কথা বুঝতে চান তাহলে আসুন আমি আপনাকে একটা পন্থা বলে দিচ্ছি। যদি সে পন্থা অবলম্বন করতে পারেন তাহলে আপনার সমস্তঋণ পরিশোধ হয়ে যাবে। শুধু তাই নয়, আপনার নিজের খরচাদির জন্যও অনেক টাকা বেঁচে যাবে।

জনাব আকীল বললেন, কি সে পন্থা?

হযরত আলী (আঃ) বললেন, দেখুন। এ বাজারে অনেক টাকার সিন্দুক পড়ে আছে। এখন রাত্রি বেলা। সমস্ত বাজার নীরব নিস্তব্ধ। আপনি নিচে চলে যান। বাজারে গিয়ে সিন্দুকগুলোর তালা ভেঙ্গে আপনার যত টাকা প্রয়োজন নিয়ে নিন।

জনাব আকীল বললেন, এ সিন্দুকগুলো কার? আলী বললেন, এগুলো ব্যসায়ীদের নিজস্ব সিন্দুক। তারা সারাদিন পরিশ্রম করে কেনা- বেচা করে যা টাকা আয় করেছে তা এ সিন্দুকগুলোতে রেখে তারা বাড়ি চলে গেছে।

আকীল বললেন, বড় আশ্চর্যের কথা। তমি আমাকে পরামর্শ দিচ্ছ যে, লোকদের সিন্দুকের তালা ভেঙ্গে সে সমস্ত লোকের টাকা- পয়সা নিয়ে নিতে যারা সারাদিন খেটে অনেক কষ্ট- ক্লেশ করে টাকা- পয়সা উপার্জন করে নিজেদের সমস্ত কামাই- পুঁজি আল্লাহর উপর ভরসা করে এ সিন্দুকগুলোতে রেখে ঘরে চলে গেছে। তুমি কি আমাকে এ কথা বলতে চাও যে, তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের জমাকৃত টাকা- পয়সা চুরি করে নিয়ে যাবো?

আলী (আঃ) বললেন, তাহলে আপনি আমাকে এ পরামর্শ কেন দিচ্ছেন আর তার উপর জিদ করছেন যে, আমি সমস্ত মুসলমানের বাইতুলমালের তালা খুলে আপনার প্রয়োজনীয় টাকা-পয়সা আপনাকে দিয়ে দিতে? আপনি নিজেই বলুন। এ বাইতুলমাল কার? বস্তুত এ সম্পদ তো তাদের যারা নিজেদের ঘর- বাড়িতে নিশ্চিন্তে শুয়ে আছে। আপনি খুব ভালোভাবেই জানেন যে, বাইতুলমাল আমার ব্যক্তিগত সম্পদ নয়। যেভাবে রাতের অন্ধকারে ব্যবসায়ীদের সিন্দুকের তালা ভাঙ্গা একটা অবৈধ কাজ, তেমনি ব্যক্তিগত প্রয়োজনে বাইতুলমালের দরজা খোলাও অপরাধ। আচ্ছা আসুন। আমি আপনাকে আরেকটি পন্থাও বলছি। যদি আপনার পছন্দ হয় তাহলে এ প্রস্তাবটি গ্রহণ করতে পারেন।

জনাব আকীল, তোমার দ্বিতীয় প্রস্তাব কি?

আলী (আঃ) বললেন, আপনি যদি ভালো মনে করেন তাহলে আপনার তলোয়ার হাতে নিন। আমিও আমার তলোয়ার তুলে নেবো। কুফার নিকটেই একটি পুরাতন শহরে নাম হাইরাহ। সেখানে বড় বড় বণিক- সওদাগরদের বাড়িঘর। রাতের অন্ধকারে আমরা দুই ভাই মিলে সেখানে যাবো। আর সে সওদাগরদের কোন একজনের বাড়িতে ডাকাতি করে পর্যাপ্ত টাকা পয়সা নিয়ে ফিরে আসব। আকীল বললেন, হে আমার প্রিয় ভাই। আমি এখানে চুরি- ডাকাতি করার জন্য আসি নাই। আর তুমি আমাকে এ সবের প্রস্তাব দিচ্ছো। আমি তো কেবল তোমাকে এ কথা বলছি যে, আমাকে রাষ্ট্রীয় বাইতুলমাল থেকে সে কয়টা টাকা দান করো যা দ্বারা আমার ঋণের বোঝা থেকে মুক্ত হতে পারি।

আলী (আঃ) বললেন, আমরা দুই ভাই মিলে এক ব্যক্তির মাল চুরি করা উত্তম নাকি হাজার হাজার মুসলমানদের তথা সমস্ত মুসলমানদের অধিকার চুরি করা? এটা আপনার কোন ধরনের চিন্তা- ভাবনা ও কি রকম যুক্তি যে, তলোয়ারের সাহায্যে এক ব্যক্তির মাল নিয়ে নেয়া চুরি আর বাইতুলমাল থেকে সাধারণ মুসলমানদের মাল তুলে নেয়া চুরি নয়? আমার মনে হয় আপনার নিকট চুরি- ডাকাতির অর্থ হচ্ছে কোন লোক নিজের শক্তি প্রয়োগ করে কারো কাছ থেকে তার মাল ছিনিয়ে নেয়া। ভাইজান।

আপনি বাইতুলমালের দরজা খুলে টাকা পয়সা বের করার কথা বলছেন। কিন্তু আপনার জানা থাকা উচিত যে, সব চেয়ে নিকৃষ্ট চুরি হচ্ছে এটাই, যা আপনি এখন আমাকে করার জন্য বলছেন।[৪৯]

৩৯

ভয়ানক স্বপ্ন

সে একটি স্বপ্ন দেখে প্রচণ্ড ঘাবড়ে গেল। আর সব সময় সে স্বপ্নের নানা রকম ভয়ানক ব্যাখ্যা চোখের সামনে দেখতে লাগলো। সে ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় হযরত ইমাম জা'ফর সাদিক (আঃ)- এর খেদমতে এসে বললো, আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি। আমি স্বপ্নে দেখতে পেলাম যে, একটি কাঠের মানুষ একটি কাঠের ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে আছে। তার হাতে একটি তলোয়ার। আর সে তলোয়ারটি শুন্যের মধ্যে চালনা করছে। এ স্বপ্নটি দেখে আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম। আমার চোখের সামনে সব সময় সে স্বপ্নটি ভেসে উঠছে। দয়া করে আমাকে সে স্বপ্নটির তা'বীর বলে দিন। যাতে করে আমি এ ভয়- ভীতি থেকে মুক্তি লাভ করতে পারি।

ইমাম (আঃ) বললেন, তোমার দৃষ্টি এক ব্যক্তির ধন- দৌলতের উপর লেগে আছে। তুমি সব সময় এ চিন্তা- ভাবনায় লিপ্ত থাকো যে, কি করে তার ধন- দৌলত আত্মসাৎ করা যায়। তুমি আল্লাহকে ভয় করো। আর এ ধরনের চিন্তা- ভাবনা থেকে বিরত থাকো।

লোকটি বললো, নিঃসন্দেহে আপনি একজন প্রকৃত ও সত্যিকার আলেম। এতে কোনই সন্দেহের অবকাশ নেই যে, আপনি জ্ঞানের খনি ও ভাণ্ডার থেকে ইলম ও জ্ঞান হাসিল করেছেন। আমি এ কথা স্বীকার করছি যে, আমার অন্তরে এরূপ একটি খেয়াল ছিল। আসলে আমার প্রতিবেশী এক আত্মীয়ের নিকট অনেক জায়গা জমি আছে। তার টাকা- পয়সারও খুব বেশী দরকার। তাই সে তার জমি- জায়গা বিক্রি করতে চাচ্ছে। আর আমি ছাড়া তার এ সম্পত্তি খরিদ করার মতো ক্রেতা বর্তমান কেউ নেই। তখন আমি এ চিন্তা- ভাবনায় লেগেছিলাম যে, তার প্রয়োজনের সুযোগের সদ্ব্যবহার করে অল্প মূল্যে তার সমস্ত সম্পদ কিনে নেবো।[৫০]

৪০

বনু সায়ে'দার বস্তিতে

বর্ষার রাত। চারিদিকে অন্ধকার ছেয়ে আছে। এমন নীরব- নিস্তব্ধ অন্ধকার পরিবেশে ইমাম জা'ফর সাদিক (আঃ) একাকী ঘর থেকে বের হলেন। বনু সায়ে'দার বস্তির দিকে যাচ্ছিলেন। ইমামের নিকটতম এক সাথী মায়ালী ইবনে খুনাইস, যে ইমামের পারিবারিক খরচাদি দেখাশোনা করতো সে ইমামের এভাবে বাড়ি থেকে বের হওয়াটা লক্ষ্য করেছে। সে নিজের মনে বলতে লাগলো এভাবে অন্ধকার রাতে ইমামের একা একা যাওয়া ঠিক হবে না। তাই সে ইমামের পিছে পিছে ধীরে ধীরে চলতে লাগলো। তার ও ইমামের মাঝে দূরত্ব এতোখানি ছিল যে, সে এ অন্ধকারের মধ্যে ইমামের অবয়বটাই শুধু দেখতে পাচ্ছিল।

সে ধীরে ধীরে ইমামের পিছে পিছে চুপচাপ চলছিল। হঠাৎ তার মনে হলো যেন ইমামের কাঁধ থেকে কোনো জিনিস মাটিতে পড়ে গেছে। আর ইমামের ক্ষীণ কণ্ঠে শব্দ হলো। ইমাম বলছেন, হে আমার আল্লাহ! এগুলোকে আমায় ফিরিয়ে দাও।

এমনি সময় মায়ালি ইমামের সামনে গিয়ে তাকে সালাম নিবেদন করলো। কথা শুনেই ইমাম বুঝতে পারলেন যে, এটা মায়ালী। জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি মায়ালী?

জবাবে সে বললো, জী হ্যাঁ। আমি মায়ালী।

ইমামের প্রশ্নের জবাব দেবার পর মায়ালী গভীরভাবে দেখতে লাগলো যে, ইমামের কাঁধ থেকে কি জিনিস মাটিতে পড়ে গেছে। সে দেখলো যে, কিছু রুটি মাটিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে।

ইমাম (আঃ) বললেন, এ রুটিগুলোকে তুলে আমার কাছে দাও।

মায়ালী রুটিগুলোকে তুলে ইমামের কাছে দিল। রুটিগুলোকে তুলে একত্র করার পর দেখা গেল যে, এত বড় একটা বোঝা হলো যা, একজন লোক কোন রকমে কাঁধে করে বহন করতে পারে।

মায়া'লী বললো, হে ইমাম! আপনি অনুমতি দিলে বোঝাটি আমি নিতে পারি।

ইমাম (আঃ) বললেন, না! তোমার দরকার হবে না। এ কাজের জন্য তোমার চেয়ে আমিই বেশী উপযুক্ত।

ইমাম জা'ফর সাদিক (আঃ) রুটির বোঝাটি নিজের কাঁধে তুলে নিলেন এবং দুইজনে পথ চলতে লাগলেন। কিছু দূর চলার পর তারা বনু সায়েদার বস্তিতে গিয়ে পৌঁছলেন।

সেটা ছিল দরিদ্র অসহায় লোকদের বস্তি। যাদের বাড়ি- ঘর ও ঠিকানা ছিল না। তারা এসে সেখানে মাথা গোঁজার ঠাঁই বানাতো।

সেখানে পৌঁছে তারা দেখতে পেলেন যে, বস্তির সমস্তলোক ঘুমিয়ে আছে। একজনও জেগে নেই। ইমাম (আঃ) প্রত্যেকেরই কাপড়ের নিচে একটি দুটি করে রুটি রেখে দিলেন। রুটি বন্টনের সময় ইমাম খুব সতর্কতার সাথে লক্ষ্যে রাখলেন যেন কেউ বাদ পড়ে না যায়। রুটি বণ্টন শেষে ইমাম মায়ালীকে সাথে নিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন।

মায়ালী জিজ্ঞাসা করলো, হে ইমাম! আপনি এই গভীর রাতে এ লোকদের মাঝে কষ্ট করে রুটি বণ্টন করলেন। এরা কি সব শিয়া ছিল? তারা কি ইমামতে বিশ্বাস রাখে?

ইমাম (আঃ) বললেন, না! এরা ইমামতে বিশ্বাস করে না। যদি এরা ইমামতে বিশ্বাসী হতো তাহলে আমি রুটির সাথে নিমকও আনতাম।[৫১]

৪১

ইয়াহুদীর সালাম

রাসূল (সাঃ)- এর স্ত্রী বিবি আয়েশা তাঁর কাছে বসেছিলেন, এমন সময় একজন ইয়াহুদী উপস্থিত হলো। সে আসসালামু আলাইকুম বলার পরিবর্তে বললো, আসসামু আলাইকুম অর্থাৎ তোমাদের মৃত্যু হোক। কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই অপর একজন ইয়াহুদী এলো। সেও আসসালামু আলাইকুম এর বদলে আসসামু আলাইকুম বললো। এতে বোঝা গেল যে, তারা একটা পরিকল্পনাভিত্তিক এ ধরনের মৌখিক খারাপ আচার- ব্যবহার দ্বারা রাসূলের অন্তরে আঘাত হানতে চায়। এতে বিবি আয়েশা অত্যন্ত ক্রোধান্বিতা হলেন এবং চিৎকার করে বললেন, মৃত্যু আসুক তোমাদের উপর এবং...।

রাসূলে আকরাম (সাঃ) বললেন, হে আয়েশা! অসংযত কথাবার্তা বলো না। অসংযত ও অশ্রাব্য কথাবার্তা যখন বড় আকৃতি ধারণ করে তখন তার আকৃতি হয় অত্যন্তবিশ্রী, কুৎসিৎ। নম্রতা, ভদ্রতা ও ধৈর্য ধারণের পন্থা যারা অবলম্বন করে, এগুলো তাদের শ্রী- বৃদ্ধি করে ও তাদেরকে আকর্ষণীয় করে তোলে। নম্রতা ও ভদ্রতা মানুষকে সৌন্দর্য দান করে। কোন বিষয়ে যখন নম্রতা ও সভ্যতার অভাব থাকে তখন সেখানে সৌন্দর্য ও আকর্ষণ কমে যায়।তুমি এভাবে অসন্তুষ্ট ও রাগান্বিতা হয়ে গেলে কেন?

বিবি আয়েশা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আপনি কি দেখেননি যে, এ লোকেরা অপমানজনক ও নির্লজ্জভাবে আসসালামু আলাইকুম এর স্থলে কি বলেছে?

নবী (সাঃ) বললেন, তাতে কি হয়েছে? তুমি হয়তো লক্ষ্য করোনি, আমিও জবাবে বলেছি, আলাইকুম অর্থাৎ তোমাদের উপর। তাদের জবাবের জন্য এটুকুই যথেষ্ট।[৫২].

৪২

হযরত আবু যার গিফারীর নামে পত্র

হযরত আবু যার গিফারী একটি পত্র পেলেন। পত্রটি খুলে তিনি পাঠ করলেন। দেখলেন পত্রটি অনেক দূর থেকে এসেছে। এক ব্যক্তি পত্রের মাধ্যমে তার কাছে উপদেশ চেয়েছে। সে লোকটি জনাব আবু যার গিফারী সম্পর্কে অবগত ছিল। সে জানতো যে, রাসূলে আকরাম (সাঃ) তাকে কতোই না ভালোবাসতেন। রাসূলের কাছে তার কতোই না মর্যাদা ও সম্মান। তিনি রাসূলের সংস্পর্শে থেকে জ্ঞান- বিজ্ঞানে উচ্চ শিক্ষা হাসিল করেছেন।

হযরত আবু যার গিফারী তার পত্রের জবাবে খুবই ছোট্ট একটি মাত্র কথা লিখে দিলেন। কথাটি ছিল এই, যাকে তুমি আর সকলের চেয়ে বেশী ভালোবাসো, তার সাথে মন্দ আচরণ ও শত্রুতা করো না। শুধু এতটুকুন লিখেই তিনি পত্রটি পাঠিয়ে দিলেন।

উপদেশ প্রার্থী লোকটি জনাব আবু যারের পত্র পেয়ে খুলে পড়লো। কিন্তু সে কিছুই বুঝতে পারলো না। সে নিজের মনে নিজে বললো, তার মানে কি? এ কথার উদ্দেশ্য কি? যাকে তুমি সমস্তলোকের চেয়ে বেশী ভালোবাসো, তার সাথে মন্দ আচরণ ও শত্রুতা করো না, এটা তো একটা জানা কথা। এর মধ্যে আর বিশেষ কি কথা? এটা কি করে সম্ভব হতে পারে যে, মানুষ যাকে সবচেয়ে বেশী ভালোবাসবে আবার তারই সাথে মন্দ আচরণ করবে এবং তার সাথে দুশমনি করবে? মন্দ ও দুশমনি করা তো দূরের কথা, মানুষ তার প্রিয়জনের জন্যে নিজের জান- মাল, এমন কি নিজেকেও উৎসর্গ করে দিতে প্রস্তুত থাকে।

পক্ষান্তরে সে এ বিষয়টি নিয়ে গভীর চিন্তা- ভাবনা করতে লাগলো। সে বার বার এ কথা ভাবতে বাধ্য হচ্ছে যে, তিনি এ কথাটি এমনিতেই লিখে দেননি। নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোন না কোন রহস্যঘন কথা রয়েছে। এ কথাটি কোন সাধারণ মানুষ লিখেনি। কথাটি লিখেছেন মহানবী (সাঃ)- এর একজন প্রিয়তম সাহাবী জনাব আবু যার গিফারী। যার উপাধি হচ্ছে এ উম্মতের

লোকমান। যার জ্ঞান- গরিমা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশও নেই। সে যা হোক, এ কথাটির উদ্দেশ্য লোকটি বুঝতে পারলো না।

অবশেষে সে এ কথাটির ব্যাখ্যা চেয়ে আবার জনাব আবু যারের কাছে পত্র লিখলো।

জবাবে হযরত আবু যার লিখলেন, আমার দৃষ্টিতে তোমার সব চেয়ে প্রিয়তম বন্ধু তুমি নিজেই। আমার মতে তুমি ছাড়া অন্য কেউ তোমার এত নিকটতম নেই। তুমিই তোমাকে আর সব মানুষের চাইতে অধিক ভালোবাসো। আর আমি যে লিখেছি, তুমি তোমার সব চাইতে প্রিয় বন্ধুর সাথে মন্দ ও দুশমনি করো না। এর অর্থ হলো তুমি তোমার নিজের সাথে মন্দ ও দুশমনি করো না। তুমি হয়তো জানো না যে, মানুষ যখন গুনাহ ও পাপের কাজ করে, তখন সে তার সেগুলোর কারণে নিজেকেই নিজে ক্ষতিগ্রস্ত করে থাকে। আর গুনাহের কাজ করে সে নিজেই নিজের দুশমনিতে লিপ্ত হয়ে থাকে।[৫৩]

৪৩

অনির্দিষ্ট পারিশ্রমিক

সেদিন সোলাইমান ইবনে জা'ফর জা'ফরী ও হযরত ইমাম আলী রেজা (আঃ) কোনো কাজে একত্রে বের হয়েছিলেন। সারাদিন কাজ করতে করতে সূর্যাস্তহয়ে গেল। সুলাইমান ইবনে জা'ফর বাড়ী যেতে চাইলো। ইমাম আলী ইবনে মূসা আর রেজা (আঃ) তাকে বললেন, হে জা'ফর! আজ রাত তুমি আমার এখানেই থেকে যাও। জা'ফর ইমামের নির্দেশ মেনে তাঁর বাড়িতে তাঁর সাথেই থেকে গেল।

বাড়িতে পৌঁছে ইমাম দেখতে পেলেন সকল গোলামই ফুল লাগানোর কাজে লিপ্ত আছে। সে সময় ইমাম দেখতে পেলেন আরো একটি অচেনা লোক তাদের সাথে কাজ করছে। ইমাম জিজ্ঞাসা করলেন, এ লোকটি কে?

জবাবে গোলামরা বললো, এ লোকটিকে আমরা আজ দিন মজুর হিসাবে আমাদের সাথে কাজে লাগিয়েছি যাতে করে সমস্তকাজ তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়।

ইমাম বললেন, বেশ ভালো কাজ করেছো। তার পারিশ্রমিক কত নির্ধারণ করেছো?

গোলামরা বললো, কাজের শেষে তাকে তার খুশি মোতাবেক কিছু দিয়ে দেবো। এ কথা শোনার পর ইমাম (আঃ)- এর চেহারায় অসন্তুষ্টি ও রাগের ছাপ পরিলক্ষিত হলো। তিনি খুব ক্রোধ ভরে গোলামদের দিকে তাকালেন। মনে হচ্ছিল যেন তাদেরকে বেত্রাঘাত করে উচিত শিক্ষা দিবেন। এ সময় সোলাইমান জা'ফরী সামনে এসে বললো, হে ইমাম! আপনি এভাবে রেগে গেলেন কেন?

ইমাম (আঃ) বললেন, আমি এদেরকে বার বার বলেছি যে, পারিশ্রমিক নির্ধারণ না করে কাউকে কাজে লাগিয়ো না। কাউকে কাজে লাগাতে হলে প্রথমে তার পারিশ্রমিক নির্দিষ্ট করা উচিত। তারপর তাকে কাজে লাগানো ঠিক হবে। কাজের শেষে নির্দিষ্ট মজুরীর চাইতে কিছুটা বেশী দিলেও দোষ নেই। নির্ধারিত মজুরীর চেয়ে কিছুটা বেশী পেলে সে তোমার নিকট কৃতজ্ঞ ও সন্তুষ্ট থাকবে এবং তোমাকে ভালোবাসবে, তোমার সাথে ও তার সাথে একটা সুসম্পর্ক

থাকবে,   আর যদি শুধু নির্দিষ্ট মজুরীও দেয়া হয় তাতেও সে অসন্তুষ্ট হবে না। কিন্তু যদি মজুরী নির্ধারণ না করে কাউকে কাজে লাগাও তাহলে কাজের শেষে তুমি তাকে যতোই বেশী পারিশ্রমিক দাও না কেন সে কখনো এ কথা ভাববে না যে,   তুমি তার সাথে ভালোবাসার পরিচয় দিয়েছ, বরং সে মনে করবে যে,   তাকে মজুরী কম দেয়া হয়েছে।[৫৪]

৪৪

স্বাধীন নাকি দাস?

একটি বাড়ী থেকে নাচগানের আওয়াজ আসছিল। ঘরের পাশ দিয়ে চলাচলকারী কারো জন্যে বুঝতে দেরী হচ্ছিল না যে, বাড়ীর ভেতর কি হচ্ছে? শরাব- কাবাব ও আনন্দ- উলাসে অনুষ্ঠান সরগরম। শরাবের পেয়ালা পরস্পরের সাথে টক্কর খাচ্ছিল। এ বাড়ীর এক চাকরানী ময়লা ইত্যাদি ফেলার জন্য বাইরে এসেছিল। এমন সময় এক ব্যক্তি যার চেহারায় ইবাদত- বন্দেগীর নিদর্শন প্রতিভাত হচ্ছিল এবং তার ললাট এ কথার সাক্ষ্য দিচ্ছিল যে, নিশ্চয়ই লোকটি রাত জেগে ইবাদতকারী। তিনি এ বাড়ীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। চাকরানীটিকে বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। চাকরানীটি যখন তার কাছে এলো তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ বাড়ির মালিক স্বাধীন নাকি দাস?

চাকরানী বললো, স্বাধীন।

পথিক বললেন, জানি সে স্বাধীন। যদি সে দাস হতো তাহলে নিশ্চয়ই সে তার প্রভু মহান আল্লাহর নাফরমানী করে এ ধরনের অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করতো না।

এভাবে চাকরানী ও পরহেযগার লোকটির মধ্যে কথাবার্তা হতে হতে চাকরানীটির বাড়ী ফিরতে খানিকটা দেরী হলো। চাকরানীটি ফিরে আসার সাথে সাথে তার মালিক তাকে জিজ্ঞাসা করলো, এত দেরী করলে কেন? চাকরানীটি সমস্তঘটনা খুলে বললো, একজন লোক এসেছিলেন, যার চেহারা ছুরতে মনে হচ্ছিল খুবই মোত্তাকী পরহেযগার। আমাদের বাড়ীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি আমাকে এ প্রশ্ন করেছেন। আমি তাকে এ জবাব দিয়েছি। অতঃপর তিনি এ কথা বলে চলে গেলেন। আর আমি ঘরে ফিরে এলাম।

চাকরানীর এ কথা শুনে লোকটি কিছুক্ষণ চিন্তায় ডুবে গেল। বিশেষ করে তার এ বাক্যটি সম্পর্কে যে, যদি দাস হতো তাহলে তার প্রভুকে পরোয়া করে চলতো। কথাটি তার অন্তরে তীরের মতো বিঁধলো। তৎক্ষণাত উঠে দাড়ালো। আর জুতো জোড়া পায়ে দেবার অবকাশটুকু না দিয়ে সে

মোত্তাকী ব্যক্তির পিছনে দৌঁড়াতে লাগলো। অবশেষে সে ব্যক্তির নিকট পৌঁছলো। পৌঁছে দেখলো তিনি আর কেউ নন, বরং সপ্তম ইমাম হযরত মূসা ইবনে জা'ফর (আঃ)। সে ইমামের সামনে তওবা করলো। যেহেতু তওবা করার সময় সে খালি পায়ে ছিল তাই সে আর কোনদিন জুতা পরেনি। সারা জীবন খালি পায়ে চলাফেরা করতো। তওবা করার পূর্বে সে বশীর ইবনে হারেছ বিন আবদুর রহমান মারুযী নামে খ্যাত ছিল, কিন্তু এরপর থেকে সারা জীবন আল- হাফী অর্থাৎ খালি পা- ওয়ালা উপাধিতে ডাকা হতো। পরে সে বুশর হাফী নামে খ্যাত হয়ে গেল। এরপর সে যতদিন বেঁচে ছিল ততদিন তার কৃত অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতির উপর দৃঢ় ছিল। অত্যন্ত আনুগত্য পরায়ণতার প্রমাণ দিয়ে কখনোও গুনাহের কাজের কাছেও যায়নি। আগে সে এলাকার ধনী ও নামযাদা লোকদের মধ্যে পরিগণিত হতো, কিন্তু শেষ জীবনে খোদাভীরু- মোত্তাকী- পরহেযগার লোকদের অন্তর্ভুক্ত হলো।[৫৫]

৪৫

মীকাতে

মালেক ইবনে আনাস মদীনার বিখ্যাত ফকীহ ইসলামী আইনজ্ঞ ছিলেন। এক বছর হজ্বের সময় তিনি ইমাম জা'ফর সাদিক (আঃ)- এর সঙ্গী হন। তারা মীকাতে পৌঁছলেন। এহরামের পোশাক পরিধান করা ও তালবিয়াহ অর্থাৎ লাব্বাইকা আলাহুম্মা লাব্বাইক যিকির পাঠ করার সময় যখন এলো তখন অন্য হাজীগণ সাধারণ নিয়ম মোতাবেক এ যিকিরটি নিজের নিজের মুখে পাঠ করছিল। এদিকে মালেক ইবনে আনাস ইমাম জা'ফর সাদিক (আঃ)- এর দিকে লক্ষ্য করে দেখলেন যে, ইমামের অবস্থা একেবারে বেহাল দশা। তিনি যখনই সে যিকিরটি নিজের মুখে উচ্চারণ করতে যান তখনই তিনি উৎকণ্ঠা গ্রস্ত হয়ে পড়েন। আর তাতে তার স্বর কণ্ঠনালীতে আটকে যাচ্ছিল। স্বীয় স্নায়ু শক্তিকে এমনভাবে হারিয়ে ফেলেন যে, নিজের অঙ্গ- প্রত্যঙ্গগুলো নিজের নিয়ন্ত্রণে থাকতো না। এমন কি নিজেকে বাহনের উপর ধরে রাখাটাই ছিল তাঁর জন্য দুস্কর। তাঁর শরীরে এমন একটা কম্পন সৃষ্টি হতো, মনে হয় তিনি বাহনের পৃষ্ঠ থেকে পড়ে যাবেন। এ অবস্থা দেখে মালেক ইবনে আনাস ইমাম জাফর সাদিক (আঃ)- এর সামনে আসলেন এবং বললেন, হে রাসূলের (সাঃ) সন্তান! যেভাবেই সম্ভব হোক সে যিকিরটি উচ্চারণ করার চেষ্টা করুন। এ ছাড়াতো আর কোন উপায় নেই।

ইমাম (আঃ) বললেন, হে আবী আমেরের ছেলে! এ দুঃসাহস আমি কিভাবে করবো? লাব্বাইক বলার হিম্মত আমি কোথায় পাবো? লাব্বাইক বলার অর্থ হচ্ছে, হে আমার পরোয়ারদিগার! তুমি যে উদ্দেশ্যে আমাকে ডেকেছো, আমি তা পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করে নেবার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। সর্বদা তোমার আনুগত্য করার জন্য এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছি! আমি কি করে আমার প্রভুর সামনে এমন ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করবো? নিজেকে একজন সদা প্রস্তুত গোলাম হিসাবে পেশ করবো কিরূপে? যদি আমার ডাকে তিনি উত্তর দেন যে, 'লা- লাব্বাইক' অর্থাৎ তোমার আমি গ্রহণ করলাম না। তখন আমি কি করবো?[৫৬]

৪৬

খেজুর গাছের বোঝা

হযরত আলী ইবনে আবী তালিব (আঃ) বাড়ি থেকে বের হয়ে অন্যান্য দিনের মতো মরুর মধ্যে সে সব বাগানের দিকে চললেন যে সব জায়গায় তিনি কাজ করে অভ্যস্ত। তাঁর সাথে একটি বোঝাও ছিল। পথে এক লোক তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো, হে আলী! আপনার সাথে কি? জবাবে আলী (আঃ) বললেন, ইনশাআল্লাহ! খুরমা গাছ।

লোকটি আশ্চর্য হয়ে বললো, খুরমা গাছ? তার কথার ভঙ্গিতে বোঝা যাচ্ছিল যে, সে হযরত আলীর কথার অর্থ বুঝতে পারেনি। (অর্থাৎ খুরমা গাছ তো বেশ বড়। সে তো আর একটা ছোটখাটো বোঝা হতে পারে না।)

সে লোকটির আশ্চর্য বোধ তখন বিদূরিত হলো, যখন কিছুদিন পর সে ও তার বন্ধুরা দেখতে পেলো যে, সেদিন হযরত আলী খুরমার যে বীচিগুলো সাথে করে নিয়ে গিয়েছিলেন আর তিনি আশা পোষণ করেছিলেন যে, খুব শীঘ্রই এগুলো প্রকাণ্ড বৃক্ষে পরিণত হবে, সত্যিই সেগুলো আজ এক সবুজ- শ্যামল খুরমার বাগানের রূপ ধারণ করেছে। হযরত আলী (আঃ) সেদিন যে খুরমার বীচিগুলো রোপণ করেছিলেন সেগুলো আজ বেশ মোটা তাজা ও সুন্দর বৃক্ষের আকার ধারণ করেছে।[৫৭]

৪৭

মেহনতের ঘাম

ইমাম মূসা কাজেম (আঃ) নিজের ক্ষেতে কাজ করছিলেন। অত্যাধিক পরিশ্রমের কারণে তাঁর সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে গিয়েছিল। এমন সময় আলী ইবনে আবী হামযা নামক এক ব্যক্তি ইমামের কাছে এসে বললো, আপনার জন্য আমার জীবন উৎসর্গিত হোক! আপনি এ কাজটি অন্য লোকের ওপর ন্যস্তকরেন না কেন?

ইমাম (আঃ) বললেন, আমি আমার এ কাজ অন্যকে দিয়ে করাবো কেন? আমার চেয়ে উত্তম লোকেরা সব সময় এ জাতীয় কাজ নিজেরাই আঞ্জাম দিয়েছেন।

ইবনে হামযা বললো, সে সকল লোক কারা?

ইমাম (আঃ) বললেন, রাসূলে আকরাম (সাঃ), আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (আঃ) এবং আমাদের বাপ- দাদা পূর্ব- পুরুষদের সকলেই এ জাতীয় কাজকর্ম নিজেরাই আঞ্জাম দিয়েছেন। মূলত ক্ষেতে খামারে কাজ করা আল্লাহর নবী- রাসূল, তাদের প্রতিনিধি, উত্তরসূরী ও আল্লাহর সুযোগ্য বান্দাদের সুন্নত।[৫৮]

৪৮

বন্ধুত্বের চির অবসান

কেউ কোনদিন চিন্তাও করতে পারেনি যে, এ বন্ধুত্বের বিচ্ছেদ ঘটবে। তারা দু'জন এমন বন্ধু ছিলেন যে, পরস্পর একে অপরের ছায়াসঙ্গী ছিলেন। তারাই আজ একে অপর থেকে আলাদা হয়ে গেছেন। কখনও তারা একে অপরকে ছেড়ে থাকতে পারতেন না। অবস্থা এমন ছিল যে, লোকেরা তাদের আসল নাম না জেনে বরং তার বন্ধু বলে জানতো। লোকেরা যখন তাদের কথা বলতো তখন প্রায়ই তাদের আসল নামের পরিবর্তে বলতো, রফিক অর্থাৎ বন্ধু।

জ্বী হ্যাঁ! লোকটি হযরত ইমাম জা'ফর সাদিক (আঃ)- এর বন্ধু হিসাবে খ্যাত ও পরিচিত ছিল। কিন্তু সেদিনও তারা অন্যান্য দিনের মতো একে- অপরের সাথেই ছিলেন। তারা উভয়ে এক সাথে একটি জুতা তৈরির দোকানে গেলেন। কেউ কি একথা বিশ্বাস করতে পারে যে, এমন গভীর বন্ধুত্বঘন সমপর্কের লোকেরা বাজার থেকে বের হবার পর পরস্পর থেকে চিরদিনের জন্য বিচ্ছেদ হয়ে যাবেন?

সেদিনও সে বরাবরের ন্যায় ইমাম সাদিক (অঃ)- এর সাথে ছিল। তারা উভয়ে বাজারে প্রবেশ করলেন। তার সাথে তার কৃষাঙ্গ গোলামও ছিল। গোলাম তার মালিকের পিছে পিছে চলছিল। কিছু দূর চলার পর পেছনে ফিরে সে তাকিয়ে দেখে তার গোলাম নেই। আরও একটু সামনে চলার পর পিছনে ফিরে দেখলো গোলামকে দেখা যায় না। কিছুক্ষণ পর আবার মুখ ঘুরিয়ে দেখলো কিন্তু গোলামের হদীস নেই। মনে হচ্ছিল সে বাজারের খেল- তামাশা দেখার মধ্যে লিপ্ত হয়ে গেছে। আর তার মালিক ও মালিকের সাথীগণ অনেক আগে চলে গেছে। চতুর্থবার পিছনে ফিরে দেখে যে তার গোলাম হাজির। গোলামকে দেখেই সে ক্রোধে আক্রোশে বলে উঠলো :

'হারামযাদা! এতক্ষণ কোথায় চলে গিয়েছিলি'?

বন্ধুর মুখ থেকে এমন অশ্রাব্য কথাটি শুনে ইমাম জা'ফর সাদিক (আঃ) আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলেন। ইমাম নিজের ললাটে হাত মেরে বললেন, সুবহানালাহ! তুমি তার মাকে গালি দিলে? তুমি তার

মাকে অবৈধ কর্মের সাথে সম্পৃক্ত করলে? আমি তো এতদিন ভেবেছিলাম যে, তুমি একজন মোত্তাকী- পরহেযগার লোক। কিন্তু আজ তোমার প্রকৃত রূপ সামনে এসে গেছে। দেখা যাচ্ছে তোমার মধ্যে তাকওয়া পরহেযগারীর নাম- নিশানাও নেই।

বন্ধু বললো, হে রাসূলের (সাঃ) সন্তান! এ গোলামটি আসলে সিন্ধী। তার মাতাও সিন্ধী। আপনি তো জানেন যে, তারা মুসলমান নয়। আর গোলামের মা কোন মুসলমান নারী নয় যে, আমি তার উপর অবৈধ কাজের অপবাদ লাগিয়ে দিয়েছি।

ইমাম (আঃ) বললেন, তার মাতা কাফের ছিল একশ বার থাকুক। প্রত্যেক জাতির মধ্যেই বিয়ে শাদীর একটা নিয়ম- কানুন ও বিশেষ প্রথা বর্তমান থাকে। যদি কোন জাতির লোক তার জাতীয় নিয়ম- নীত ও পন্থা অনুসরণ করে বিয়ে- শাদী করে, তাহলে তাদের স্বামী- স্ত্রীর সম্পর্ক কোনদিন অবৈধ সম্পর্ক হবে না। আর তাদের সন্তানদেরকে হারামযাদা বা অবৈধ সন্তান হিসাবে গণ্য করা যাবে না।

ইমাম (আঃ) তাকে আরো বললেন, তুমি এ মুহূর্তে আমার কাছ থেকে দূরে চলে যাও। আর কোনদিন আমার কাছেও আসবে না।

সেদিন থেকে কেউ হযরত ইমাম জা'ফর সাদিক (আঃ)- কে আর কোনদিন ঐ লোকটির সাথে চলতে দেখেনি। আজীবন তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘরে গেল।[৫৯]

৪৯

একটি গালি

ইরানের প্রখ্যাত লেখক ও পন্ডিত আব্দুল্লাহ ইবনে মুকান্না। তার গোলাম নিজের মালিকের ঘোড়ার লাগাম ধরে বসরার গভর্ণর সুফিয়ান ইবনে মুআবিয়া মাহলাবীর দরবারের সামনে বসেছিল। সে অপেক্ষায় ছিল তার মালিক কাজ সেরে দরবার থেকে বেরিয়ে আসবে ও ঘোড়ায় চড়ে নিজের বাড়ি ফিরবে।

সে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করলো। কিন্তু ইবনে মুকান্নার বেরিয়ে আসার নাম নেই। অন্য লোকেরা যারা ইবনে মুকান্নার পরে গভর্ণরের দরবারে ঢুকেছে তারা সকলেই বেরিয়ে আসলো। কিন্তু ইবনে মুকান্নার কোন খবরও নেই। দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করার পর সে লোকদের কাছে জিজ্ঞাসা করতে লাগলো। সকলেই না জানার কথা বলে নিজ নিজ পথে এগিয়ে যেতে থাকলো। গোলামের অস্থিরতা বেড়েই চললো। তাই সে গভর্ণরে দরবার থেকে বের হয়ে আসা সকল লোকদের কাছে স্বীয় মালিকের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা শুরুকরলো। কেউ কেউ এ কথা বলে চলে যাচ্ছিল যে, আমি জানি না। অনেকে আবার গোলামের প্রশ্ন শুনে বিরক্তি ও বিরাগ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে চলে যাচ্ছিল।

এভাবে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলো। অবশেষে গোলাম অধৈর্য ও নিরাশ হয়ে ঈসা ও সুলাইমানের নিকট গিয়ে হাজির হলো। ঈসা ও সুলাইমান ছিল আলী ইবনে আব্দুল্লাহ বিন আব্বাসের পুত্রদ্বয় এবং খলিফা মুকতাদির মনসুর দেওয়ানিকীর চাচাদ্বয়। ইবনে মুকান্না তাদের মুন্সী ও লেখক ছিল। গোলাম তাদের কাছে সমস্তঘটনা খুলে বললো।

ঈসা ওলসা ইমান, আব্দুল্লাহ ইবনে মকান্নার মতো উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন বিজ্ঞ লেখক ও দক্ষ অনুবাদকের প্রতি ছিল খুব শ্রদ্ধাশীল। তারা তার পৃষ্ঠপোষকও ছিল। এদিকে ইবনে মুকান্নাও তাদের সমর্থনপুষ্ট হয়ে দাপটের সাথে চলতো। প্রকৃতিগতভাবেই সে ছিল একজন কর্কশভাষী ও বেপরোয়া লোক। অন্যকে কথার তীর দ্বারা ঘায়েল করার ব্যাপারে সে কুণ্ঠিত হতো না।

ক্ষমতাসীন খলিফার চাচা ঈসা ও সুলাইমানের পৃষ্ঠপোষকতা তাকে আরো অধিক কর্কশ ও খরখরে বানিয়ে তুলেছিল । যা হোক ঈসা ও সুলাইমান বসরার গভর্ণর সুফিয়ান ইবনে মুআবিয়ার কাছে ইবনে মুকান্নাকে তলব করলো। জবাবে গভর্ণর বললো, ইবনে মুকান্নার ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। সে আমার বাড়িতে আসেওনি। কিন্তু অনেক লোকই তাকে গভর্ণরে বাড়িতে প্রবেশ করতে দেখেছে। সুতরাং প্রত্যক্ষদর্শীদের নিজের চোখে দেখা সাক্ষ্য প্রদানের পর গভর্ণরের আর এ অবকাশ রইলো না যে, সে এ সত্যটিকে অস্বীকার করতে পারে।

এটা একটা সাধারণ ব্যাপার ছিল না, বরং এটা ছিল একটা হত্যাকাণ্ড। তাও ইবনে মকান্নার মতো খ্যাতনামা ব্যক্তিত্বের হত্যাকাণ্ড। নিঃসন্দেহে এটি একটি মারাত্মক ও গুরুতর ব্যাপার ছিল। শুধু তাই নয়, বরং এ ব্যাপারে একদিকে ছিল বসরার গভর্ণর। আর অপর দিকে ছিল ক্ষমতাসীন খলিফার চাচা। অবশেষে বাধ্য হয়ে ঘটনাটি বাগদাদে খলিফার দরবারে নিতে হলো। খলিফা উভয়পক্ষের সাক্ষ্য ও সাফাই পেশ করার জন্য লোকদেরকে তার দরবারে ডেকে পাঠালো। মামলাটি খলিফার দরবারে দায়ের করা হলো। অতঃপর সাক্ষীরা সব একে একে এসে খলিফার সামনে নিজেদের জবানবন্দী দিল। এরপর খলিফা মনসুর নিজের চাচাকে লক্ষ্য করে বললো, আমার জন্য এতে কোনো বাধা নেই যে, সুফিয়ানকে ইবনে মুকান্নার হত্যার অপরাধে কতল করবো। কিন্তু আপনাদের দুইজনের মধ্যে থেকে কে প্রস্তুত আছেন যে, এর দায়-দায়িত্ব নিবেন? অর্থাৎ সুফিয়ানের কতল করে দেয়ার পরে যদি ইবনে মুকান্না জীবিত ও সুস্থভাবে দরবারে এসে হাজির হয় তাহলে তাকে সুফিয়ানের হত্যার বদলে কিসাস করব? এমনও হতে পারে যে, ইবনে মুকান্না জীবিত রয়েছে এবং আমার পিছনের দরজা দিয়ে দরবারে এসে হাজির হবে।

ঈসা ও সুলাইমান খলিফার এ প্রশ্নের জবাবে কিছুই বলতে পারলো না। অবাক হয়ে নিজেদের স্থানেই চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলো। তারা মনে করলো যে, খুবই সম্ভাবনা রয়েছে যে, ইবনে মুকান্না জীবিত আছে। সুফিয়ান তাকে জীবিত অবস্থায়ই খলিফার দরবারে পাঠিয়ে দিয়েছে। অবশেষে তারা বাধ্য হয়ে তাদের মামলা প্রত্যাহার করে নিল এবং নিজের বাড়িতে চলে গেল।

অনেক দিন অতিবাহিত হয়ে গেল কিন্তু ইবনে মুকান্না্র কোনই সংবাদ পাওয়া গেল না। ধীরে ধীরে তার কথা ভুলে যেতে লাগলো।

দীর্ঘকাল পরে একদিন এ ঘটনার জট খুললো। জানা গেল যে, ইবনে মুকান্না সব সময় তার কথা দ্বারা সুফিয়ান ইবনে মুআবিয়াকে নানা রকম আঘাত দিয়েছে। শুধু তাই নয় বরং একদিন ইবনে মুকান্না অনেক অনেক লোকের সামনে সুফিয়ান ইবনে মুআবিয়াকে তার মা তুলে গালি দিয়েছে। তারপর থেকে সে সব সময় এ সুযোগের অপেক্ষা করছিল যে, সে ইবনে মুকান্নার গালির কথার প্রতিশোধ নেবে। কিন্তু সে খলিফার চাচা ঈসা ও সুলাইমানের ভয়ে তার বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নিচ্ছিল না। এ অবস্থায় ঘটনাটির অবতারণা ঘটলো :

ঘটনাটি ছিল এই, সিদ্ধান্তহলো যে, খলিফা মনসুরের অপর এক চাচা আব্দুল্লাহ ইবনে আলীর নামে নিরাপত্তা পত্র লেখা হবে এবং তা খলিফা মনসুরের কাছে পেশ করে এ নিরাপত্তা নামায় দস্তখত করার জন্য দাবি করা হবে। আব্দুল্লাহ ইবনে আলী তার ভাই ঈসা ও সুলাইমানের লেখক ইবনে মুকান্নার কাছে নিবেদন করলো যে, একটি নিরাপত্তানামা তৈরি করে দিতে হবে। ইবনে মুকান্না তার আবেদন গ্রহণ করলো এবং নিরাপত্তানামা তৈরি করলো। এ নিরাপত্তানামায় সে মনসুরের প্রতি নানা অশীল ও উদ্ধৃত ভাষা উল্লেখ করে। মনসুর এ নিরাপত্তা পত্রটি পাঠ করে সাংঘাতিকভাবে অসন্তুষ্ট হলো। সে জিজ্ঞাসা করলো, এ নিরাপত্তানামার মুসাবিদা কে তৈরি করেছে? লোকেরা বললো, এ মুসাবিদা ইবনে মুকান্নার তৈরি। এরপর খলিফা মনসুরের অন্তরেও ইবনে মুকান্নার বিরুদ্ধে একটা ক্ষোভ সৃষ্টি হলো। যেমনটি ছিল বসরার গভর্ণর সুফিয়ান ইবনে মুআবিয়ার অন্তরে।

খলিফা মনসুর গভর্ণর সুফিয়ানকে গোপনে চিঠি লিখে পাঠালো ইবনে মুকান্নার খবর নিতে। সুতরাং সুফিয়ান সুযোগের সন্ধান করতে লাগলো। এভাবে একদিন ইবনে মুকান্না কোন এক প্রয়োজনে সুফিয়ানের বাড়ি পৌঁছলো। সে তার ঘোড়া ও গোলামকে গভর্নরের বাড়ির সামনেই রেখে এসে ছিল। ঘরের ভেতর প্রবেশ করে দেখলো সুফিয়ান তার এক জল্লাদ প্রকৃতির গোলামকে নিয়ে এক কামরায় বসে আছে। আর তাদের সামনেই প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডলী। ইবনে

মুকান্নাকে দেখেই সুফিয়ানের অন্তরে হিংসা- বিদ্বেষের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। সে ইবনে মুকান্নাকে জিজ্ঞাসা করলো, তোমার মনে আছে যে, তুমি অমুক দিন আমার মাকে তুলে গালি দিয়েছিলে? এখন তার প্রতিশোধ নেবার সময় এসেছে। ইবনে মুকান্না ক্ষমা চাইলো। কিন্তু কোন ফল হলো না, বরং অত্যন্ত নির্মমভাবে তাকে হত্যা করা হলো।[৬০]

৫০

বাক্যবাণ

আলী ইবনে আব্বাস পরিচিত ছিলেন ইবনে রুমী নামে। তিনি ছিলেন তৃতীয় হিজরী শতাব্দীর মাঝামাঝি আব্বাসীয় খেলাফতকালে একজন বিখ্যাত প্রশংসা ও ব্যঙ্গ ভাষী কবি। একদিন তিনি কাসেম ইবনে আব্দুল্লাহ আল মু'তাজিদ আব্বাসী নামক মন্ত্রীর দরবারে বসে ছিলেন। তিনি তার বাক্যবাণ ও যুক্তিপূর্ণ বিশেষ বর্ণনা শক্তির ওপর সব সময় অহংকার বোধ করতেন। মু'তাজিদ আব্বাসী তার বাক্যবাণ থেকে ভীতসন্ত্রস্তও অতিষ্ঠ ছিল। কিন্তু নিজের অসন্তুষ্টি ও তিক্ততা প্রকাশ করতো না বরং এর বিপরীতে অত্যন্ত সদ্ব্যবহার করতো। তার বাক্যবাণে আঘাত প্রাপ্ত হয়েও সে তার ভালো ব্যবহার ও খোশ আখলাক প্রদর্শনে কমতি করতো না বরং তার সাথে ওঠাবসা ও আলাপ- আলোচনা পরিত্যাগ করতো না। একবার কাসেম আল- মু'তাজিদ আব্বাসী তার লোকদেরকে হুকুম দিল যে, ইবনে রুমীর খাবারের সাথে বিষ মিশিয়ে দেয়া হোক। খাবার খাওয়ার সাথে সাথেই ইবনে রুমী ব্যাপারটি টের পেয়ে গেলেন। অতঃপর তিনি নিজের স্থান থেকে উঠে চলে যাচ্ছিলেন। কাসেম জিজ্ঞাসা করলো, কোথায় যাচ্ছো?

- ইবনে রুমী বললেন, সেখানেই যাচ্ছি যেখানে তুমি আমাকে পাঠিয়েছো।

- তাহলে আমার বাবা মার কাছে আমার সালাম পৌঁছে দিও।

- জেনে রেখো! আমি জাহান্নামের পথে যাবো না।

এ কথাগুলো বলতে বলতে ইবনে রুমী নিজের বাড়ির দিকে চলে গেলেন। বাড়ি গিয়ে বিষক্রিয়া নিরসনের জন্য চিকিৎসা শুরু করলেন। কিন্তু কোন ফল হলো না। অবশেষে তিনি বাক্যবাণের গুণ- বৈশিষ্ট্য সাথে নিয়েই এ দুনিয়া থেকে চিরবিদায় নিলেন।[৬১]

৫১

দুই সহযোগী

হিশাম ইবনে হাকাম ও আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ আবাযীর আন্তরিকতাপূর্ণ বন্ধুত্ব ও নজিরবিহীন সহযোগিতা প্রত্যক্ষ করে কুফাবাসীরা অবাক হতো। লোকেরা এ দই জনের বন্ধুত্বকে দৃষ্টান্তহিসাবে পেশ করতো। তারা দুইজনে মিলে সেলাই সামগ্রীর একটি দোকান খুলেছিলেন। দু'জনে মিলে মিশেই দোকান পরিচালনা করতেন। যতদিন তারা জীবিত ছিলেন কোনদিন তাদের মধ্যে কোনো মতবিরোধ বা ঝগড়া- বিবাদ হয়নি।

তাদের এ গভীর বন্ধুত্বের কথা লোক সমাজে ছড়িয়ে পড়ার ও সমাদৃত হওয়ার সাথে সাথে এ ব্যাপারটা সকলের আশ্চর্য দৃষ্টি আকর্ষণ করার আসল যে কারণ ছিল সেটা হলো- ধর্মীয় আকিদা- বিশ্বাসের দিক থেকে এরা দুজনেই ছিলেন একে অপরের সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা দু'জনেই নিজ নিজ মাযহাবের উজ্জ্বল নক্ষত্ররূপে পরিগণিত হতেন। তাদের মধ্যে হিশাম ছিলেন ইমামীয়া শিয়া মাযহাবের উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন একজন বিজ্ঞ আলেম। তিনি ছিলেন হযরত ইমাম জাফর সাদিক (আঃ)- এর একজন বিশেষ ঘনিষ্ঠ সাহাবী। পবিত্র আহলে বাইতের ইমামতে তার পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাস ছিল। কিন্তু আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ আবাযীয়া মতবাদের ওলামাদের অন্যতম বলে পরিগণিত। যেখানেই মাযহাবী আকীদা বিশ্বাসের প্রশ্ন দেখা দিত সেখানেই তারা একে অপরে বিপরীত মেরুতে দণ্ডায়মান হতেন। কিন্তু তারা তাদের মাযহাবী পক্ষপাতিত্বকে জীবনের অন্যান্য বিষয় থেকে পৃথক রাখতেন। আর অত্যন্ত ন্যায়- নীতিভিত্তিক সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে ব্যবসা- বাণিজ্যের কাজ- কর্মগুলো আঞ্জাম দিতেন। একটা আশ্চর্য ব্যাপার এ ছিল যে, জনাব হিশামের অধিকাংশ শিয়া বন্ধু- বান্ধব সে দোকানে আসা- যাওয়া করতো আর তিনি তাদেরকে শিয়া মাযহাবের মৌলিক আকীদাও মাসআলা- মাসায়েল শিক্ষা দিতেন। আব্দুল্লাহ স্বীয় মাযহাব বিরোধী আকীদা- বিশ্বাসের কথাবার্তা শুনেও অসন্তুষ্ট হতেন না। অনুরূপভাবে হিশামের চোখের সামনে আব্দুল্লাহ

তার বন্ধুদেরকে আবাযী মতবাদের শিক্ষা দিতেন যা শিয়া আকীদা মতের পরিপন্থী, কিন্তু হিশামের চেহারায় কখনও অসন্তুষ্টির ছাপ পরিলক্ষিত হয়নি।

একদিন আব্দুল্লাহ স্বীয় বন্ধু হিশামকে বললো, আমরা একজন আরেকজনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহযোগী শরিকদার। আমি চাই যে, তুমি আমাকে তোমার জামাই বানিয়ে নাও। তোমার মেয়ে ফাতেমাকে আমার সাথে বিয়ে দাও।

জনাব হিশাম জবাবে শুধু একটি কথাই বললেন, ফাতিমা মু'মিনাহ (ঈমানদার)।

আব্দুল্লাহ বন্ধুর এ জবাব শুনে চুপ হয়ে গেল। আর কোনদিন এ বিষয়ে কথাবাতা তোলেনি ।

এ ঘটনাও দুই বন্ধুর মধ্যে কোন ভাঙ্গন ধরাতে পারেনি। আগের মতোই তারা মিলে- মিশে ব্যবসা- বাণিজ্য চালিয়ে যেতে থাকেন। একমাত্র মৃত্যুই এমন একটি ব্যাপার ছিল যা এ বন্ধুদ্বয়কে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। তা না হলে মৃত্যুর পূর্ব মূহর্ত পর্যন্ত তারা একে অপরের থেকে অলাদা হননি এবং সারা জীবন এক সাথে কাজ- কর্ম করতে থাকেন।[৬২]

৫২

মদ্যপের হেদায়েত

আব্বাসীয় খলিফা মনসুরের নির্দেশে বাইতুলমালের দরজা খুলে দেয়া হলো। তা থেকে প্রত্যেককেই কিছু প্রদান করা হচ্ছিল। সাকরানী নামের এক লোকও বাইতুলমাল থেকে তার অংশ নেবার জন্যে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু তাকে কেউ চিনতো না। এ জন্য সে বাইতুলমাল থেকে তার অংশ নিতে পারছিল না। সাকরানীর পূর্ব- পুরুষদের মধ্যে এক ব্যক্তি কৃতদাস ছিল যাকে মহানবী (সাঃ) আযাদ করে দিয়েছিলেন। উত্তরাধিকারসূত্রে সেও আযাদ। লোকেরা তাকে মুওয়ালায়ে রাসূলাল্লাহ (সাঃ) অর্থাৎ রাসূলের আযাদকৃত হিসাবে জানতো। এটা সাকরানীর জন্য একটা গর্ব ও গৌরবের বিষয় ছিল, সে তার এ খ্যাতির কারণে নিজেকে রাসূলের (সাঃ) খানদানের সাথে সম্পর্কযুক্ত বলে প্রচার করতো।

যা হোক বাইতুলমাল থেকে নিজের অংশ পাওয়ার উদ্দেশ্যে সে এমন একজন লোকের সন্ধান করতে লাগলো- যে তাকে চিনে এবং এ কাজে তার সাহায্য এগিয়ে আসে। হঠাৎ সে দেখতে পেলো হযরত ইমাম জাফর সাদিক (আঃ) কে। সে ইমামের নিকট গিয়ে নিজের আবেদন জানালো। ইমাম সাথে সাথেই তার অংশ এনে তাকে দিয়ে দিলেন। ইমাম (আঃ) তাকে তার প্রাপ্য দেবার সময় অত্যন্ত স্নেহভরা কণ্ঠে বললেন, ভালো কাজ ভালোই। সেটা যে কেউ করুক না কেন! তোমাকে লোকেরা রাসূলের (সাঃ) বংশের সাথে সম্পর্কযুক্ত বলে জানে। এ জন্য তুমি যদি কোনো ভালো কাজ করো তাহলে তার সৌন্দর্য আরো বৃদ্ধি লাভ করে। অনরূপভাবে প্রতিটি মন্দ কাজই মন্দ। সেটা যে কেউ আঞ্জাম দিক না কেন। কিন্তু রাসূল বংশের সাথে সম্পর্কযুক্ত থাকার কারণে তুমি যদি কোনো মন্দ কাজ করো তাহলে তার মন্দত্ব আরো বড় করে দেখা দেয়। এ কথাটা বলেই ইমাম জাফর সাদিক (আঃ) সেখান থেকে চলে গেলেন।

ইমামের এ মায়াভরা কথাটি শুনে সাকরানীর বুঝতে দেরী হলো না যে, তার মদ পান করার গোপন ব্যাপারটি ইমাম অবগত হয়েছেন। ইমাম (আঃ) সব কিছু জেনেশুনেও তার সাথে এ

অসাধারণ ভালোবাসা ও সুন্দর আচরণ এ জন্য করেছেন যে, সাকরানীকে তার দোষের বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করানো যেতে পারে। ইমামের কথায় সাকরানী খুবই লজ্জিত হলো এবং এ ভুলের জন্য নিজেকে অনেক ধিক্কার দিতে থাকলো।[৬৩]

৫৩

খলিফার পোশাক

ওমর ইবনে আব্দুল আযীয তার খেলাফতকালে একদিন মিম্বারে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিচ্ছিলেন। তার বক্তৃতাদানকালে মিম্বারের নিকটে বসা লোকেরা দেখতে পেলো যে, তিনি বার বার নিজের জামার প্রান্তভাগ বাতাসে নাড়াচ্ছেন। এ দৃশ্য দেখে সমবেত লোকেরা অবাক হলো। তারা বুঝতে পারলো না যে, আসলে ব্যাপারটি কি? লোকেরা নিজে নিজে জিজ্ঞেস করছে, এর কারণ কি? খলিফা বক্তৃতা চলাকালে বার বার নিজের জামা বাতাসে নাড়াচ্ছেন?

কিছুক্ষণ পর খলিফার বক্তৃতা শেষ হলো। লোকেরা বাড়ি ফেরার আগে এর কারণ অনুসন্ধান করে জানতে পারলো যে, খলিফা মুসলমানদের বাইতুলমালের সংরক্ষণবশত এবং তার পূর্বসুরী খলীফাদের দ্বারা বাইতুল মালের অপচয় ও বিনষ্ট করার ফলে ক্ষতি পূরণ আদায় করার জন্য একটির বেশী জামা রাখতেন না। যেহেতু তার একমাত্র জামাটি কিছুক্ষণ পূর্বেই ধুয়ে দিয়েছিলেন, এটা ছাড়া পরিধান করার মতো আর কোন জামা ছিল না, তাই সে ভেজা জামাটি পরেই সভায় আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। এ জন্যই বক্তৃতা চলাকালে তিনি বার বার জামাটি বাতাসে নাড়াচ্ছিলেন যাতে করে জামাটি তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়।[৬৪].

৫৪

অস্থির যুবক

মহানবী (সাঃ) লোকদের সাথে মসজিদে ফজরে নামায আদায় করলেন। তখন সকাল কিছুটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। সে আলোতে লোকেরা একে অপরকে চিনতে পারছিল। এমন সময় রাসূলে আকরাম (সাঃ)- এর দৃষ্টি পড়লো এক যুবকের উপর যার অবস্থা ছিল অস্বাভাবিক। তার গর্দান ডানে- বামে ডগমগ করছিল। তিনি সে যুবকটির প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করে দেখছিলেন। দেখলেন তার চেহারা হলুদ বরণ ধারণ করেছে এবং তার চোখগুলো কুঠরীর মধ্যে ঢুকে গেছে। আর তার দেহ একেবারে হালকা- পাতলা ও দুর্বল হয়ে পড়েছে। এ অবস্থা দেখে রাসূলে আকরাম (সাঃ) সে অস্থির যুবকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কি অবস্থা?

সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমি ইয়াক্বীন- এর অবস্থায় রয়েছি। (ইয়াক্বীনের অবস্থা হচ্ছে আধ্যাত্মিক জগতে পরিভ্রমণ করে ঈমানের চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হওয়া)।

রাসূলে আকরাম (সাঃ) আবার জিজ্ঞাসা করলেন, প্রত্যেক ইয়াক্বীনের একটা নিদর্শন থাকে। তোমার ইয়াক্বীনের নিদর্শন কি?

জবাবে যুবকটি বললো, আমার ইয়াক্বীনের নির্দশনই তো আমাকে এ অবস্থায় এনে পৌঁছিয়েছে। এ কারণেই আমি সারারাত বিনিদ্রা কাটাই এবং সারাদিন পিপাসু অবস্থায় অতিবাহিত করি। আমি এ দুনিয়া থেকে ও দুনিয়ার সব কিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি এবং নিজেকে মহান আল্লাহর দিকে পরিপূর্ণরূপে নিবদ্ধ করে রেখেছি। আমার যেন মহান আল্লাহর আরশকে হিসাব- কিতাবের মনযিলে দেখছি। অনুরূপভাবে সমস্ত মানুষের পরিণতি প্রত্যক্ষ করছি নিজের চোখে। আমি দেখতে পাচ্ছি বেহেশতবাসীরা নেয়ামতের মধ্যে ডুবে আছেন। আর জাহান্নামীরা কঠিন শাস্তির মধ্যে নিমজ্জিত। আমি অনুভব করছি যে, দোযখের দাউ দাউ করে জ্বলা আগুনের বিকট শব্দ আমার কানে আসছে।

আল্লাহর নবী (সাঃ) লোকদের উদ্দেশে বললেন, এ যুবকটি আল্লাহর সে খাঁটি বান্দা, যার অন্তর মহান আল্লাহ ঈমানের নূর দ্বারা আলোকিত করে দিয়েছেন। এরপর তিনি সে যুবকটিকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তুমি তোমার এ পূণ্যময় অবস্থায় স্থায়ী থাকার চেষ্টা অব্যাহত রাখবে।

যুবকটি মহানবী (সাঃ) এর কাছে নিবেদন করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমার জন্য দোয়া করুন যেন মহান আল্লাহ আমাকে জেহাদে শরীক হবার এবং শাহাদতের সৌভাগ্য লাভ করার তওফিক দান করেন। রাসূল (সাঃ) তার জন্য দোয়া করলেন। এর কিছুদিন পরই জেহাদের সুযোগ এলো। যুদ্ধে এ যুবকটিও অংশগ্রহণ করলো। অবশেষে সেই যুদ্ধে শাহাদত বরণকারী দশজনের মধ্যে যুবকটি ছিল অন্যতম একজন।[৬৫]

৫৫

হাবাশার মোহাজিরগণ

মক্কা নগরীতে মুসলমানদের সংখ্যা প্রতি বছর প্রতি মাসে বেড়েই চলছিল। কাফের মুশরিকদের নানা রকম অত্যাচার- নিপীড়ন ইসলামে অনুপ্রাণিত লোকদেরকে ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হওয়া থেকে রুখতে পারছিল না। তারা সম্ভাব্য সব রকম চেষ্টা সাধনা করেছে লোকদেরকে ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করার জন্য। কিন্তু তাদের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। বরং বন্যার পাবনের মতো নারী- পুরুষ নির্বিশেষে সর্বস্তরের লোক দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে চলছিল। চরম জুলুম- নির্যাতনও তাদেরকে ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি। দিনের পর দিন ইসলামের এ ক্রমোন্নতি কোরাইশ কাফেরদের নিকট একেবারে অসহ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ইসলামের এ অসাধারণ জনপ্রিয়তায় তাদের অসন্তুষ্টি ও ক্ষোভ ক্রমেই বেড়ে চলছিল। তাই তারা মুসলমানদের উপর তাদের নির্যাতন ও নিপীড়নের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল।

মুসলমানদের জীবন যাপন করা ছিল তখন এক কঠিন ব্যাপার। কিন্তু শত অত্যাচারের মুখে ধৈর্য ধারণ করে থাকা ব্যতীত আর কোন উপায় ছিল না তাদের সামনে। আল্লাহর নবী (সাঃ) কোরাইশ কাফেরদের নিপীড়ন থেকে মুসলমানদেরকে সাময়িকভাবে রক্ষা করার জন্য তাদের সামনে একটি প্রস্তাব রাখলেন। প্রস্তাবটি হলো এই যে, তারা আপাতত মক্কা থেকে হিজরত করে হাবাশা চলে যাবে। এ পর্যায়ে তিনি তাদেরকে বললেন, হাবাশার বাদশা একজন ন্যায়পরায়ণ লোক। কাজেই তোমরা তার রাজ্যে কিছুদিন পর্যন্তনিরাপদ ও নিশ্চিতভাবে বসবাস করতে পারো। আল্লাহ চাহেন তো খুব শীঘ্রই সমস্ত মুসলমানের জন্য পরিবেশ অনুকূলে চলে আসবে।

অবশেষে অনেক মুসলমানই মক্কা থেকে হিজরত করে হাবাশার দিকে চলে গেলেন। সেখানে তারা খুব আরামে নিশ্চিন্তভাবে দিন যাপন করতে লাগলেন। মক্কায় তারা ধর্মীয় কাজ- কর্মগুলো

স্বাধীনভাবে আদায় করতে পারছিলেন না। কিন্তু হাবাশায় তাদের সব রকমের স্বাধীনতা ছিল। তাই তারা মুক্তভাবে ইসলামের করণীয় কাজগুলো আঞ্জাম দিতে থাকলেন।

কিছুদিন পরেই মক্কার কোরাইশ কাফেররা সংবাদ পেলো যে, মক্কা থেকে হিজরত করে গিয়ে মুসলমানরা হাবাশায় খুব আরামে জীবন যাপন করছেন। তারা চিন্তায় পড়ে গেল, আবার হাবাশায় ইসলামী বিপ্লব সাধিত না হয়ে যায়। তাই তারা সকলে মিলে পরামর্শ করলো যে, এমন একটি কৌশল বের করতে হবে যাতে করে সমস্ত মুসলমান মক্কায় ফিরে আসতে বাধ্য হয়। তারপর তাদেরকে আবার জুলুম-নির্যাতনের শিকারে পরিণত করা হবে। এ উদ্দেশ্যে তারা দুইজন চালাক ও বুদ্ধিমান লোক মনোনীত করলো। তাদের সাথে হাবাশার বাদশা নাজ্জাশীর জন্য বহু মূল্যবান উপহার-উপঢৌকন পাঠিয়ে দিল। যাতে করে তারা বাদশাহ ও তার সভাসদদের সাথে এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতে পারে। যাবার সময় তাদের দুইজনকে বলে দেয়া হলো যে, হাবাশা পৌঁছে সর্বপ্রথম সে সমস্ত প্রভাবশালী কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাত করবে, যাদের কথায় বাদশাহ প্রভাবান্বিত হন। কর্মকর্তাদেরকে উপহার সামগ্রী প্রদানের পর তাদেরকে বলবে যে, আমাদের দেশের কিছু অজ্ঞ- মুর্খ ও অনভিজ্ঞ যুবক নিজেদের ধর্ম ত্যাগ করেছে। আর তারা আপনাদের ধর্মও গ্রহণ করেনি। তারা নিজেদের দেশ ত্যাগ করে আপনাদের দেশে এসে আশ্রয় নিয়েছে। এখন আমাদের দেশের নেতা ও সরদারগণ আমাদেরকে আপনাদের খেদমতে পাঠিয়েছেন। আমাদের আবেদন হচ্ছে যে, আপনারা সে সব যুবককে আপনাদের দেশ থেকে বের করে দিন। তাদেরকে আমাদের হাতে তুলে দিন। অতএব আপনাদের নিকট বিনীত নিবেদন হচ্ছে যে, যখন আমরা এ ব্যাপারটি মহামান্য বাদশাহর নিকট উত্থাপন করবো তখন আপনারা আমাদের পক্ষে সুপারিশ।

অবশেষে কুরাইশদের দূতরা হাবাশায় পৌঁছে গেল এবং সর্বপ্রথম প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের সাথে সাক্ষাত করলো। তাদের খেদমতে মূল্যবান উপঢৌকন পেশ করার পর নিজেদের আবেদন-নিবেদন তুলে ধরলো। তারা সকলে প্রতিশ্রুতি দিল যে, তারা বাদশাহর সামনে এদের বক্তব্যের সমর্থন করবে।

তারপর একদিন তারা বাদশাহ নাজ্জাশীর দরবারে হাজির হলো। অতি উত্তম ও মূল্যবান উপঢৌকন পেশ করে তারা বাদশাহর কাছে নিজেদের আবেদন- নিবেদন তুলে ধরলো।

কথাবার্তা যেহেতু পূর্বেই চূড়ান্ত হয়েছিল। তাই রাজ দরবারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা সকলেই কোরাইশিদের প্রতিনিধিদের সহযোগিতা- সমর্থন দিতে লাগলো। তারা সকলেই সম্মিলিতভাবে বাদশাহকে পরামর্শ দিল যে, ঐ মুসলমানদেরকে বের করে দেয়ার নির্দেশ খুব তাড়াতাড়ি জারি করা উচিত এবং তাদেরকে কুরাইশ প্রতিনিধিবৃন্দের হাতে তুলে দেয়া উচিত।

কিন্তু বাদশাহ নাজ্জাশী সভাসদদের মতামতের সাথে মোটেও একমত হলেন না। তিনি বললেন, কিছু সংখ্যক লোক নিজের দেশ ত্যাগ করে আমাদের দেশে এসে আশ্রয় নিয়েছে। এটা কিছুতেই সমুচিত হবে না যে, আমি ব্যাপারটি তদন্ত না করে তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের বিরুদ্ধে হুকুম জারী করে পাঠাবো যে, তাদেরকে আমাদের দেশ থেকে বের করে দেয়া হোক। আমি অত্যন্ত জরুরী মনে করছি যে, তাদেরকে দরবারে ডাকা হোক। যাতে আমি তাদের বক্তব্য শুনতে পারি এবং তারপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি যে, তাদেরকে কি করা উচিত।

বাদশাহ নাজ্জাশীর সর্বশেষ কথাটি শুনেই কোরাইশ প্রতিনিধিদের চেহারার রং বদলে গেল এবং তাদের অন্তরের স্পন্দনও বেড়ে গেল। তারা চাচ্ছিল না যে, মুসলমানদেরকে বাদশাহর দরবারে কথাবার্তা বলার সুযোগ দেয়া হোক। তাই তারা শ্রেয় মনে করলো, মসলমানদেরকে চাই ফেরত না দেয়া হোক, কিন্তু তাদেরকে দরবারে আসার সুযোগ যেন দেয়া না হয়। কেননা এ নতুন মতবাদের মধ্যে যে সৌন্দর্য নিহিত আছে সেটা হলো তাদের কথাবার্তা ও আলাপ- আলোচনার সৌন্দর্য। মুহাম্মদ (সাঃ)- এর বক্তব্য হচ্ছে যে, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার উপর ওয়াহী বা প্রত্যাদেশ নাযিল হয়েছে। তারা যাদুমাখা কথাগুলোতে কি যে আকর্ষণ লুকায়িত রয়েছে? কে জানে এখন কি হবে? হতে পারে তারা এখন দরবারে এসে সে সমস্তবাণী বলতে আরম্ভ করবে যা তারা মুহাম্মদের কাছ থেকে শুনেছে। আর তাদের সে সমস্তকথা মুখস্থও আছে। তাদের বাণীগুলো শাহী দরবারে সে রকমই প্রভাব বিস্তার করে বসবে যেমন মক্কাবাসীদের উপর প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। কিন্তু এখন কি করা যেতে পারে? পরিস্থিতি হাত ছাড়া হয়ে গেছে। যা

হোক, বাদশাহ হুকমু জারী করে পাঠালেন যে, হাবাশায় আশ্রয় গ্রহণকারী সে সব যুবকদেরকে অমুক সময়ে দরবারে হাজির করা হোক।

এদিকে মুসলমানরা আগেই জানতে পেরেছেন যে, কোরাইশের প্রতিনিধিরা এসে বাদশাহর দরবারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাত করেছে। এ প্রতিনিধি দলের হাবাশা আগমনের আসল উদ্দেশ্যে তাদের জানা ছিল। মোদ্দা কথা তারাও এ ব্যাপারে অস্থির ছিলেন। বার বার এ চিন্তাই করছিলেন যে, যদি তারা তাদের উদ্দেশ্যে সফলকাম হয়ে যায় তাহলে আমাদেরকে হাবাশা থেকে বের করে দেয়া হবে। আর আমরা আবার মক্কায় ফিরে যেতে বাধ্য হবো।

একদিন বাদশাহ নাজ্জাশীর দরবারের এক সিপাহী তাদের কাছে এলো এবং বাদশাহর ফরমান তাদেরকে দিয়ে বললো, আপনাদেরকে অমুক তারিখে শাহী দরবারে উপস্থিত হতে হবে। বাদশাহর এ হুকুম তাদের জন্য একটা সংকটময় অবস্থার সৃষ্টি করলো। তারা ভাবতে লাগলেন যে, আমাদেরকে আবার মক্কায় গিয়ে সে জুলুম- নির্যাতনেরই সম্মুখীন হতে হবে। তাই সকলে মিলে পরামর্শ করতে লাগলেন যে, বাদশাহর দরবারে গিয়ে কি বলা হবে? সকলেই সম্মিলিতভাবে এ মত প্রকাশ করলেন যে, বাদশাহর দরবারে সত্য ঘটনা ব্যতীত অন্য কিছু বলা যাবে না। অর্থাৎ প্রথমে জাহেলি যুগের হাল অবস্থার উপর আলোকপাত করা হবে। তারপর ইসলামের সত্যতা, এর হুকুম- আহকাম ও ইসলামের উদাত্ত আহবানে নিহিত আধ্যাত্মিক আকর্ষণের কথা উল্লেখ করা হবে। অসত্য কোন কথাই বলা যাবে না। আর কোন সত্যকে গোপনও রাখা যাবে না।

তারা এ সিদ্ধান্তও মনোবল নিয়ে বাদশাহর দরবারে উপস্থিত হলেন। যেহেতু একটি নতুন ধর্মের অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণের ব্যাপার ছিল। তাই বাদশাহ নাজ্জাশী তার দেশের রাষ্ট্রীয় ধর্ম খ্রিস্টবাদের প্রখ্যাত আলেমদেরকেও ডেকে দরবারে উপস্থিত রেখেছিলেন। খ্রিস্টধর্মের সে ওলামাদের সম্মুখে বড় বড় কিতাব রাখা ছিল। দরবারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারাও নিজ নিজ আসনে উপবিষ্ট ছিল। শাহী শান- শওকতের মাঝে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন খ্রিস্টান ওলামাদের

উপস্থিতি দরবারকে আরো জৌলুসময় করে তুলেছে। বাদশাহ স্বয়ং অনুষ্ঠানের সভাপতির আসন অলংকৃত করেছেন। অন্য সমস্তলোক নিজ নিজ আসনে বসে আছে।

ইসলামের অকৃত্রিম বিশ্বাস ও পরিপূর্ণ আস্থা মুসলমানদেরকে একটা বিশেষ দৃঢ়তা ও দুর্জয় মনোবল দান করে রেখেছিল। সুতরাং তারা কোন প্রকার হীন অনুভূতির শিকারে পরিণত হননি বরং অত্যন্ত নির্ভীক- নিশ্চিন্তমনে দীপ্ত মনোবল সহকারে এ বিশেষ জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে গিয়ে হাজির হলেন। জাফর ইবনে আবী তালিব সর্বাগ্রে দরবারে প্রবেশ করলেন। অন্য সকল মুসলমান তার পিছনে একের পর এক দরবারে প্রবেশ করতে থাকলেন। তারা যখন দরবারে প্রবেশ করছিলেন তখন তারা তাদের চাল- চলনে ও ভাব- ভঙ্গিমায় এমন একটি ভাবের অবতারণা করছিলেন যে, মনে হলো যেন দরবারের এ ঐতিহাসিক আড়ম্বর ও অসাধারণ সাজসজ্জা তাদের মধ্যে কোনই ভয়- ভীতির সঞ্চার করেনি। এর সাথে সাথে তারা শাহী দরবারে প্রবেশের প্রচলিত আদব- কায়দা অবলম্বন করেননি। সাধারণ লোকেরা রাজ- দরবারে প্রবেশ করার সময় নিজের হীনতা প্রকাশ করার জন্য দরবারের মেঝে চুম্বন করে থাকে। কিন্তু মুসলমানরা একেবারেই সহজ- সরলভাবে দরবারে প্রবেশ করে গেলেন এবং ইসলামী নিয়ম- নীতি অনুসরণ করে বাদশাহকে সালাম জ্ঞাপন করলেন।

মুসলমানদের এহেন আচরণকে কেউ কেউ রাজ দরবারের প্রতি অবমাননাকর অভিহিত করে অভিযোগ উত্থাপন করলো। এর জবাবে তারা বললেন, যে দ্বীনের জন্য আমরা মাতৃভূমি ত্যাগ করে এ দেশে আশ্রয় গহণ করেছি, আমাদের সে দ্বীন কখনও আমাদেরকে অনুমতি দেয় না যে, লা- শারীক এক খোদা ব্যতীত আর কারো সামনে মাথানত করে হীনতা- নিচুতার প্রকাশ করতে।

মুসলমানদের এ জবাবে শাহী দরবারে সমাগত লোকদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করলো। আর মুসলমানদের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও অসামান্য শ্রেষ্ঠত্বের সামনে শাহী দরবারের বাহ্যিক জাঁকজমক ও যাবতীয় সাজসজ্জা ম্লান হয়ে গেল।

এবার স্বয়ং বাদশাহ নাজ্জাশী মুমলমানদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের সে নতুন ধর্মটি কি যা আমাদের ধর্ম ও তোমাদের পুরাতন ধর্ম অপেক্ষা অধিক উত্তম এবং ভিন্নতর?

হাবাশার বাদশাহ নাজ্জাশীর রাজ দরবারে মুসলমানদের এ দলটির নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (আঃ)- এর ভাই জনাব জাফর ইবনে আবী তালিব। আগেই সিদ্ধান্তগৃহীত হয়েছিল যে, শাহী দরবারের প্রশ্নের জবাব তিনিই দেবেন।

জনাব জা'ফর তাইয়্যার বাদশাহর প্রশ্নের জবাবে বললেন, আসলে আমরা অজ্ঞতা ও মুর্খতার জীবন যাপন করছিলাম। আমরা মূর্তি পূজা করতাম। মৃত প্রাণী খেতাম। অশ্লীল কর্মকাণ্ড ছিল আমাদের কর্মধারা। প্রতিবেশীর সাথে আমরা করতাম দুর্ব্যবহার। আমাদেরকে এ অবস্থা থেকে উদ্ধার করার জন্য মহান আল্লাহ আমাদের মাঝে একজন নবী পাঠিয়েছেন। যার পাক- পবিত্রতা ও বংশীয় মর্যাদা সম্পর্কে আমাদের মধ্যে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। খোদার সে রাসূল আমাদেরকে আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসের আহবান জানিয়েছেন এবং এক খোদারই ইবাদত- বন্দেগী করার শিক্ষা দিয়েছেন। মূর্তি, পাথর, গাছপালা ইত্যাদির পূজা করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আমাদেরকে সত্য কথা বলার হুকুম করেছেন। লোকদের আমানত পরিশোধ করার এবং প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার করার শিক্ষা দান করেছেন। তার কাছে আমরা শিক্ষা লাভ করেছি লোকদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের পন্থা। আল্লাহর এ রাসূল আমাদেরকে মিথ্যা কথা বলতে, পাক- পবিত্র নারীদের অপবাদ দিতে এবং অন্যায়ভাবে ইয়াতিমের মাল ভক্ষণ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আমাদেরকে হুকুম করেছেন যে, ইবাদত- বন্দেগীতে এক আল্লাহর সাথে আর কাউকে অংশীদার না বানাতে। আল্লাহর এ পয়গাম্বরই আমাদেরকে নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদির শিক্ষা দিয়েছেন। সুতরাং আমরা তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং তার রেসালতের সাক্ষ্য প্রদান করেছি। আমরা ইসলামের এ মহান অনুশাসনগুলোর ও এর গুরুত্বপূর্ণ মহামূল্যবান শিক্ষাগুলোর অনুশীলন শুরুকরেছি। কিন্তু আমাদের জাতির একদল লোক আমাদের এ ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে আপত্তি করেছে এবং আমাদের উপর নানা রকম বিপদ- মুছিবত ও জুলুম- অত্যাচার চাপিয়ে দিয়েছে। যা আগাগোড়া অন্যায়- অবিচার ছাড়া আর কিছু নয়। আমরা পুনরায় মূর্তি পূজা ও অন্যান্য খারাপ কর্মকান্ডে প্রত্যাবর্তন করতে প্রকাশ্যে অস্বীকার করেছি। আমাদের প্রত্যাবর্তন অস্বীকার করার কারণে আমাদের জাতির লোকেরা আমাদের উপর

অত্যাচার- নিপীড়নের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে। তাদের সীমাহীন জুলুম- নির্যাতনে অতীষ্ট হয়ে আমরা মাতৃভূমি ত্যাগ করে আপনাদের দেশে এসে আশ্রয় নিয়েছি।

হযরত জা’ফর ইবনে আবী তালিবের বক্তব্য শেষ হবার সাথে সাথেই বাদশাহ নাজ্জাশী বললেন, যে কথাগুলোকে তোমাদের নবী ঐশী বাণী বলে প্রচার করেন এবং বলেন যে, এ বাণীগুলো মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে, তার কোনো কথা কি তোমাদের স্মরণ আছে?

জনাব জা’ফর বিন আবু তালিব বললেন, জ্বী হ্যাঁ!

বাদশাহ নাজ্জাশী বললেন, তাহলে কিছু অংশ পাঠ করে শোনাও।

জনাব জাফর তাইয়্যার দরবারের তাক লেগে থাকা পরিবেশের দিকে একবার তাকালেন। সমগ্র দরবার খ্রিস্ট ধর্মমতে বিশ্বাসীদের দ্বারা পরিপূর্ণ। বাদশাহ নিজেও খ্রিস্ট ধর্মের অনুসারী। অনুষ্ঠানের পুরোভাগে উপবিষ্ট বড় বড় পাদ্রীবৃন্দ। তাদের সামনে পবিত্র ইঞ্জিল কিতাব রাখা। সুতরাং পরিস্থিতি- পরিবেশের আলোকে তিনি সূরা মরিয়াম তিলাওয়াত শুরুকরলেন। পবিত্র সূরার সে সমস্তআয়াতই তিনি অত্যন্ত ধীরস্থিরভাবে পাঠ করতে লাগলেন, যে আয়াতগুলো হযরত ঈসা, মারিয়াম, ইয়াহইয়া ও যাকারিয়া (আঃ)- এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। হযরত জা’ফর ক্বিরাআতের বিশেষ ভঙ্গিতে এ কোরআন তিলাওয়াত শাহী দরবারে সমবেত সকলের উপর একটা অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করে। তার উদ্দেশ্য ছিল কোরআনের এ আয়াতগুলো তিলাওয়াতের মাধ্যমে হযরত ঈসা ও মরিয়াম (আঃ) সম্পর্কে আল- কোরআনের বিশুদ্ধ ও মধ্যম নীতির বক্তব্যটি খ্রিস্টানদের সামনে তুলে ধরা। আর তিনি আরও বুঝাতে চাইলেন যে, পবিত্র কোরআন হযরত ঈসা ও মারিয়াম (আঃ) কে অত্যন্তপাক- পবিত্র বলে ঘোষণা করে। সাথে সাথে তাদেরকে আল্লাহর অংশীদারিত্ব থেকে অনেক দূরে বলে সাব্যস্তকরে। কোরআনের এ আয়াতগুলো পাঠ করার সাথে সাথে পরিস্থিতি বদলে গেল এবং সকলের চোখ থেকে অশ্রুপ্রবাহিত হতে লাগলো।

বাদশাহ নাজ্জাশী বললেন, খোদার কসম! হযরত ঈসা (আঃ) যে সত্যের আলোচনা করেছিলেন তা এগুলোই। হযরত ঈসা (আঃ)- এর কথাবার্তা ও আল- কোরআনের বাণীসমূহের ভিত্তি একই। অতঃপর বাদশাহ নাজ্জাশী কোরাইশের প্রতিনিধিদের উদ্দেশে বললেন, তোমরা সোজা নিজেদের দেশে ফিরে যাও। আর তোমরা যে উপঢৌকন সামগ্রী নিয়ে এসেছো সেগুলোও ফিরিয়ে নিয়ে যেয়ো।

এর অল্প কিছুদিন পরেই বাদশাহ নাজ্জাশী ইসলাম কবল করে মসলমান হয়ে গেলেন। তিনি নবম হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। রাসূল (সাঃ) সুদূর মদীনা থেকেই তার জানাযার নামাজ পড়েন।[৬৬]

৫৬

শ্রমিক ও সূর্যকিরণ

শ্রমিকের পোশাক পরে হাতে বেলচা নিয়ে ইমাম জা'ফর সাদিক (আঃ) নিজের জমিতে কাজ করছিলেন। অনেকক্ষণ পর্যন্তকাজ করার কারণে তার সমগ্র শরীরটা ঘামে ভিজে চুপ চুপ হয়ে গিয়েছে। এমন সময় আবু আমর শাইবানী নামের এক ব্যক্তি সেখানে এসে উপস্থিত হলো। সে দেখতে পেলো, ইমামের দেহ থেকে ঘাম টপ টপ করে ঝরছে। সে ভাবলো- হয়তো শ্রমিক পাওয়া না যাওয়াতে ইমাম নিজেই নিজের ক্ষেতে কাজ করা শুরুকরেছেন। তাই সে এগিয়ে গিয়ে বললো, হে ইমাম! বেলচাটি আমাকে দিন। বাকী কাজটুকু আমি করবো।

ইমাম (আঃ) বললেন, না! আসলে আমি খুব পছন্দ করি যে, মানুষ রোযগারের জন্য নিজে পরিশ্রম করবে এবং রুটি- রুযি অর্জন করার জন্য রোদের প্রখরতা সহ্য করবে।[৬৭]

৫৭

নতুন প্রতিবেশী

একজন আনসার মদীনায় একটি নতুন বাড়ি খরিদ করলেন এবং সেখানেই উঠে গেলেন। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি টের পেলেন যে, তিনি অত্যন্ত অসংযত লোকের প্রতিবেশী হয়েছেন। সুতরাং তিনি রাসূলে খোদা (সাঃ)- এর খেদমতে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি অমুক মহলায় অমুক গোত্রের মাঝে একটি বাড়ি খরিদ করেছি এবং সেখানে বসবাস শুরুকরেছি। কিন্তু বড়ই আফসোসের ব্যাপার হচ্ছে যে, আমার প্রতিবেশী শুধু একজন অভদ্র লোকই নয়, বরং অত্যন্ত রূঢ় ও ঝগড়াটে। আমি নিজেকে তার বিবাদ ও অনিষ্টতা থেকে রক্ষা করতে পারছি না। আমি কিছুতেই নিশ্চিত হতে পারছি না যে, আমার জন্য যে কোন মুহূর্তে বিপদ ও ক্ষতির কারণ সৃষ্টি হবে না।

মহানবী (সাঃ) হযরত আলী, সালমান, আবু যার ও মেকদাদ (রাঃ)- এর মতো চারজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে এ বিষয়ে দায়িত্ব প্রদান করলেন যে, তারা মসজিদে নারী- পুরুষ সকলের মধ্যে অত্যন্তউচ্চ স্বরে ঘোষণা করে দেবেন যে ব্যক্তির মুদ্রাগত ও ঝগড়াটে চরিত্রের কারণে তার প্রতিবেশী আতনার্দ ও ফরিয়াদ করবে সে ঈমানদার নয়।

রাসূল (সাঃ) এর হুকুম মোতাবেক এ সাধারণ ঘোষণাটি তিন তিনবার দেয়া হলো। এরপর রাসূল (সাঃ) তার পবিত্র হাত চারদিকে ঘরিয়ে বললেন, চারদিকের চলিশ ঘরের লোক প্রতিবেশী হিসেবে পরিগণিত।[৬৮]

৫৮

অন্তিম বাণী

হযরত ইমাম মূসা কাজিম (আঃ)- এর আম্মা উম্মে হামীদা স্বীয় স্বামী হযরত ইমাম জা'ফর সাদিক (আঃ)- এর ইন্তেকালের পর সীমাহীন দুঃখ- বেদনা ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায় বসেছিলেন। হঠাৎ তিনি দেখলেন আববাছীর আসছে। সে ইমামের মৃত্যুতে শোক সন্তপ পরিবারকে সান্ত্বনা দেবার জন্য আসছিল। আবু বাছীরকে দেখেই উম্মে হামীদার চোখ অশ্রুপূর্ণ হয়ে গেল। আবু বাছীরও ইমামের শোকে কাঁদতে থাকলো। কিছুক্ষণ পর উম্মে হামীদা কান্না সংযত করে আবু বাছীরকে বললেন, তুমি তখন উপস্থিত ছিলে না যখন ইমাম অন্তিম অবস্থা্য় ছিলেন। তখন এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছিল।

আবু বাছীর বললো, সে ঘটনাটি কি ছিল তা আমাকেও বলুন।

উম্মে হামীদা বললেন, ইমামের জীবনের শেষ মুহূর্ত ছিল। তিনি চক্ষু বন্ধ করে শ্বাস- প্রশ্বাস নিচ্ছিলেন। হঠাৎ ইমাম চোখ খুলে বললেন, আমার সকল প্রিয়জন, আত্মীয়- স্বজন ও আমাকে যারা ভালোবাসে তাদেরকে আমার কাছে ডাকো।

আশ্চর্যের ব্যাপার ছিল এই যে, ইমাম তার জীবনের অন্তিম ইচ্ছার কথা এভাবে বলেছেন যে, মনে হয় কোনো নির্দেশ দান করছেন। যা হোক সকলকে একত্র করা হলো। যথা সম্ভব এ চেষ্টা করা হয়েছে যে, ইমামের আপনজন, আত্মীয়- স্বজন ও তার অনুসারীদের কেউ যেন বাকী না থাকে। সমস্তলোক এসে ইমামের কাছে দাঁড়িয়ে এ অপেক্ষা করছিলেন যে, ইমাম তার জীবনের শেষ মুহূর্তে কি কথা বলেন। ইমাম সকলকে উদ্দেশ করে বললেন, আমাদের শাফায়াত ও সুপারিশ সে সমস্তলোক কখনো লাভ করতে পারবে না যারা নামাযকে তুচ্ছ জ্ঞান করে।[৬৯]

৫৯

নাসীবাহ

নাসীবাহ বিনতে কাআ'ব নিজের পুত্র আম্মারার সূত্রে উম্মে আম্মারা নামে খ্যাত ছিলেন। তার কাঁধে এমন একটি দাগ ছিল যা দেখে এ কথা বুঝতে দেরী হতো না যে, এটি একটি মারাত্মক যখমের দাগ। নারীরা, বিশেষত যে সমস্তযুবতী মেয়ে যারা রাসূলে আকরাম (সাঃ)- এর জীবদ্দশা দেখেনি কিংবা রাসূলের সময়ে একেবারে ছোট্ট ছিল তারা উম্মে আম্মারার কাঁধের মারাত্মক যখমের দাগটি দেখে উম্মে আম্মারার কাছ থেকে সে অহুদের যুদ্ধের কাহিনী শুনতে চাইতো যে যুদ্ধের সময় তাকে এ বিপজ্জনক আঘাতটি বরণ করতে হয়েছিল।

উম্মে আম্মারার আদৌ কোন চিন্তা- ফিকির ও পরোয়া ছিল না যে, তার স্বামী ও দুইটি ছেলে অহুদের ময়দানে ইসলামের দুশমনদের বিরুদ্ধে মোকাবিলা করে রাসূলে আকরাম (সাঃ)- এর রক্ষায় নিয়োজিত রয়েছেন। তিনি পানির মশক কাঁকে নিয়ে আঘাতপ্রাপ্ত সৈনিকদের পানি পান করানো ও তাদের সেবা- পরিচর্যার কাজে লেগেই আছেন। ইসলামী সৈনিকের ক্ষত স্থানে পট্টি বাঁধার জন্য তিনি কিছু কাপড়ের পট্টিও নিয়ে এসেছিলেন। সেদিন নাসীবাহ এ কাজেই ব্যস্তছিলেন। তার অন্য কোন কাজ ছিল না।

যুদ্ধের প্রথম দিকে মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যার স্বল্পতা ও অস্ত্র সীমিত থাকা সত্ত্বেও ইসলামের মুজাহিদরা শত্রুপক্ষকে পর্যুদস্তকরে দিয়েছিল। ফলে ইসলামের শত্রুরা রণাঙ্গন ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী একটি গিরিপথে নিয়োগকৃত কিছু সংখ্যক মুসলিম সৈনিকের গাফলতির কারণে দুশমনরা পিছন থেকে ইসলামী বাহিনীর উপর অতর্কিতে হামলা চালায়। যুদ্ধের রূপ বদলে গেল। রাসূল (সাঃ)- এর নিকট সমবেত ইসলামী বাহিনীর লোকেরা হঠাৎ মারাত্মক হামলার সম্মুখীন হলো।

এ অবস্থা দেখে নাসীবাহ পানির মশক মাটিতে রেখে দিয়ে হাতে তলোয়ার উঠিয়ে নিলেন। কখনও বা তীর ধনুকের সাহায্য নিলেন। আবার কখনো তলোয়ারের সাহায্যে দুশমনদের উপর

হামলা করলেন। রণাঙ্গন থেকে পলায়নকারী সৈনিকদের কাছ থেকে একটি যেরাহ ছিনিয়ে নিলেন এবং শত্রুসৈন্যের মোকাবিলার সময় সে যেরাহটি ব্যবহার করলেন। হঠাৎ রণাঙ্গনে এক শত্রুসৈন্য ঘোষণা দিয়ে বেড়াচ্ছিল, মুহাম্মদ কোথায়? স্বয়ং মুহাম্মদ কোথায়? এ ঘোষণা শুনেই নাসীবাহ সে দিকে দৌঁড়ে গেলেন। সেখানে পৌঁছেই তিনি সেই শত্রুটির উপর দুই তিনটি মারাত্মক আঘাত হানলেন যে এ গুজবটি ছড়াচ্ছিল। যেহেতু সে দুশমনটি দুই দুটি যেরাহ (লৌহ পোশাক) পরিধান করেছিল, সে জন্য নাসীবার আঘাত তাকে ঘায়েল করতে পারেনি। কিন্তু সে নাসীবার বাধামুক্ত স্কন্ধে একটা প্রচণ্ড আঘাত হানে যার ফলে তার কাঁধে এমন একটি গভীর যখম হলো যে, প্রায় এক বছরেরও বেশীকাল ধরে তার চিকিৎসা করতে হয়েছিল। রাসূলে আকরাম (সাঃ) দেখলেন যে, নাসীবার যখমের স্থল থেকে রক্তের ফিনকি বের হচ্ছে। এ অবস্থা দেখে তিনি নাসীবার এক ছেলেকে ডেকে বললেন, দৌঁড়ে যাও, তোমার মায়ের কাঁধের যখমস্থলে তাড়াতাড়ি পট্টি বাঁধো। ছেলেটি দ্রুত গিয়ে মায়ের এ গভীর যখমস্থলে মজবুত পট্টি বাঁধলো। এরপর নাসীবাহ আবার যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হলেন।

এমন সময় তিনি দেখলেন তার এক ছেলে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। সাথে সাথেই তিনি সে পট্টির কাপড় বের করলেন যা তিনি সাথে নিয়ে এসেছিলেন আহত মুজাহিদদের জন্য। তারপর খুব দ্রুত আহত পুত্রের কাছে পৌঁছে গেলেন এবং তার যখমের উপর পট্টি বাঁধলেন। মহানবী (সাঃ) গভীরভাবে এ দৃশ্য দেখছিলেন। তিনি সে রমণীর এ বীরত্ব প্রত্যক্ষ করে মুচকি হাসলেন। নিজের ছেলের যখমে পট্টি বেঁধে তিনি ছেলেকে বললেন, বাবা! ইসলামের দুশমনদের মোকাবিলা করার জন্য তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে যাও। নাসীবাহর এ কথাটি শেষ হতে না হতেই মহানবী (সাঃ) একটি লোকের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, তোমার ছেলেকে এ লোকটিই আঘাত করেছে। এ কথা শোনার সাথে সাথেই নাসীবাহ সিংহীর ন্যায় সে লোকটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আর তার হাঁটুর নিচে এমনভাবে তলোয়ারের আঘাত হানলেন যে, সেখানেই সে কুপোকাত হয়ে গেল। রাসূল (সাঃ) বললেন, নাসীবাহ! তুমি তোমার প্রতিশোধ নিয়ে নিয়েছো। মহান আল্লাহর শোকর আদায় করছি যে, তিনি তোমাকে সফল করেছেন। তিনি তোমাকে ইজ্জত ও সম্মানে ভূষিত

করেছেন। যুদ্ধে কিছু সংখ্যক মুসলমান মুজাহিদ শাহাদত বরণ করেন এবং কতিপয় আহত হন। নাসীবাহও খুব মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিলেন। মনে হচ্ছিল যে, এ আঘাতে হয়তো তিনি বেঁচে থাকবেন না। অহুদের যুদ্ধের পর রাসূল (সাঃ) ইসলামী বাহিনীকে হামরাউল আসাদ নামক স্থানে যাবার নির্দেশ দিলেন। ইসলামী বাহিনী সেদিকে যাত্রা করলো। নাসীবাহও যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মারাত্মক যখমের কারণে চলার শক্তি ছিল না। হামরাউল আসাদ থেকে ফিরে এসে সাথে সাথেই মহানবী (সাঃ) নাসীবাহর খোঁজ- খবর নেবার জন্য একজন লোক পাঠালেন। লোকটি ফিরে এসে তার অবস্থা্র' উন্নতির সুসংবাদ পরিবেশন করলো। তাতে আল্লাহর নবী খুব খুশী হলেন।[৭০]

৬০

ঈসা এর- (আঃ)প্রত্যাশা

হযরত ঈসা (আঃ) তার শিষ্য- সাথী তথা হাওয়ারীদেরকে বললেন, আমার একটা প্রত্যাশা আছে। যদি তোমরা আমার এ আশা পূর্ণ করার প্রতিশ্রুতি দাও তাহলে আমি তোমাদেরকে সে আশার কথা বলবো। জবাবে হাওয়ারীরা বললো, আপনি হুকুম করুন আমরা সবাই আপনার সে নির্দেশ পালনের জন্য প্রস্তুত।

ঈসা (আঃ) নিজের স্থান থেকে উঠে গিয়ে হাওয়ারীদের প্রত্যেকের পা ধুয়ে দিতে লাগলেন। এতে হাওয়ারীদের চেহারায় অস্থিরতা ও অশান্তির ছাপ ফুটে উঠলো। কিন্তু যেহেতু ঈসা (আঃ)- এর আশা- আকাংক্ষা পূর্ণ করার অঙ্গীকার করেছিল, তাই নীরব থাকা ব্যতীত আর কোন পথ ছিল না। যা হোক, ঈসা (আঃ) তাদের পা ধুতে থাকলেন। তিনি যখন এ কাজ থেকে অবসর হলেন তখন তারা বললো, আপনি আমাদের শিক্ষাগুরু। উচিত ছিল তো আমরাই আপনার পা ধুয়ে দেবো। কিন্তু আপনি এ কাজ করে আমাদেরকে লজ্জিত করলেন।

হযরত ঈসা (আঃ) বললেন, আমি এ কাজ লোকদেরকে এ শিক্ষা দেবার জন্য করেছি যে, সবচেয়ে অধিক যোগ্য ও বিজ্ঞ সে ব্যক্তি যে, আল্লাহর সৃষ্টির সেবা করার দায়িত্ব পালন করে। আমি এ কাজটি হীনতা- নিচতা ও হেয়পনার নমুনা হিসাবে পেশ করার জন্য আঞ্জাম দিয়েছি যাতে করে তোমরা অধমতা ও হেয়তার শিক্ষা লাভ করতে পারো। আমার পরে যখন তোমাদের উপর সাধারণ মানুষকে শিক্ষা দেয়া ও সত্য দ্বীনের দাওয়াত পেশ করার দায়িত্ব আসবে তখন তোমরাও হীন ও নিচ মনোভাব নিয়ে সৃষ্টি সেবার পথ অবলম্বন করতে পারো। জ্ঞান- বুদ্ধি এরূপ অধমতা ও হেয়তার ক্ষেত্রেই সুশোভিত হয়ে ওঠে। ঠিক বিপরীতে অহংকার ও দম্ভতার পরিবেশে জ্ঞান- বুদ্ধির বিকাশ ঘটা একেবারেই অসম্ভব।এর উদাহরণ মনে করো এমন যে, ঘাস নরম মাটিতে উৎপাদিত হয়ে থাকে, শক্ত জমির পাহাড়ে ঘাস জন্মানো অসম্ভব।[৭১]

৬১

মরুভূমিতে লাকড়ীর যোগাড়

রাসূলে আকরাম (সাঃ) তার সাথীদেরকে নিয়ে এক সফরে এমন এক স্থানে এসে কাফেলা থামিয়ে দিলেন যা ছিল অনাবাদী এক মরুভূমি। আগুন জ্বালাবার জন্য তাদের লাকড়ির প্রয়োজন দেখা দিল। রাসূল (সাঃ) বললেন, তোমরা সকলে মিলে কিছু কিছু লাকড়ি যোগাড় করে আনো। সকলে বললো, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আপনি নিজেই দেখতে পাচ্ছেন যে, এটি এমন একটি ভুখণ্ড যা একেবারে অনাবাদী খালি মরুভূমি। অনেক দূর পর্যন্তও এক টুকরা লাকড়ির চিহ্নও দেখা যায় না। রাসূল (সাঃ) বললেন, তবুও প্রত্যেকে মিলে চেষ্টা করে দেখো, যে যা কুড়াতে পারো তাই এনে জমা করো।

রাসূলের সাথীরা লাকড়ির সন্ধানে বেরিয়ে পড়লো। আর খুব ভালোভাবে দেখতে দেখতে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। তাদের সামনে ছোট্ট একটি লাকড়ির টুকরাও দেখতে পেলে সেটাই তুলে নিল। অবশেষে প্রত্যেকেই অল্প- স্বল্প লাকড়ি নিয়ে ফিরে আসলো। যখন সকলের আনিত লাকড়িগুলো একত্রে জমা করা হলো তখন দেখা গেল বেশ বড় একটা স্তুপ হয়ে গেছে।

এ স্তুপ দেখে মহানবী (সাঃ) বললেন, আমাদের ছোট ছোট ও সাধারণ গুনাহ লাকড়ির এ ছোট ছোট টুকরোর মতো যা প্রথমে নজরেই আসে না। কিন্তু সব কিছুরই কোন না কোন সন্ধানকারী থাকে। তোমরা সন্ধান কাজ শুরু করেছো তাতে লাকড়ির এ স্তুপ জমে ।তদ্রূপই আমাদের ছোট ছোট ও সাধারণ গুনাহকে জমা করা হচ্ছে। আর একদিন তোমরা দেখতে পাবে যে, বাহ্যিকভাবে দেখা যায় না এমন সব ছোট ছোট গুনাহ একত্র করার পর একটি বিরাট স্তুপের আকার ধারণ করেছে।[৭২]

৬২

দস্তরখানে মদ্য

আব্বাসীয় খলিফা মনসুর দেওয়ানিকী কিছু দিন পর পরই বিভিন্ন বাহানা- বায়না দিয়ে হযরত ইমাম জা'ফর সাদিক (আঃ)- কে মদীনা থেকে ইরাকে ডেকে আনতো। তার আসল উদ্দেশ্য ছিল ইমামের চলাফেরা ও কাজ- কর্মের উপর খবরদারী ও কড়া নজর রাখা। মাঝে মাঝে সে ইমামকে অনেক দিন পর্যন্ত মদীনায় ফিরে যেতে দিত না। একবার হযরত ইমাম জা'ফর সাদিক (আঃ) ইরাকে অবস্থান করছিলেন। মনসুরের সেনা বাহিনীর এক কর্মকর্তার ছেলের মুসলমানী (খাৎনা) করা হয়েছিল। এ উপলক্ষে সে এক আড়ম্বরপর্ণ প্রীতিভোজের আয়োজন করেছিল। সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ নেতা, মন্ত্রী, ব্যবসায়ী প্রভাবশালী লোক এ অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত ছিল। অন্যদের ন্যায় সে ইমাম জা'ফর সাদিক (আঃ)- কেও দাওয়াত দিয়েছিল। ইমাম গেলেন। দস্তরখানা বিছিয়ে দেয়া হলো। সমস্তলোক খাওয়ার জন্য দস্তরখানে বসে পড়লো। ইমামও বসলেন। খাবার আনা হলো এবং লোকেরা খেতে লাগলো। এমন সময় একজন মেহমান পানি চাইলো। পানির বদলে তার হাতে মদের পেয়ালা দেয়া হলো। যখনই তাকে মদের পেয়ালা দেয়া হলো সাথে সাথেই ইমাম সাদিক (আঃ) উঠে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং দস্তরখানা ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। তারা ইমামকে পুনরায় দস্তরখানে নিয়ে যাবার জন্য সব রকমের চেষ্টাই করেছে। কিন্তু ইমাম আর ফিরে গেলেন না, বরং লোকদেরকে উদ্দেশ করে বললেন, রাসূলে আকরাম (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন দস্তরখানে বসে, যেখানে মদ রয়েছে তার উপর আল্লাহর অভিশাপ।[৭৩]

৬৩

কোরআন শোনার সাধ

ইবনে মাসউদ ওয়াহী লেখকদের মধ্যে একজন ছিলেন অর্থাৎ তিনি মহান আল্লাহর তরফ থেকে নাযিলকৃত আয়াতগুলোকে ক্রমানুসারে সাজিয়ে লিখে রাখতেন।

একদিন আল্লাহর নবী (সাঃ) ইবনে মাসউদকে বললেন, আমার সাধ হচ্ছে যে, তুমি কোরআন মজীদ তিলাওয়াত করবে আর আমি তা শ্রবণ করবো। ইবনে মাসউদ তার পান্ডুলিপি নিয়ে সূরা আন-নিসা তিলাওয়াত করা শুরু করলেন। রাসূলে আকরাম (সাঃ) খুব মনোযোগ সহকারে তিলাওয়াত শুনছিলেন। এভাবে ইবনে মাসউদ যখন সূরা নিসার ৪১নং আয়াত তিলাওয়াত করলেন :

"বলো! তখন কি অবস্থা হবে, যখন আমরা প্রত্যেক উম্মত ও দলের সাক্ষী তলব করবো? আর (হে মুহাম্মদ!) তোমাকে তলব করা হবে তাদের সকলের সাক্ষী হিসাবে।"

যেই মাত্র এ আয়াত তিলাওয়াত সমাপ্ত হয়েছে, রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর চোখ দিয়ে অশ্রুপ্রবাহিত হলো। তিনি বললেন, হে ইবনে মাসউদ! এখানেই থেমে যাও। এতটুকুনই যথেষ্ট।[৭৪]

৬৪

সাধারণের খ্যাতি

বহু দিন থেকে সাধারণ মানুষের মধ্যে এক ব্যক্তি খুব জনপ্রিয়। সকলের মুখে মুখে তার নাম আলোচিত। চারদিকে তার তাকওয়া, পরহেযগারী ও ঈমানদারীর চর্চা হতো। সর্বত্র লোকেরা তার উন্নত চরিত্র ও শ্রেষ্ঠত্বের মহিমা গেয়ে বেড়াতো। অনেক সময় হযরত ইমাম জা'ফর সাদিক (আঃ)- এর সামনেও লোকেরা তার তাকওয়া- পরহেযগারী ও সৎ চরিত্রের কথা আলোচনা করেছে। তাই ইমাম (আঃ)- এর চিন্তা হলো এমন একজন খোদাভক্ত লোককে সবার অলক্ষ্যে নিজের চোখে দেখা দরকার। যে সাধারণ মানুষের মধ্যে এতো বিরাট জনপ্রিয়তা ও খ্যাতি অর্জন করে নিয়েছে। প্রত্যেক মানুষই তাকে অত্যন্তসম্মান ও শ্রদ্ধার চোখে দেখে।

একদিন হযরত ইমাম জা'ফর সাদিক (আঃ) একজন অপরিচিত লোকের মতো সে ব্যক্তির কাছে গেলেন। দেখতে পেলেন তার আশপাশে তার ভক্তবৃন্দ ভিড় জমিয়ে বসে আছে। তাদের অধিকাংশই অজ্ঞ- জাহেল। ইমাম (আঃ) নিজের পরিচয় না দিয়ে চুপচাপ বসে বসে সব কিছু অবলোকন করতে লাগলেন। প্রথম দর্শনেই ইমামের বুঝতে দেরী হলো না যে, সে লোকদের সাথে ধোঁকার নীতি অবলম্বন করে লোকদেরকে আকৃষ্ট করে রেখেছে। একবার সে লোকদের ভিড় থেকে বেরিয়ে পড়লো এবং এক সড়ক পথে এগিয়ে যেতে লাগলো। ইমামও তার পিছে পিছে যাচ্ছিলেন যাতে করে দেখতে পারেন যে, সে কোথায় যায় এবং কি করে? এমন কোন্ কাজটি করে, যার কারণে লোকেরা তার প্রতি এত আসক্ত হয়ে গেছে?

কিছু দূর চলার পর সে একটি রুটির দোকানের সম্মুখে দাঁড়িয়ে গেল। একটি দৃশ্য দেখে ইমাম অবাক হয়ে গেলেন যে, লোকটি দোকানদারের অগোচরে দুটি রুটি নিয়ে নিজের কাপড়ের নিচে গোপন করে ফেললো। এরপর সে আরো সামনে এগুতে লাগলো। ইমাম ভাবলেন হতে পারে এ রুটিগুলো সে খরিদ করার উদ্দেশ্যেই নিয়েছে। এর দাম হয়তো আগেই পরিশোধ করে দিয়েছে

অথবা পরে পরিশোধ করবে। কিন্তু এমনটিই যদি হবে তাহলে দোকানদারের দৃষ্টির আড়ালে রুটিগুলো তুলে নেবে কেন? আর দোকানিকে কিছু না বলেই সামনে চলে যাবে কেন?

সে যাই হোক, ইমাম (আঃ) তার পিছে পিছে অনুসরণ করে সামনে এগিয়ে যেতে লাগলেন। তিনি রুটির দোকানের বিষয়টি নিয়ে চিন্তা- ভাবনা করছিলেন। ঠিক এমনি সময় সে লোকটি একটি ফলের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে গেল। দোকানদারের চোখ একটু আড়াল হতেই সে খপ করে দুটি ডালিম নিজের কাপড়ের নিচে লুকিয়ে ফেললো। এরপর সামনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো। এটা দেখে ইমাম আরো অবাক হয়ে গেলেন। কিন্তু ইমামের আশ্চর্য হওয়ার সীমানা তখন ছাড়িয়ে গেল যখন তিনি দেখলেন যে, লোকটি সে রুটিগুলো ও ডালিমগুলো একজন রুগীকে দান করে দিল। সেখান থেকে বেরিয়ে আসার পর ইমাম তার সামনে এসে তাকে বললেন, আজ আমি তোমাকে আশ্চর্য ধরনের কিছু কাজ করতে দেখলাম। এরপর ইমাম প্রথম থেকে শেষ পর্যন্তঘটনাগুলো বর্ণনা করলেন। অতঃপর তার কাছে এ অবৈধ কর্ম- কাণ্ডগুলোর ব্যাখ্যা চাইলেন। সে ইমামকে নিরীক্ষণ করলো এবং বললো, আমার মনে হয় আপনি জা'ফর ইবনে মুহাম্মাদ (আঃ)।

জবাবে ইমাম বললেন, হ্যাঁ, তোমার ধারণা সত্য। আমি জা'ফর ইবনে মুহাম্মাদ।

লোকটি বললো, নিঃসন্দেহে আপনি রাসূলে পাক (সাঃ)- এর সন্তান এবং খান্দানী মর্যাদার দিক থেকে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। কিন্তু আমার আফসোস হয় যে, আপনি একজন অজ্ঞ জাহেল।

ইমাম (আঃ) বললেন, তুমি আমার মধ্যে কি অজ্ঞতা- মূর্খতা দেখতে পেলে?

লোকটি বললো, আপনার এ প্রশ্নটিই মুর্খতা বৈ কিছু নয়। মনে হচ্ছে আপনি দ্বীনের সহজ- সরল হিসাবটাও জানেন না। আপনি কি জানেন না যে, মহান আল্লাহ বলেছেন,

অর্থাৎ যে ব্যক্তি একটি নেক কাজ করলো, তাকে তার প্রতিদান দেয়া হবে দশ গুণ।

আল- কোরআনে অন্যত্র বলা হয়েছে :

অর্থাৎ আর যে ব্যক্তি একটি মন্দ কাজ করবে, তাকে তার পরিণতিতে সে পরিমাণ শাস্তি ব্যতীত আর কিছু দেয়া হবে না। সুতরাং একটি গুনাহের কাজের জন্য একটি সাজা আর একটি নেক

কাজের জন্য দশ গুণ ছওয়াব। তাহলে সে হিসাবে আমি দুটি রুটি চুরি করেছি তাতে দুটি গুনাহের কাজ করেছি। আবার আমি দুটি ডালিম চুরি করেছি এ জন্য আরো দুটি গুনাহ আমার হিসাবে যোগ হয়েছে। অপর দিকে সে রুটি দুটি ও ডালিম দুটি আল্লাহর পথে একজন রুগীকে দান করে দিয়েছি যার প্রতিটির বিনিময়ে দশ নেকী করে আমার হিসাবে লেখা হয়েছে। এভাবে প্রতিটিতে দশ নেকী হিসাবে আমি চল্লিশটি নেকী লাভ করেছি। এখন খুব সহজে এ হিসাব করা যেতে পারে যে, আমার আমলনামায় চলিশটি সওয়াব লেখা হয়েছে। আর মোকাবিলায় গুনাহের সংখ্যা মাত্র চারটি। তাহলে এখন যদি আমার চলিশটি নেকী থেকে চারটি গুনাহ বিয়োগ করা হয় তাতেও আমার আমলনামায় ছত্রিশটি নেকী অবশিষ্ট থাকে। এ হলো সে সহজ- সরল হিসাব যা আপনি বুঝতে পারেননি এবং আমাকে অজ্ঞের মতো প্রশ্ন করে বসেছেন।

ইমাম জা'ফর সাদিক (আঃ) বললেন, তোমার মৃত্যু হোক। আসলে তুমি হলে বড় জাহেল যে নিজের ইচ্ছা মতো মনগড়া হিসাব- কিতাব করছো। তুমি কোরআনের এ আয়াত পড়োনি? মহান আল্লাহ বলেন, - - - - - - - - - - - - - - - -

অর্থাৎ মহান আল্লাহ কেবল মোত্তাকী পরহেযগার লোকদের আমলই গ্রহণ করে থাকেন।

তাহলে এ সহজ- সরল আয়াতটি তোমার ভুল- ভ্রান্তি ধরিয়ে দেবার জন্য যথেষ্ট। তুমি তো নিজেই তোমার চারটি গুনাহের কথা স্বীকার করে নিয়েছো। অন্যের মাল সদকা- খয়রাতের নাম দিয়ে অপরকে দিয়ে দিয়েছো। এতে কোন সওয়াব হবে না। শুধু তাই নয়, বরং এ কাজের দ্বারা তুমি আরো চারটি গুনাহের পাত্র হয়েছো। অনুরূপভাবে তোমার পূর্বের চার গুনাহের সাথে আরও চার গুনাহ যোগ কর। এ হিসাবে তোমার আমল নামায় আটটি গুনাহ লেখা হয়েছে। এদিকে সওয়াবের নামে তুমি কিছুই হাসিল করোনি।[৭৫]

ইমামের এ কথাগুলো লোকটির চেহারায় বিস্ময়ের ছাপ এঁকে দিল। সে কিছুক্ষণ ইমামের দিকে তাকিয়ে থাকলো। এরপর ইমাম (আঃ) তাকে সেখানে রেখে বাড়ি চলে গেলেন।

ইমাম (আঃ) তার সাথীদের সামনে এ ঘটনা বর্ণনা করে বললেন, দ্বীনের ব্যাপারে এ ধরনের ব্যাখ্যা- বিশেষণ লোকদেরকে গোমরাহ বানিয়ে দেয় এবং অপর লোকদেরকেও সে পথভ্রষ্ট করে।

৬৫

যে কথায় আবু তালিব শক্ত (আঃ)ি পেলেন

রাসূলে আকরাম (সাঃ) নানা রকম বিপদ- মুসিবতের মধ্যে দিয়েও শৌর্য- বীর্যের সাথে কোরাইশ কাফের- মুশরিকদের মোকাবিলা করে যাচ্ছিলেন। অসংখ্য কঠিন সংকট ও দুরূহ পর্যায় অতিক্রম করেও তিনি আল্লাহর দ্বীনী মিশনের কাজ এগিয়ে নিয়ে চলেছিলেন। তিনি মূর্তিগুলোর অবমাননা ও তুচ্ছতা এবং মূর্তি পূজকদের অজ্ঞতা ও পথ- ভ্রষ্টতার কথা প্রকাশ করা থেকে বিরত হলেন না। কোরাইশের নেতাবর্গ তার ব্যাপারে অধৈর্য হয়ে পড়েছিল। তাই তারা একদিন জনাব আবু তালিব (আঃ)- এর কাছে এলো, তারা বললো, আপনি হয় নিজে আপনার ভাতিজাকে বিরত করুন অথবা কোরাইশের লোকদের অনুমতি দিন যে, তারা আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রকে সতর্ক করে দেবে। হযরত আবু তালিব (আঃ) তার খোশ আখলাক ও মধুর ভাষা দিয়ে বুঝিয়ে শুনিয়ে তাদেরকে নির্বাক করে দিলেন। এভাবে ধীরে ধীরে আল্লাহর দ্বীনের মিশন এগিয়ে যেতে থাকলো। ঘরে ঘরে নবী মুহাম্মদ (সাঃ)- এর চর্চা চলছিল। পরস্পর দুইজনের সাথে সাক্ষাত ঘটলে তাদেরকে বলাবলি করতে দেখা যেতো যে, লোকেরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে চলেছে। মোট কথা এমন কোন স্থান বাকি ছিল না যেখানে ইসলাম ও ইসলামের নবীর বিষয় নিয়ে আলাপ- আলোচনা হতো না। সুতরাং কোরাইশের নেতারা আবার জনাব আবু তালেবের সাথে সাক্ষাত করার সিদ্ধান্ত নিল। যাতে করে এ বিষয়ে বিস্তারিত ও কার্যকরী কথাবার্তা আলোচনা করা যায়।

কোরাইশের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ জনাব আবু তালিবের সাথে সাক্ষাত করে তাকে বললো, আমরা আগেও একবার বলেছি যে, আপনি আপনার ভাতিজাকে থামান। কিন্তু আপনি এ বিষয়ে কোন পদক্ষেপ নিলেন না। আমরাও আপনার উচ্চ মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এ পর্যন্ততার কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি করিনি। আর আমরা এ সিদ্ধান্তনিয়েছি যে, আপনার সাথে আলাপ- আলোচনা ব্যতীত কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করবো না। কিন্তু আজ আমরা আপনাকে এ কথা বলতে এসেছি যে, এখন থেকে আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রের কোন কর্মকাণ্ড আমরা বরদাশত করবো

না। কেননা সে আমাদের দেবদেবীগুলোর বিরুদ্ধে দোষ-ত্রুটি বলে বেড়ায়। সাথে সাথে আমাদেরকেও অজ্ঞ- জাহেল আখ্যায়িত করে আমাদের বিদ্রুপ করে। আর আমাদের বাপ-দাদাকেও পথভ্রষ্ট বলে সাব্যস্ত করে। এবারে আমরা কেবল চূড়ান্ত সতর্কতার সাথে এসেছি। যদি আগামীতেও আপনি তাকে রুখতে না পারেন তাহলে আমরা আপনার উচ্চ মর্যাদার কোনই সম্মান প্রদর্শন করবো না এবং আপনাদের দুইজনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ লড়াইয়ের মাধ্যমে এ বিষয়টির চূড়ান্ত ফয়সালা করে ফেলবো।

এ প্রকাশ্য হুমকিটি জনাব আবু তালিবের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ালো। এর পূর্বে তিনি কোরাইশদের নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে এ ধরনের হুমকির সম্মুখীন হননি। তিনি এ কথাও জানেন যে, তার মধ্যে এখন আর সে শক্তি নেই যে, তিনি তাদের মোকাবিলা করতে পারেন। সুতরাং যদি যুদ্ধের পরিস্থিতিই এসে যায় তাহলে প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্রসহ সমগ্র খান্দান ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

যা হোক, বিদ্যমান পরিস্থিতি ও পরিবেশের আলোকে তিনি মহানবী (সাঃ)-কে বললেন, দেখো ভাতিজা! পরিস্থিতি এরূপ দাঁড়িয়েছে। কাজেইও তুমি নীরবতা অবলম্বন করো। কেননা আমার ও তোমার উভয়ের জীবন এখন হুমকির সম্মুখীন।

রাসূলে আকরাম (সাঃ) বুঝতে পারলেন যে, কোরাইশের নেতাদের হুমকিতে তিনি প্রভাবান্বিত হয়েছেন। তাই তিনি শ্রদ্ধেয় চাচাকে জবাবে একটি কথাই বললেন যা শুনে জনাব আবু তালিবের মন থেকে কোরাইশপতিদের হুমকি দূর হয়ে গেল।

তিনি বললেন, চাচাজান! আমি আপনাকে শুধু এতটুকু জানিয়ে দিতে চাই যে, এরা যদি আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চন্দ্র এনে দেয় আর এর বিনিময়ে বলে যে, আমি লোকদেরকে আল্লাহর পথে দাওয়াত দেয়া থেকে বিরত থাকবো, তাহলেও আমি মহান খোদার এ দাওয়াতী মিশনের কাজ থেকে এক মুহূর্তের জন্যও সরে দাড়াবো না। যতক্ষণ না খোদার দ্বীন বিজয়ী না হবে, ততক্ষণ আমি আমার তৎপরতা পরিপূর্ণরূপে অব্যাহত রাখবো। যদি এ পথে আমার জীবন চলে যায় তাতেও পরোয়া করবো না।

এ কথাটি বলার সময় আল্লাহর নবীর চোখ দিয়ে অশ্রুগড়িয়ে পড়তে লাগলো। তখন তিনি চাচা আবু তালিবের কাছ থেকে উঠে চললেন। কয়েক কদম পথ চলার পর চাচা আবু তালিবের ডাকে ফিরে এলেন। আবু তালিব বললেন, যদি তাই হয় তাহলে তুমি যা ভালো মনে করো তাই করো। খোদার কসম! আমার জীবনের শেষ নিঃশ্বাসটি পর্যন্তআমি তোমার হেফাজত করে যাবো।[৭৬]

৬৬

বয়স্ক শিক্ষার্থী

সাক্কাকী একজন দক্ষ কারিগর ছিলেন। তিনি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক একটি দোয়াত তৈরি করলেন। যা বাদশাহর দরবারে পেশ করা যেতে পারে। তার আশা ছিল যে, বাদশাহ তার এ নিপুণ কারিগরি দক্ষতা দেখে এর প্রশংসা করে তাকে আরো উৎসাহিত করবেন। তাই তিনি অনেক আশা নিয়ে সে দোয়াতটি বাদশাহকে উপহার হিসাবে পেশ করলেন। প্রথমে বাদশাহ এর কারুকার্য দেখে খুব আকৃষ্ট হলেন। কিন্তু পরে এমন একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনার অবতারণা হলো যা সাক্কাকীর জীবনে এবং চিন্তায় একটা অসাধারণ পরিবর্তন এনে দেয়।

যখন সময় বাদশাহ সে সুন্দর দোয়াতটির কারিগরি নিপুণতা লক্ষ্য করছিলেন এবং সাক্কাকী নানাবিধ কল্পনার জগতে হারিয়ে গিয়েছিলেন, ঠিক সে সময় লোকেরা এসে দরবারে সংবাদ দিল, একজন বড় আলেম, সাহিত্যিক ও ফকীহ (ইসলামী আইনজ্ঞ) বাদশাহর দরবারে আসছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে আলেম ব্যক্তি দরবারে এসে হাজির হলেন। বাদশাহ তাকে স্বাগতম জানানো ও তার সাথে কথাবার্তায় এমনভাবে লিপ্ত হলেন যে, সাক্কাকী ও তার কর্ম নিপুণতার কথা বাদশাহর স্মৃতি জগত থেকে হারিয়ে গেল। এ দৃশ্য দেখে সাক্কাকীর মনে গভীর পরিবর্তন সূচিত হলো।

তিনি বুঝতে পারলেন যে, এখন আর বাদশাহর পক্ষ থেকে তাকে উৎসাহিত করার মতো অবস্থা অবশিষ্ট নেই। এ অবস্থায় শাহী দরবারে কোন কিছু প্রত্যাশা করা বাতুলতা মাত্র। কিন্তু সাক্কাকীর নিপুণ কর্মদক্ষতা তাকে নিরবে বসে থাকতে দিল না। তিনি ভাবতে লাগলেন যে, এখন তিনি কি করবেন? তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, এখন আমাকে সে কাজটিই করতে হবে যা অন্যরা করেছেন। আমাকেও সে পন্থাই অবলম্বন করতে হবে যা এ পর্যন্ত অন্যরা অবলম্বন করে কৃতকার্য হয়েছেন। তাই তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, আমি আমার সমস্ত আশা- আকাঙ্খা জ্ঞান- গরিমা বই- পুস্তকের পাঠের মাধ্যমে সন্ধান করবো। কিন্তু এমন একজন বয়স্ক লোকের পক্ষে যিনি তার

জীবনের যৌবন অংশটা অন্যান্য কাজে ব্যয় করেছেন, এখন ছোট ছোট শিশুদের সাথে লেখাপড়া করাটা সহজ ব্যাপার ছিল না। তথাপিও তিনি তার সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন। তখন এ ছাড়া তার জন্য বিকল্প কোন উপায়ও ছিল না। মাছ যখনই পানি থেকে তোলা হয় তখন তা তাজা থাকে।

কিন্তু সবচেয়ে বেশী অসুবিধার ব্যাপার ছিল এটা যে, প্রথম তার অন্তরে লেখাপড়ার প্রতি আন্তরিক আগ্রহ লক্ষ্য করলো না। হয়তো দীর্ঘকাল পর্যন্ত কারিগরি শিল্পে লিপ্ত থাকার কারণে তার শিক্ষা ও সাহিত্য ক্ষেত্রে একটা স্থবিরতা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। তথাপিও তার বার্ধক্য ও যোগ্যতার স্বল্পতা তার সিদ্ধান্তের পথে বাধা হয়ে দাড়াতেঁ পারেনি। তিনি অত্যন্ত আগ্রহ- উদ্দীপনা নিয়ে লেখাপড়ায় মনোযোগ দিলেন। এ সময় একটা ঘটনা ঘটলো :

শাফেঈ ফেকাহ- এর ওস্তাদ তাকে এ মাসআলাটি শিখিয়েছিলেন যে, ওস্তাদের আকীদা- বিশ্বাস হচ্ছে যে, কুকুরের চামড়া পরিষ্কার- পরিচ্ছন্ন ও পাকা করার পর তা পবিত্র হয়ে যায়। সাক্কাকী এ কথাটি কমপক্ষে দশবার পড়ে মুখস্থ করেছেন। যাতে করে পরীক্ষায় আসলে সঠিকভাবে লিখে পরীক্ষায় ভালো নম্বর লাভ করতে পারেন। কিন্তু পরীক্ষার সময় যখন তাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে তখন তিনি জবাবে বললেন, কুকুরের আকীদা- বিশ্বাস হচ্ছে যে, ওস্তাদের চামড়া পরিষ্কার- পরিচ্ছন্ন ও পাকা করার পর তা পাক হয়ে যায়।

তার উত্তর শুনে উপস্থিত সকলেই হাসতে লাগলো। সকলেই ভাবতে লাগলো যে, বৃদ্ধ মানুষের মধ্যে লেখাপড়ার কোন যোগ্যতা নেই। এ ঘটনার পর সাক্কাকী সে মাদ্রাসা ছেড়েই শুধু চলে যাননি, বরং সে শহর ছেড়ে জঙ্গলের দিকে চলে গেলেন। ঘটনাক্রমে তিনি এমন একটি পাহাড়ের পাদদেশে গিয়ে উপস্থিত হলেন যেখানে তিনি দেখতে পেলেন যে, একটি পাথরের উপর ফোঁটা ফোঁটা করে উপর থেকে পানি পড়ছে। আর এ ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়ার কারণে এ শক্ত পাথরটিতেও একটি ছিদ্র সৃষ্টি হয়েছে। বেশ কিছুক্ষণ তিনি বিষয়টি নিয়ে ভাবলেন। ব্যাপারটি তার অন্তরে একটি বিরাট প্রভাব বিস্তার করলোতিনি বললেন, আমার মন লেখাপড়ারি প্র ত যদিও অনরক্ত নয় কিন্তু সেটা পাথরের মতো তো আর শক্ত নয়। কাজেই এটা ঠিক নয় যে,

আমি রীতিমত পরিশ্রম করে লেখাপড়া করবো আর আমার জ্ঞান হাসিল হবে না। এ কথা ভেবেই তিনি আবার লেখাপড়ায় ফিরে গেলেন এবং জ্ঞান অর্জনের কাজে পূর্ণাঙ্গরূপে আত্মনিয়োগ করলেন। যার ফলে দেখা গেল অল্প কিছুদিন পর তিনি সে কালের নামকরা সাহিত্যিকদের মধ্যে অন্যতম একজন হলেন।[৭৭]

৬৭

উদ্ভিদ বিশেষজ্ঞ

সার্ল- ডু- লিনা এর শিক্ষকমণ্ডলী তার ব্যাপারে একেবারে নিরাশ ও হতাশ হয়ে সকলে মিলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, তার পিতার কাছে, যিনি ছিলেন শহরের পাদ্রী, প্রস্তাব রাখবেন যে, তিনি যেন তার ছেলেকে হস্তশিল্প ইত্যাদি কাজের প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করেন। কেননা তার মধ্যে লেখাপড়ার কোনো যোগ্যতা নেই। লেখাপড়া শেখার আশায় সময় নষ্ট করা একেবারে নিস্ফল। অতএব বেকার সময় নষ্ট করার চাইতে উত্তম কাজ হচ্ছে এটাই যে, এ সময়ে সে অন্য কোনো একটা ভালো কাজ শিখুক।

শিক্ষকমণ্ডলীর কথাবার্তা শুনে লিনার পিতামাতার মন খুব খারাপ হয়ে গেল। তাদের বড় আশা ছিল যে, তাদের ছেলে লেখাপড়া করে একজন নামকরা বিজ্ঞ ব্যক্তি হবে। তাই তারা এ হতাশা- নিরাশার মধ্যেও তাদের ছেলেকে চিকিৎসাশাস্ত্রে জ্ঞান অর্জন করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়ে দেন। কিন্তু ক্ষমতার অভাবে তার লেখাপড়ার খরচ বাবদ তাকে খুব কম টাকা- পয়সাই দিয়েছিল, যার ফল এ দাঁড়ালো যে, যদি তার এক বন্ধু তাকে এ ক্ষেত্রে সাহায্য না করতো তাহলে তাকে বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে না খেয়ে মরতে হতো। লিনার পিতা- মাতার পছন্দ চিকিৎসাশাস্ত্রের ব্যাপারে তার মোটেও আগ্রহ ছিল না। বরং উদ্ভিদশাস্ত্রে তার ছিল বেশী ঝোঁক। শিশুকাল থেকেই সে ঘাস- পাতা ইত্যাদি খুব বেশি ভালোবাসে। তার এ অভ্যাস তার পিতার কাছ থেকে প্রাপ্ত। তার পিতার বাগানটি ছিল নানা রকম সুন্দর সুন্দর চারাগাছ ও লতা- পাতায় ভরপুর। লিনার যখন শিশু বয়স তখন সে যদি কান্নাকাটি করতো, তার মা তাকে বাগানে নিয়ে গিয়ে শান্ত্বনা দেবার জন্য তার হাতে একটি সুন্দর ফুল তুলে দিতেন। এতে লিনা সে সুন্দর ফুলটি হাতে নিয়ে খুব খুশি হতো।

সে যখন মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাশাস্ত্রে অধ্যয়ন করছিল তখন ফ্রান্সের প্রখ্যাত উদ্ভিদ বিজ্ঞানীর একটি বই হাতে পেয়েছিল। বইটি পড়ে গাছপালা, তরুলতা, পত্র- পল্লব অর্থাৎ

উদ্ভিদ সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞান অর্জনের স্পৃহা তার মধ্যে জেগে উঠলো। সে সময়ে উদ্ভিদ বিশেষজ্ঞদের সামনে উদ্ভিদের শ্রেণী বিন্যাসের বিষয়টি খবু জোরেশোরে আলোচনা চলছিল। এ বিজ্ঞানে বিশেষ ঝোঁক প্রবণতা থাকার কারণে লিনা উদ্ভিদের নর- মাদীর ভিত্তিতে এক বিশেষ শ্রেণী বিন্যাস নিরূপণের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণরূপে সফলতা অর্জন করে। তাই সে এ বিষয়ে একটি বিরাট গ্রন্থ্ রচনা করে যা সেকালের উদ্ভিদ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটা বিরাট অবদান রেখেছিল এবং অত্যন্তখ্যাতি অর্জন করেছিল। তার সে গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার পর মেডিকেল কলেজের কর্তৃপক্ষ ভাবতে লাগলেন যে, লিনাকে তার গবেষণা- কার্যে সহযোগিতা করার জন্য কলেজের পক্ষ থেকে তাকে সার্বিক সুযোগ- সুবিধা প্রদান করা হবে। কিন্তু অন্য কিছু লোকের প্রতিহিংসার কারণে এ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে পারেনি।

লিনা তার সফলতার সিঁড়ি অতিক্রম করে শীর্ষে উপনীত হলো। সে তার জীবনে প্রথম বারের মতো সফলতা অর্জন করার স্বাদ আস্বাদন করলো। কিন্তু তার এ সফলতার বিশেষ গুরুত্ব সে অনুধাবন করতে পারেনি। সে এ উদ্ভিদ জগতে নতুন নতুন আবিষ্কার উদ্ভাবনের কাজে নিজেকে পুরোদমে আত্মনিয়োগ করলো। কিছুদিন পর সে চিকিৎসাশাস্ত্রে অধিক দক্ষতা অর্জনের জন্য এক দীর্ঘ সফরের উদ্দেশ্যে যাত্রার প্রস্তুতি গ্রহণ করলো। সফর সামগ্রী হিসেবে একটি বাক্স, কিছু কাপড়- চোপড়, একটা ক্যামেরা ও কিছু কাগজপত্র নিজের সঙ্গে নিল। তারপর পদব্রজে সফর শুরুকরলো। সে সীমাহীন কষ্ট- ক্লেশ স্বীকার করে প্রায় সাত হাজার কিলোমিটার রাস্তা ভ্রমণ করেছে। এ সফরে সে নানাবিধ মূল্যবান জ্ঞান- বিজ্ঞান ও অসামান্য অভিজ্ঞতার এক অমূল্য ধনভাণ্ডার সাথে নিয়ে দেশে ফিরেছে। প্রায় তিন বছর পর ১৭৩৫ সালে দেশের অবস্থা- পরিবেশ প্রতিকূল হওয়ার কারণে সে সুইডেন থেকে হামবুর্গ চলে গেল। এ সফরে লিনা অনেক দুর্লভ বস্তু সংগ্রহ করেছিল। তাই সে এ বস্তুগুলো হামবুর্গের যাদুঘরের পরিচালককে দেখিয়েছিল। এ জিনিসগুলোর মধ্যে নীল রংয়ের একটি সাপও ছিল যার মাথা ছিল সাতটি। সাপটির সাতটি মাথাই ছিল একই ধরনের। যাদুঘর কর্তৃপক্ষ বিষয়টি প্রধান বিচারপতিকে অবহিত করলেন। বিচারপতি লিনার আগমনের ব্যাপারটিকে কুলক্ষণ ধারণা পোষণ করে খুবই অসন্তুষ্ট হলেন এবং

তাকে শহর থেকে বের করে দেয়ার জন্য নির্দেশ জারী করলেন। এর পরও সে তার সফর অব্যাহত রাখলো। এ সফরের মধ্যেই সে তার চিকিৎসা শাস্ত্রের ডাক্তারীর সনদ হাসিল করার জন্য নিজের গবেষণা প্রবন্ধ তৈরি করে নিল। এ পর্যায়ে সে তার রচিত বিরাট গ্রন্থ 'প্রকৃতির শক্তি' তার সফরকালেই লীদন শহর থেকে প্রকাশ করলো। এ গ্রন্থ প্রকাশের ফলে তার অসাধারণ খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অর্জিত হলো। এর ফলে আমস্টারডামের এক ধনাঢ্য ব্যবসায়ী তার সামনে একটি প্রস্তাব রাখলো, আমি আপনার জন্য একটি বিরাট ও সুন্দর বাগানের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, যেখানে বসে আপনি ব্যাপক গবেষণা কার্য চালাতে পারেন। সে এ কথা মেনে নিল এবং নিজের একজন সহকারীকে সাথে নিয়ে সে বাগানে বসে তার জ্ঞান- বিজ্ঞানের গবেষণা- কার্য শুরুকরে দিল। এরপর সে ফ্রান্সেও ভ্রমণ করেছে। সেখানে সে মাউদন নামক জঙ্গল থেকে নানা প্রকার উদ্ভিদের নমুনা সংগ্রহ করেছে। অবশেষে লিনা বিদেশ- বিভূঁইয়ে কষ্টের কারণে এবং নিজের মাতৃভূমির ভালোবাসায় অনুরক্ত হয়ে সুইডেনে ফিরে আসে। এবার তার দেশবাসীরা তার বিশ্বব্যাপী খ্যাতি ও জনপ্রিয়তার কারণে তাকে এক অসাধারণ সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করলো। তাকে তার কাজের জন্য যাবতীয় সুযোগ- সুবিধা সহজ করে দিল। এটাই তার সে মাতৃভূমি- যেখানে তার শিক্ষকরা তাকে শিক্ষা দানে অপারগতা প্রকাশ করেছিলেন।[৭৮]

৬৮

বক্তা

ডুমুসটেন্স প্রাচীন গ্রীসের একজন বিখ্যাত বক্তা ও রাজনীতিক ছিলেন। তিনি প্রখ্যাত দাশনির্ক এরিস্টোটলের সাথে একই বছরে জন্মগ্রহণ এবং একই বছরে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার কিছুদিন পূর্বে একটা বক্তৃতার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এ বক্তৃতা দ্বারা তার উদ্দেশ্য কেবল এটাই ছিল না যে, তিনি লোকদের উপর তার জ্ঞানের প্রভাব বিস্তার করবেন। তিনি তার এ বক্তৃতা দ্বারা এটাও প্রমাণ করতে চাননি যে, তিনি আদালতের দরবারে দাঁড়িয়ে ওকালতির কাজ পরিচালনার ব্যাপারে যোগ্যতার অধিকারী। বরং তিনি তার বক্তৃতার মাধ্যমে সে সমস্তলোকের বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ করতে চাচ্ছিলেন, যারা তার শিশুকালে পিতার পরিত্যক্ত বিরাট সম্পত্তি দখল করে নিয়েছিল। অথচ তারা তার পিতার ওসী ছিল ও আর তার অভিভাবক ছিল।

প্রথমে তিনি সম্ভাব্য সকল চেষ্টাই করেছিলেন। কিন্তু পৈত্রিক সম্পত্তি কোন কিছুই হস্তগত করতে সক্ষম হননি। তাতে তিনি এ আমানতের খেয়ানতের বিষয়টি জনসাধারণের সামনে আলোচনা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। প্রথম প্রথম তার বক্তৃতায় লোকদের অন্তর জয় করতে পারেননি। এ কারণে লোকেরা তাকে একটু সাহস যোগানোর বদলে তার বক্তৃতার খুঁত বের করতে লাগলো। কেউ কেউ তার বিষয়বস্তুর ভুল- ভ্রান্তিতুলে ধরতো। আবার কেউ তার বাচনভঙ্গীর দোষক্রটি বের করতো। কিন্তু এতোসব প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও তিনি তার অসাধারণ যোগ্যতা, পরিশ্রম এবং বন্ধু- বান্ধবদের অনুপ্রেরণায় উৎসাহিত হয়ে এ জাতীয় সকল দুর্বলতা সম্পূর্ণরূপে দূর করলেন। তিনি নির্জন একটি স্থান বেছে নিলেন এবং সেখানে একাকী বক্তৃতার অনুশীলন শুরু করলেন। তিনি তার ভাষার ক্রটিকে দূর করার জন্য মুখের মধ্যে নুড়ি রেখে অত্যন্ত উচ্চস্বরে কবিতা আবত্তি করতেন। যাতে করে তার আওয়াজ ভাল হয়ে যায়। তিনি তার শ্বাসকে দীর্ঘ ও শক্তিশালী করার জন্য বড় বড় কবিতাগুলোকে উচ্চস্বরে পাঠ করতেন। অধিকাংশ সময় তিনি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বক্তৃতার অনুশীলনও করতেন। যাতে করে নিজেই নিজের বক্তৃতার সময়কালীন মুখের

বিভিন্ন আকৃতি ও ভঙ্গিমার চিত্রগুলো দেখে অনুমান করতে পারেন। আর তাতে যেনো তার ভয়-ভীতি দূর হয়ে যায়। যা হোক এভাবে শ্রম- সাধনা ও আগ্রহ- উদ্দীপনার দ্বারা বক্তৃতার ময়দানে অত্যন্ত উন্নিত করেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই তিনি বিশ্বের একজন নামকরা বক্তারূপে পরিগণিত হতে লাগলেন।[৭৯]

৬৯

তায়েফ সফরের ফল

রাসূলে আকরাম (সাঃ)- এর চাচা জনাব আবু তালিব (আঃ) ও স্ত্রী হযরত খাদিজা বিনতে খোয়াইলেদ অল্প দিনের ব্যবধানে দুইজনই এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। এভাবে আল্লাহর নবী (সাঃ) এমন একজন চাচার স্নেহ- মায়া থেকে বঞ্চিত হলেন যিনি বাইরের সমস্তবিপদ প্রতিহত করতেন এবং তাকে রক্ষা করতেন। এর অল্প কিছুদিন পরেই তার জীবন সঙ্গিনী হযরত খাদিজা (আঃ)- কে হারালেন। যিনি ঘরের অভ্যন্তরে তার আত্মার প্রশান্তি যোগাতেন।

হযরত আবু তালিবের মৃত্যুতে রাসূল (সাঃ) খুবই দুঃখ ভারাক্রান্ত হলেন। তার মৃত্যুর কারণে কোরাইশ কাফেররা আল্লাহর নবীকে নানাভাবে কষ্ট দেবার এবং উত্যক্ত করার সুযোগ পেয়ে যায়। তাই তারা ইসলাম প্রচারের পথে সম্ভাব্য সব রকমের বাধা সৃষ্টি করতে লাগলো। জনাব আবু তালিবের মৃত্যু হয়েছে বেশী দিন হয়নি, এমন সময় একদিন মহানবী (সাঃ) রাস্তা দিয়ে পথ চলছিলেন, তখন লোকেরা রাসূলের মাথার উপর নোংরা- ময়লা নিক্ষেপ করলো। এতে তাঁর সমস্ত দেহ ধুলা- বালি- ময়লায় ভরে গেল। এ অবস্থায় তিনি বাড়ি ফিরে আসলেন। এ সময় তার প্রিয় কন্যা হযরত ফাতিমা যাহরা (রাঃ) দৌঁড়ে কাছে এলেন এবং পিতার মাথা ও দেহ থেকে ময়লাগুলো সাফ করতে লাগলেন। রাসূল (সাঃ) লক্ষ্য করে দেখলেন যে, প্রাণপ্রিয় কন্যা ফাতিমার দুইচোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছে। তিনি বললেন, মা আমার! কেঁদো না! আর খুব বেশী দুঃখও করো না। তোমার আব্বা একা নন। বরং মহান আল্লাহ তার সহায় আছেন।

এ ঘটনার পর একদিন আল্লাহর নবী (সাঃ) ইসলাম প্রচারের কাজে মক্কা নগরী থেকে একা একা বের হলেন। ছাকীফ কাবিলার মাঝে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য তিনি তায়েফের দিকে চললেন। তায়েফ ভালো আবহাওয়া ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশের স্থান হিসেবে পরিচিত। মক্কার ধনী লোকেরা এখানে ভ্রমণের জন্য আসা- যাওয়া করে থাকে।

তায়েফের লোকদের ব্যাপারে তেমন কোনো আশাপ্রদ অবস্থা ছিল না। তাদের ধ্যান- ধারণাও ঠিক তেমনি ছিল যেমনটি ছিল কা'বা ঘরের আশপাশে বসবাসকারী মক্কার অন্যান্য অধিবাসীদের। এখানকার লোকেরাও মূর্তিপূজার ছায়াতলে থেকে আরাম- আয়েশের জীবন যাপনে বিশ্বাসী ছিল। কিন্তু রাসূলে আকরাম (সাঃ) নিঃরাশ ও হতাশ হবার পাত্র ছিলেন না। তিনি এ সমস্তকষ্ট- ক্লেশের ব্যাপারে বরাবর চিন্তা- ভাবনা করতেন। শুধু তাই নয় বরং তিনি লোকদের অন্তর জয় করার জন্য বড়ো থেকে বড়ো কঠোর বিপদাপদের মোকাবিলা করতেও সব সময় প্রস্তুত থাকতেন।

তিনি তায়েফ নগরীতে গেলেন। তায়েফবাসীদের কাছ থেকেও সে সব কথাবার্তাই শুনলেন যা অধিকাংশ সময় মক্কাবাসীদের কাছ থেকে শুনতে পেতেন। একজন বললো, জগতে কি আর কোনো লোক ছিল না যে, মহান আল্লাহ তোমাকেই নবী বানিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। আরেকজন বললো, কা'বা ঘরের গিলাফের কসম করে বলছি তুমি আল্লাহর নবী নও। অপর এক ব্যক্তি তাকে বললো, আমি তোমার সাথে কোনো কথা বলতে আদৌ প্রস্তুত নই। মোটকথা তায়েফের লোকেরা এভাবে রাসূলের মন ভেঙ্গে দেয়ার মত জবাব দিতে আরম্ভ করলো।

এক কথায় বলা যায় যে, তায়েফের লোকেরা রাসূলে খোদা (সাঃ)- এর দাওয়াতে মোটেও সাড়া দিল না। শুধু তাই নয় বরং তারা শহরের গুণ্ডা- পাণ্ডাদের লেলিয়ে দিয়ে বললো, একে শহর থেকে বের করে দাও। আবার এমনটি না হয়ে যায় যে, সহজ- সরল লোকেরা তার দাওয়াতের শিকারে পরিণত হয়ে যায়। সুতরাং তারা আল্লাহর নবীর উপর পাথর নিক্ষেপ করতে লাগলো। তার সাথে সাথে নানা রকম গালিও দিতে থাকলো। এভাবে মারাত্মকভাবে আহত করে রাসূল (সাঃ) কে শহর থেকে বের করে দিল। আহত ও যখমপ্রাপ্ত হয়ে মহানবী (সাঃ) শহরের বাইরে একটি বাগানে চলে গেলেন। এ বাগানটি ছিল কোরাইশের ওতবা ও শাইবা নামক দুইজন ধনী ব্যবসায়ীর। ঘটনাক্রমে বাগানের মালিক দুইজনও তখন বাগানে উপস্থিত ছিল। তারা দূর থেকে দাঁড়িয়ে রাসূলের সাথে কৃত এ দৃশ্যাবলী প্রত্যক্ষ করছিল। আল্লাহর নবীর এ অবস্থা দেখে তারা খুব খুশী হলো।

কিছুক্ষণ পর তায়েফের পাষণ্ডরা ফিরে চলে গেল। মহানবী (সাঃ) ওতবা ও শাইবার থেকে দূরে এক স্থানে গাছতলায় বসে গেলেন। তিনি ছিলেন একেবারে একা। কেবলমাত্র তার প্রভুই তাঁর সাথে ছিলেন। সুতরাং তিনি মহান আল্লাহর কাছে নিজের মনের সমস্তভেদ খুলে বলতে লাগলেন। তিনি বললেন, হে আমার মালিক আল্লাহ! তোমার দরবারে আমার দুর্বলতা ও শক্তিহীনতার ফরিয়াদ জানাই, এ জনপদের লোকদের দুর্ব্যবহার ও কষ্ট দেয়ার অভিযোগ জানাই। এরা আমার পথে অসংখ্য বাধা- বিপত্তি সৃষ্টি করেছে। হে পরম দয়ালু খোদা! তুমিই নিঃস্ব- অসহায় লোকদের প্রভু। তুমিই আমারি প্রতিপালক। তুমি আমাকে কোন সমাজে ছেড়ে দিয়েছো? এরা আমাকে আহত করছে। আমার সাথে অচেনা- অজানা অনাত্মীয়দের মতো আচরণ করছে। তুমি কি দুশমনকে আমার উপর প্রাধান্য দান করছো? হে বিশ্ব জাহানের মালিক! আমি খুব ভালোভাবে জানি যে, আমার উপর যে সব জুলুম- অত্যাচার চাপানো হচ্ছে, আমি তার যোগ্য পাত্র নই। তবুও সর্বাবস্থায় তোমার সন্তুষ্টি বিধানই আমার কাম্য। তুমি যদি আমার প্রতি রাজী থাকো, তাহলে এসব কিছুকে আমি মোটেও পরোয়া করবো না। আমি তোমার মহান নূরের সে ছায়াতলে আশ্রয় চাচ্ছি, যা সমগ্র বিশ্বের অন্ধকারকে বিদূরিত করেছে এবং অন্ধকার পৃথিবী উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হয়ে গেছে। তোমারই নির্দেশে ইহকাল ও পরকালের সব কিছু সন্নিবেশিত হয়েছে। তুমি যদি তোমার পক্ষ থেকে আমার উপর আযাব নাযিল করো তাতেও আমি তোমার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত সব কিছুকে নত শিরে গ্রহণ করে নিতে প্রস্তুত রয়েছি। প্রতিনিয়ত আমার চেষ্টা- সাধনা কেবল এটাই যে, তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকো। নিখিল জাহানে তোমার চেয়ে বড় শক্তিশালী আর কেউ নেই। তুমিই সমস্তসৃষ্টির উপর ক্ষমতাবান।

বাগানের মালিক ওতবা ও শাইবা রাসূলে আকরাম (সাঃ)- এর এ অবস্থা দেখে খুশী হয়েছিল ঠিকই। কিছু আত্মীয়ের বিবেচনায় তারা তাদের গোলাম আদ্দাসকে হুকুম দিল, কিছু আঙ্গুর নিয়ে গিয়ে ঐ লোকটির সামনে রেখে দাও। তারা খৃস্টধর্মে বিশ্বাসী সে গোলামটিকে আরো বলে দিল, আঙ্গুর দিয়ে সাথে সাথেই সেখান থেকে চলে আসবে।

আদ্দাস আঙ্গুর নিয়ে বিশ্বনবীর কাছে এলো এবং আঙ্গুর সামনে রেখে দিয়ে বললো, এগুলো খেয়ে নিন। রাসূলে আকরাম (সাঃ) আঙ্গুর হাতে নিলেন এবং খাবার আগে বললেন, আল্লাহর নামে।

আদ্দাস এর আগে কখনোও এ কথা শুনেনি। জীবনে প্রথম বারের মতো সে এ ধরনের কথা শুনতে পেলো। সে রাসূলের মুখের দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে বললো, এ কথা তো এখানকার লোকদের প্রচলিত কথা নয়। আমি তো এ এলাকার লোকদের মুখে এ জাতীয় কথা কোনোদিন শুনতে পাইনি। আপনি এটা কি কথা বললেন?

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বললেন, হে আদ্দাস! তুমি কোথাকার অধিবাসী? তোমার ধর্ম কি?

জবাবে সে বললো, মূলত আমি নাইনেওয়ার অধিবাসী। আর আমি খৃস্ট ধর্মে বিশ্বাসী।

রাসূল (সাঃ) বললেন, তুমি নাইনেওয়াবাসী অর্থাৎ ইউনুস বিন মাত্তা- এর মতো খোদার নেক বান্দার দেশ?

সে বললো, আমি হতবাক হচ্ছি! আমি বুঝতে পারছি না যে, ইউনুস বিন মাত্তা- এর নাম আপনি কি করে জানালেন? যে সময় আমি নাইনেওয়াতে বসবাস করতাম সেখানে তখন এমন দশজন লোকও ছিল না যারা ইউনূসের মা- বাবার নাম জানতো। আমার আশ্চর্য লাগছে যে, আপনি কি করে তার নাম জানলেন?

মহানবী (সাঃ) বললেন, ইউনুস আমার ভাই! তিনি ছিলেন আল্লাহর নবী। আমিও আল্লাহর নবী।

ওতবা ও শাইবা দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখছিল যে, আদ্দাস আলাপ- আলোচনায় লিপ্ত। তারা অস্থির হয়ে গেল। বরাবরই তাদের চেষ্টা- তদবির এটাই থাকতো যে, কোনো লোক যেন নবীর সাথে দেখা- সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা বলতে না পারে। তারা খুব ভালোভাবে জানতো যে, অল্প কিছু সময় আলাপ- আলোচনা করার পরই লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করে নেয়। যা হোক তারা যা ভেবেছিল তাই বাস্তবে রূপ নিয়েছে। হঠাৎ তারা দেখতে পেলো যে, আদ্দাস মাটিতে লুটিয়ে পড়ে রাসূলে আকরাম (সাঃ)- এর হাত- পায়ে চুম্বন করতে লাগলো। তারা একজন আরেকজনকে উদ্দেশ্য করে বললো, দেখলে এ গোলামটিকেও সে পথভ্রষ্ট করেছে।[৮০]

৭০

আবু ইসহাক সাবী

আবু ইসহাক সাবী চতুর্থ হিজরী শতাব্দীর একজন খ্যাতানাম বিজ্ঞ পন্ডিত। তিনি কিছুদিন আব্বাসীয় খলিফার দরবারে এবং একটা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ইযযুদ্দৌলা বখতিয়ার আলে বুইয়ার দরবারে চাকরি করতেন। আবু ইসহাক সাবী যে খান্দানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সে বংশের লোকেরা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী ছিল। কিন্তু নবুয়্যতে ছিল তারা অবিশ্বাসী। ইযযুদ্দৌলার আপ্রাণ চেষ্টা ছিল যে, আবু ইসহাক ইসলাম গ্রহণ করুক। কিন্তু তিনি তার প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হন। আবু ইসহাক রমযান মাসে মুসলমানদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে রোযাও রাখতেন। পবিত্র কোরআন মজীদও তার মুখস্থ ছিল। তিনি তার চিঠিপত্র ও অন্যান্য লিপিপত্রে কোরআনের আয়াতের উদ্ধৃতির উল্লেখ করতেন।

আবু ইসহাক একজন বিজ্ঞ সাহিত্যিক ও নামকরা কবি ছিলেন। তার সময়ে সম্মানের উচ্চাসনে সমাসীন এবং কালের শ্রেষ্ঠ কবি সাইয়্যেদ শরীফ রাজীর সাথে তার গভীর বন্ধুত্ব ছিল। ৩৮৪ হিজরী সালে আবু ইসহাক মৃত্যুবরণ করেন। সাইয়্যেদ রাজী তার এ প্রিয় বন্ধুর মৃত্যুতে সমবেদনা জ্ঞাপন করে একটি শোকগাঁথা রচনা করেছেন যার বিষয়বস্তু হলো এই :

* তোমরা কি দেখেছো, কতো উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের মৃত্যু ঘটেছে? তোমরা কি প্রত্যক্ষ করেছো, কিভাবে স্তব্ধ হয়ে গেছে জলসা মাহফিলের মোমবাতিটি?

* এমন এক হিমাদ্রি লুটিয়ে পড়েছে ভুতলে, এ ভার-ভারিক্কি পাহাড় যদি সমুদ্রে নিপতিত হতো, তাহলে সমুদ্র উঁপচে উঠতো আর তার উপরিভাগ কানায় কানায় ভরে যেতো।

* তোমার মৃত্যুর আগে আমার বিশ্বাস জগতে কখনও এ কথা স্থান করে নিতে পারেনি যে, মাটি তোমার মত এক মহাপর্বতকেও তার অভ্যন্তরে লুকিয়ে নিতে পারে।[৮১]

এরপর কিছু সংখ্যক ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্ন লোক সাইয়্যেদ রাজীকে তিরস্কার করে বলতে লাগলো, আপনার ন্যায় একজন রাসূল সন্তানের পক্ষে কখনো সঙ্গত হয়নি যে, সাবীর মতো একজন

বিধর্মী লোকের মৃত্যুতে শোকগাঁথা লিখে দুঃখ প্রকাশ করা। সাবী যেখানে ইসলামকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে।

জবাবে সাইয়্যেদ রাজী বললেন, আমি আবু ইসহাক সাবীর শোকগাঁথা তার জ্ঞান ও মর্যাদার প্রতি দৃষ্টি রেখে লিখেছি, বরং বস্তুত পক্ষে আমার এ শোকগাঁথা তার জ্ঞান ও মর্যাদার প্রতিই নিবেদিত।[৮২]

৭১

সত্যের সন্ধানে

ওনওয়ান বসরী সত্যের সন্ধানে সব সময় লেগে থাকতো। তার যথাসাধ্য চেষ্টা- প্রচেষ্টা এটাই যে, ইয়াক্বীনের সর্বশেষ প্রান্তসীমায় পৌঁছে যাবে। (ইয়াক্বীনের অবস্থা হচ্ছে আধ্যাত্মিক জগতে পরিভ্রমণ করে ঈমানের চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হওয়া)।

একবার সে সফরের কষ্ট- ক্লেশ সহ্য করে মদীনায় গিয়ে উপস্থিত হলো। সে সময় মদীনা ছিল ইসলাম প্রচারের প্রাণকেন্দ্র। সব সময় ফকীহ ও মুহাদ্দেসগণের ভীড় লেগে থাকতো। মদীনায় পৌঁছে সে তৎকালীন বিখ্যাত ফকীহ ও মুহাদ্দিস মালিক ইবনে আনাসের শিষ্যদের অন্তর্ভুক্ত হলো।

প্রচলিত নিয়ম মাফিক মালিক ইবনে আনাসের এখানে রাসূলে আকরাম (সাঃ)- এর হাদীসসমূহ সংগ্রহ ও জমা করার ধারা অব্যাহত ছিল। অন্যদের মতো ওনওয়ান বসরীও রাসূলের হাদীস লেখা পড়ার কাজ শুরুকরে দিল। এখানে সমস্ত শিক্ষার্থীকেই হাদীসের শিক্ষা দান করা হতো। সাথে সাথে তাদেরকে এটাও শিক্ষা দেয়া হতো যে, হাদীসের সনদ কিভাবে নির্ণয় করা যায়।

ওনওয়ান বসরীর অন্তরে পূর্ব থেকেই সত্য সন্ধানের আগ্রহ বর্তমান ছিল। সুতরাং এ কাজে সে আত্মতৃপ্তি লাভ করলো এবং অত্যন্ত তুষ্টচিত্তে অনুসন্ধান কর্মের দ্বারা আত্মার খোরাক সংগ্রহ করতে থাকলো। সে সময় হযরত ইমাম জা’ফর সাদিক (আঃ) মদীনায় উপস্থিত ছিলেন না। কিছুদিন পর তিনি মদীনায় ফিরে এলেন। ওনওয়ানের অন্তরে এ চিন্তা জাগলো যে, সে কিছুদিন ইমাম জা’ফর সাদিক (আঃ)- এর শিষ্যত্বও গ্রহণ করবে। তাই সে মালিক ইবনে আনাসের দরবার ত্যাগ করে ইমাম সাদিক (আঃ)- এর খেদমতে চলে গেল।

কিন্তু ইমাম (আঃ) তার আগ্রহের মধ্যে আরো তীব্রতা আনয়নের জন্য কিছুদিন পর্যন্ত তার থেকে এড়িয়ে চললেন। একদিন ইমাম (আঃ) তার আবেদনের জবাবে বললেন, আমি অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ। আমার একেবারেই অবসর নেই। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত শিক্ষা- দীক্ষার ধারা অব্যাহত

রাখতে হয়। আমার কাছে এতটুকুন সময় নেই যে, আমি তোমার আশা পূরণ করবো। অতএব তুমি আগের মতোই মালিক ইবনে আনাসের শিক্ষাঙ্গনেই ফিরে যাও। আমি এখন তোমাকে শিক্ষা দানে অপারগ। আমার কাছে সময় থাকলে আমি অবশ্যই তোমার মনোবাঞ্ছা পূরণ করার চেষ্টা করতাম।

ইমামের জবাব শুনে সে খুবই দুঃখিত হলো। আর নিজেকে তিরস্কার করতে লাগলো। সে বললো, যদি আমার মধ্যে যোগ্যতা ও সামর্থ্য থাকতো তাহলে নিশ্চয়ই ইমাম আমার আবেদন গ্রহণ করে নিতেন। তাই সে ভারাক্রান্তমনে মসজিদে নববীতে চলে গেল। নবীর রওজায় সালাম নিবেদন করে বাড়ীর দিকে চলে গেল। তার চোখে- মুখে ছিল বেদনা- ব্যথা ও দুঃখের ছাপ।

দ্বিতীয় দিন সে বাড়ি থেকে বের হয়ে সোজা চলে গেল রাসূলে আকরাম (সাঃ)- এর রওজা শরীফে। সেখানে গিয়ে সে দুই রাকাত নামায আদায় করে মহান আল্লাহর দরবারে দুই হাত তুলে কান্নাকাটি করে ফরিয়াদ জানাতে লাগলো :

হে আমার পালনকর্তা আল্লাহ! তুমি সকলের অন্তর্যামী। তোমার দরবারে আমার আরাধনা কেবল এটাই যে, হযরত ইমাম জাফর সাদিক (আঃ)- এর অন্তর আমার প্রতি সদয় করে দাও যেনো আমার প্রতি তাঁর সুদৃষ্টি পতিত হয়। আমি যেনো তারঁ শিষ্য হবার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারি। তাঁর কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করে যেনো তোমার সরল সঠিক পথের সন্ধানে কঠিন অবস্থার সম্মুখীন না হই।

নামায ও দোয়া প্রার্থনার পর সে বাড়ি ফিরে এলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে অনুভব করতে লাগলো যে, তার অন্তরে ইমাম সাদিক (আঃ)- এর ভালোবাসা বেড়েই চলেছে। ভালোবাসা বৃদ্ধির সাথে সাথে তার দুঃখ- বেদনাও বাড়তে থাকে। আর বলে, আফসোস! ইমাম সাদিক (আঃ)- এর শিষ্য হবার সৌভাগ্যের অধিকারী হতে পারলাম না। এ দুঃখ তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। তাই সে নিজের ঘর ছেড়ে আর কোথাও যেতো না। কেবল ফরয নামায আদায় করার জন্য মসজিদে যেতো। বাকী সময় ঘরের মধ্যেই কাটিয়ে দিতো। আর তার মনের মধ্যে নানা রকম চিন্তা- ভাবনা আলোড়িত হতে থাকতো। একদিকে ইমামের অপারগতা প্রকাশ, অপর দিকে ইমামের শিষ্যত্ব

গ্রহণের আগ্রহের আধিক্য তার হৃদয়ে বেড়েই চলছিল। তাই মাঝে মাঝে বলতো, হায় যদি এমন কোন পথ খুলে যেতো যে, ইমাম আমাকে তার শিষ্য হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছেন। মোটকথা তার মধ্যে একটা অত্যাগ্রহের অবস্থা বিরাজিত করছিল। তার ব্যথা- বেদনা বেড়েই চলেছে। সীমাহীন দুঃখ- বেদনার কারণে দিনের পর দিন সে দুর্বল হয়ে পড়েছে। অবশেষে একদিন তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। সে পুনরায় ইমামের দরবারে গিয়ে হাজির হলো।

দরবারের খাদেম জিজ্ঞাসা করলো, বলুন, কি কাজ।

সে বললো, তেমন কোন কাজ নেই। আমি তো কেবলমাত্র ইমামের খেদমতে সালাম নিবেদন করতে এসেছি।

খাদেম বললো, ইমাম এখন নামায আদায় করছেন।

কিছুক্ষণ পরে খাদেম এসে বললো, আসুন।

ওনওয়ান বসরী ঘরে প্রবেশ করলো। ইমামকে দেখেই সালাম নিবেদন করলো। ইমাম তার সালামের জবাব দিলেন এবং তার জন্য দোয়াও করলেন। তারপর ইমাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার ডাক নাম কি? সে বললো, আবু আব্দুল্লাহ।

ইমাম তার জন্য দোয়া করে বললেন, মহান আল্লাহ তোমার এ নামের হেফাজত করুন। তোমার তওফিক আরো বাড়িয়ে দিন।

ইমামের এ দোয়ার বাণী শুনে সে মনে মনে ভাবতে লাগলো যে, যদি আর কিছ নাও হাসিল হয়, তাহলে এ দোয়াই আমার জন্য যথেষ্ট। তারপর ইমাম জিজ্ঞাসা করলেন, বলো! তোমার কাজ কি? কোন উদ্দশ্যে তুমি আমার এখানে এসেছো?

সে বললো, আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিলাম যে, আপনার অন্তরে আমার জন্য একটু স্থান করে দিতে যাতে করে আমি আপনার জ্ঞানভাণ্ডার থেকে উপকৃত হতে পারি। আমার বিশ্বাস যে, আমার দোয়া মঞ্জুর হয়েছে।

ইমাম বললেন, হে আবু আবদুল্লাহ! আল্লাহর মা'রেফাত ও ইয়াক্বীনের আলো এদিক সেদিক ঘোরাঘুরি করে এবং দ্বারে দ্বারে তালাশ করে হাসিল হয় না। অন্য কেউ তোমাকে ইয়াক্বীনের নূর

দিতে পারে না। এটা শিক্ষা করার বিষয় নয়, বরং এটা হচ্ছে সে নূর যা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অর্জিত হয়। আল্লাহ যখন তাঁর কোন বান্দাকে হেদায়েত করার ইচ্ছা করেন, তখন তার অন্তরে এ নূরে- ইয়াক্বীন সৃষ্টি করে দেন। যদি তুমি খোদার মা'রেফাত ও নূরে ইয়াক্বীনের সন্ধানী হও, তাহলে আল্লাহর গোলামী ও বন্দেগীর গভীরে নিজের অন্তর আত্মায় সন্ধান করো। আমলের পথেই ইলম খুঁজ। আর তাঁর কাছে দোয়া প্রার্থনা করো। তিনিই তোমার অন্তর নূরে ইয়াক্বীন দিয়ে ভরপুর করে দেবেন।[৮৩]

৭২

ইয়াক্বীনের অনুসন্ধান

নিজামিয়া- ই- বাগদাদ ও নিজামিয়া- ই- নিশাপুর এ দুটি বিশ্ববিদ্যালয় সালজুকী শাসনামলের উজ্জ্বল নক্ষত্র। বিরাট এ দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অসংখ্য ছাত্রের ভিড় লেগেই থাকতো। ৪৫০ থেকে ৪৭৮ হিজরী পর্যন্ত সময়কালে নিজামিয়া- ই- নিশাপুরের উপাচার্যের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন আবুল মাআলী ইমামুল হারামাইন জুওয়াইনী। দূর- দূরান্ত থেকে আগত হাজার হাজার ছাত্র তার শিক্ষা ক্লাসে অংশগ্রহণ করতো। তার সমস্ত ছাত্রের মধ্যে থেকে তিনি তিনজন যোগ্য ছাত্রের প্রতিভা ও অসাধারণ স্মরণশক্তি প্রত্যক্ষ করে তাদের প্রতি অভিভূত ছিলেন। তারা হলেন মুহাম্মদ গাযযালী তুসী, কায়া হারাসী ও আহমদ ইবনে মুহাম্মাদ খাওয়াফী।

এ তিনজন প্রতিভাবান ছাত্রের সম্পর্কে ইমামুল হারামাইনের একটি উক্তি বিশেষ ও সাধারণ মহলে সর্বত্রই ছিল প্রসিদ্ধ। কথাটি সকলের মুখে মুখে আলোচিত হতো এবং কানে কানে শোনা যেত। উক্তিটি ছিল এই গাযযালী একটি তরঙ্গায়িত সমুদ্র, কায়া হারাসী একটি ক্ষীপ্ত ব্যাঘ্র ও খাওয়াফী একটি প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখা। এ তিজনের মধ্যে গাযযালী সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান। তাই তিনি ছিলেন নিশাপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সকলে চোখের মণি ও প্রিয় পাত্র।

৪৭৮ হিজরী সালে ইমামুল হারামাইন মৃত্যুবরণ করেন। সে সময়ে গাযযালী নিজেকে অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী মনে করতেন। তার অন্তরে সালজুকী শাসকের বিজ্ঞ প্রধান মন্ত্রী খাজা নিজামুল মুলক তুসীর খেদমতে উপস্থিত হওয়ার স্পৃহা জাগলো। সেকালে তার এ বিজ্ঞ বন্ধু প্রধানমন্ত্রীর দরবারে জ্ঞানী- গুণী ও বিজ্ঞদের ভীড় লেগেই থাকতো। গাযযালীকে উষ্ণ সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করলেন। তাদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ- আলোচনা ও তর্ক- বিতর্কে তিনি বিজয়ীর গৌরবে গৌরবান্বিত হন। সে সময় নিজামিয়া- ই- বাগদাদের উপাচার্যের পদটি খালি হয়। কর্তৃপক্ষ এমন একজন বিজ্ঞ ও দক্ষ শিক্ষকের অনুসন্ধান করছিলেন যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা- দীক্ষার দায়- দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে পালন করতে পারেন। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এ

দায়িত্বভার অপর্ণ করার জন্য গাযযালীর চাইতে যোগ্য আর কোন লোক ছিলো না। ৪৮৪ হিজরীতে গাযযালী বাগদাদে গমন করেন অত্যন্ত জাঁকজমকভাবে এবং নিজামিয়া- ই- বাগদাদের সর্বোচ্চাসনে সমাসীন হন।

এভাবে গাযযালী তৎকালে সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের সর্বোচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হন। সুতরাং তিনি সেকালে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মীয় পন্ডিত এবং দ্বীনের পুরোধা হিসাবে পরিগণিত হতে লাগলেন। তিনি রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতেও হস্তক্ষেপ করতেন। তৎকালীন খলিফা আল মুকতাদির বিল্লাহ ও তার পরে আল মুনতাযির বিল্লাহ তাকে খুব শ্রদ্ধার চোখে বিবেচনা করতেন। এরূপে তিনি উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন সে যুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত। অর্থাৎ শিক্ষা বিভাগীয় নেতৃত্বের সর্বোচ্চাসনে পৌঁছেছিলেন। লোকদের অন্তরে তার এ অসাধারণ উন্নতির একটা প্রভাব বিস্তৃত ছিল। কিন্তু তখন তার হৃদয়ের গভীরে ছিল এক প্রজ্জ্বলিত বহ্নিশিখা যা তার সুশোভিত জীবন বাগানটিকে ও তার মান- মর্যাদ, প্রভাব- প্রতিপত্তি, শ্রেষ্ঠত্ব, আড়ম্বরতা ইত্যাদি সব কিছুকে ভস্মীভূত করে দেয়।

ছাত্র জীবন থেকেই তার অন্তরে গভীরে এমন একটা গোপন অনুভূতি লালিত হয়ে আসছিল। যার কারণে তিনি সব সময় ব্যাপৃত থাকতেন একটা স্বস্তি- প্রশান্তিও ইয়াক্বীনের সন্ধানে। কিন্তু জাগতিক খ্যাতি- যশ, জনপ্রিয়তা ও তার সময়ের সমস্ত বিজ্ঞ পন্ডিতদের উপর সর্বশ্রেষ্ঠ আসনে সমাসীন হবার আকাঙ্ক্ষা তার সে গোপন অনুভূতিকে অনেকটা দাবিয়ে রেখেছিল। এ জন্যই সে বিষয়ে খুব একটা চিন্তা- ভাবনা করার সময়- সুযোগ তার হতো না। কিন্তু যখন তিনি পার্থিব উন্নতির সর্বশেষ সিঁড়িটি অতিক্রম করেছেন তখন তার সে গোপন অনুভূতিটি আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। শুরু করলেন তিনি সত্যের অনুসন্ধান অর ইয়াক্বীনের তালাশ। আর তার সামনে এ সত্যটিও সুস্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে যে, তার নিকট মওজুদ দলিল- প্রমাণাদি এবং তর্ক- বিতর্কের সময় উপস্থাপিত যুক্তি অন্য লোকদেরকে তো পরিতৃপ্ত করে থাকে। কিন্তু সে সমস্তদলিল- প্রমাণ দ্বারা তার নিজের অন্তরাত্মা পরিতৃপ্ত নয়। তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারলেন যে, শিক্ষা- দীক্ষা ও তর্ক- বিতর্ক ইয়াক্বীনের মনযিলে পৌঁছার জন্য যথেষ্ট নয় বরং এর জন্য

অবশ্যম্ভাবী দরকার হচ্ছে চরিত্র- আখলাকের বিশুদ্ধতা, চেষ্টা- সাধনার অধ্যবসায় ও তাকওয়া পরহেযগারীর ভূষণ। সুতরাং তিনি নিজেকে উদ্দেশ্য করে নিজেই বললেন, মদের নাম উচ্চারণ করলে যেমন মাতলামির সৃষ্টি হয় না, রুটি রুটি করে যিকির দ্বারা যেমন উদর ভরে না ও ওষুধ ওষুধ করে চিৎকার করলে যেমন আরোগ্য লাভ হয় না, ঠিক তেমনি সত্য সম্পর্কে আলাপ- আলোচনা ও তর্ক বতর্ক দ্বারা নিশ্চয়তা ও ইয়াক্বীনের পর্যায়ে উপনীত হওয়া যায় না। বরং এর জন্য প্রয়োজন নিরেট- নির্ভেজাল অনুসন্ধানের। আর পার্থিব শান- শওকত, পদমর্যাদা, চাকর- বাকর, খ্যাতি- প্রসিদ্ধি ও জনপ্রিয়তার ভালোবাসা এ ব্যাপারে মোটেও সম্পর্কযুক্ত নয়। মোটকথা একটা আশ্চর্য দ্বন্দ- সংশয় তার অন্তরে আলোড়িত হচ্ছিল। এটা ছিল এমন একটা বেদনা যা কেবল তিনি ও তার প্রভুই জানতেন। এ ছাড়া আর কারো উপলব্ধিও ছিল না। প্রায় ছয় মাস পর্যন্ত তিনি এ দ্বন্দ্বে ভুগতে থাকেন। তার মধ্যে এ দ্বন্দ্বের পর্যায়টি এমন ছিল যে, তার পানাহার , শোয়া- বসা ইত্যাদি কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এ পর্যায়ে তার উপর নীরবতার ছাপ প্রতিষ্ঠিত হলো। অধিকাংশ সময় তিনি চুপচাপ থাকতেন এবং ধ্যানের জগতে হারিয়ে যেতেন। শিক্ষা- দীক্ষা দানের শক্তি তার মধ্যে আর অবশিষ্ট রইলো না। হজমশক্তি হ্রাস পেয়ে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। চিকিৎসকগণ পরীক্ষা- নিরীক্ষা করে নির্ণয় করলেন যে, তিনি মানসিক রোগে ভুগছেন। চিকিৎসার ব্যাপারে কোনো পন্থাই বাকি রাখা হয়নি। মহান আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ তার আবেদনে সাড়া দেবার মতো ছিল না। তাই তিনি মহান আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ জানালেন যে, এ দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি লাভ সহজ ব্যাপার নয়। একদিকে তার অন্তরের গোপন অনুভূতি দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে, অন্যদিকে এ দুনিয়ার উন্নতি, অসাধারণ খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা জলাঞ্জলি দেয়া একটা সহজ ব্যাপার ছিল না। এরূপ চিন্তা- ভাবনা ও দ্বন্দ্ব- লড়াই অবশেষে এমন এক পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হলো যে, তার কাছে এখন আর এ দুনিয়ার জাঁকজমক, মর্যাদা- সম্মান, চাকর- বাকর, উচ্চপদ ইত্যাদির কোনই মূল্য ও কদর রইলো না। তাই তিনি দুনিয়ার যাবতীয় ঝামেলা থেকে মুক্ত হবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। কিন্তু এ কথা তিনি কোনো অবস্থাতেই প্রকাশ করেননি। কেননা তিনি জানতেন যে, তার সিদ্ধান্তের কথা লোকেরা টের পেলে তার

বাঞ্ছিত লক্ষ্যের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। সুতরাং তিনি মক্কা সফর করার বাহানা দিয়ে বাগদাদ ত্যাগ করলেন। কিছু দূর যাওয়ার পর লোকেরা তাকে বিদায় জানিয়ে ফিরে গেলো।

লোকদের হাত থেকে মুক্তি লাভ করে তিনি তার সফরের গতিপথ মক্কার বদলে সিরিয়া ও বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে ঘুরিয়ে দিলেন। এ সফরে তিনি দরবেশের পোশাক পরিধান করলেন যাতে করে লোকেরা তার কারণে কষ্ট- ক্লেশের শিকারে পরিণত না হয়। আর কেউ যেন বুঝতে না পারে যে, তিনি কে? তার এ মুসাফিরের জীবন দীর্ঘদিন ধরে অব্যাহত থাকে। এভাবে দীর্ঘ দশ বছর যাবত কঠোর সাধনা ও কষ্ট- ক্লেশের পর তিনি যে ইয়াক্কীন ও আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলের সন্ধান করছিলেন, তা হাসিল করতে পেরেছিলেন।[৮৪]

এক তৃষ্ণার্তের কাঁধে পানির মশক

গ্রীস্মকাল। প্রচণ্ড রৌদ্রতাপ। খরা ও দ্রব্যমূল্যের কারণে মদীনাবাসীদের জীবন বাঁচানো ছিল এক কঠিন ব্যাপার। লোকেরা সব সময় আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখতে থাকতো। হায় যদি বৃষ্টি হতো তাহলে লোকেরা স্বস্তির নিঃশ্বাস গ্রহণের সুযোগ লাভ করতে পারতো। এমনি অবস্থাতে মহানবী (সাঃ) সংবাদ পেলেন যে উত্তরপূর্ব দিকে বসবাসকারী মুসলমানদের জীবন রোমানদের কারণে হুমকির সম্মুখীন। রোমের সৈন্যবাহিনী যে কোনো সময় মুসলমানদের জীবননাশের পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে। সুতরাং তিনি মদীনাবাসীদের নির্দেশ দিলেন যে, তারা যেন শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য এক্ষুণিই প্রস্তুতি গ্রহণ করে। খরার প্রচণ্ডতা মদীনার অধিবাসীদেরকে আগেই কাবু করে রেখেছিল। প্রত্যেকেরই আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যে, নতুন ফসলের ফলমূল খাবে। খরার মৌসুমে তাজা ফলফলাদি ছেড়ে কাঠ ফাটা রোদ আর গরম হাওয়ার মধ্যে মদীনা থেকে সিরিয়া পর্যন্ত সফর করা খুব সহজ ব্যাপার ছিল না। এ অবস্থায় মোনাফিকদের জন্য অঙ্গীকার ভঙ্গ করার পরিবেশ ছিল অনুকূলে।

কিন্তু ভীষণ গরম, তপ্ত রোদের প্রখরতা, খরার প্রচণ্ডতা এবং মোনাফিকদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা ইসলামী বাহিনীর পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। প্রায় ত্রিশ হাজার মুসলিম সৈন্য রোমানদের সম্ভাব্য হামলার মোকাবিলা করার জন্য সিরিয়ার দিকে যাত্রা করলো। মরুভূমির পথ। সূর্য তাদের উপর আগুন বর্ষণ করছিল। তাদের সাথে পানাহার দ্রব্যও খুব বেশী ছিল না। বরং সম্ভাবনা এটাও ছিল যে, না জানি ইসলামী বাহিনীকে পানাহার দ্রব্যের অভাবের সম্মুখীন হতে হয়। তাই কোনো কোনো দুর্বল ঈমানদার লোকেরা পথিমধ্যেই সরে পড়লো। কিছু দূর পথ চলার পর কাআব ইবনে মালেক মদীনার দিকে ফিরে চলে যায়। সাথীরা গিয়ে রাসূল (সাঃ)- কে বললো, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! কাআব ইবনে মালেক আমাদের সঙ্গ ছেড়ে মদীনায় ফিরে চলে গেছে। রাসূল (সাঃ) বললেন, তাকে যেতে দাও। যদি তার মধ্যে বিন্দুমাত্রও নেকীর অংশ

থেকে থাকে তাহলে মহান আল্লাহ খুব শীঘ্রই তোমাদের কাছে ফিরিয়ে আনবেন। আর যদি তার মধ্যে নেকীর লেশমাত্র পাওয়া না যায়, তাহলে মনে করে নিও যে, আল্লাহ তোমাদেরকে তার অনিষ্টতা থেকে নাজাত দান করেছেন।

কিছুক্ষণ পরেই সাহাবারা আবার রাসূলের কাছে গিয়ে বললো, ইয়া রাসূলুলাহ! মারারা ইবনে রাবীও ইসলামী বাহিনী ত্যাগ করে চলে গেছে। রাসূল (সাঃ) বললেন, দেখো! যদি তার মধ্যে নেকীর লেশমাত্রও থেকে থাকে তাহলে মহান খোদা খুব শীঘ্রই তোমাদের সাথে দ্বিতীয়বার একত্র করে দেবেন। আর যদি এমনটি না হয় তাহলে বুঝে নেবে যে, আল্লাহ তোমাদেরকে তার অনিষ্টতা থেকে রক্ষা করেছেন।

আরো কিছু পরে লোকেরা এসে রাসূলে খোদাকে জানালো ইয়া নাবী আল্লাহ! হেলাল ইবনে উমাইয়্যাও আমাদের দল ছেড়ে চলে গেছে। রাসূলে আকরাম (সাঃ) এবারও তাদেরকে একই জবাব দিলেন। তারা চুপ হয়ে গেল।

এমন সময় হযরত আবু যার গিফারীর উটটি ঠাঁয় দাঁড়িয়ে গেল। আবু যার আপ্রাণ চেষ্টা করলেন যেন কাফেলা থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে পড়েন। কিন্তু সকল চেষ্টাই তার ব্যর্থ হলো। হঠাৎ কাফেলার লোকেরা লক্ষ্য করে দেখলো যে, হযরত আবু যার গিফারী কাফেলার সাথে নেই। তাই তারা রাসূলে খোদার খেদমতে গিয়ে সংবাদ দিল হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! জনাব আবু যারও আমাদের দলচ্যুত হয়েছেন। মহানবী (সাঃ) একটা মৃদু শ্বাস টেনে বললেন, যেতে দাও। যদি তার মধ্যে কোন নেকী থেকে থাকে তাহলে মহান আল্লাহ তাকে আবার তোমাদের সাথে একত্র করে দেবেন। আর যদি এমনটি না হয় তাহলে মনে করবে যে, মহান আল্লাহ তোমাদেরকে তার ক্ষতি থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন।

এদিকে জনাব আবু যার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন কিন্তু উটটি স্বস্থান থেকে এক কদমও নড়লো না। বাধ্য হয়ে তিনি উটের পৃষ্ঠদেশ থেকে নিচে অবতরণ করলেন এবং সফর সামগ্রী নিজের স্কন্ধে ধারণ করে পায়ে হেঁটে চলতে লাগলেন। রোদের তীব্রতা তার মাথার উপরে বর্ষিত হচ্ছিল। আর তৃষ্ণার তীব্রতায় তার জিহবা বেরিয়ে আসার উপক্রম। কিন্তু তিনি তার এ অবস্থার কথা যেন

ভুলে গেলেন। তার স্মরণে কেবল একটাই কথা। কি করে তিনি তাড়াতাড়ি গিয়ে রাসূলে আকরাম (সাঃ)- এর খেদমতে উপস্থিত হবেন এবং ইসলামী বাহিনীর সাথে অন্তর্ভুক্ত হবেন। তাই তিনি খুব দ্রুত পদে পথ চলতে লাগলেন। হঠাৎ আসমানের এক দিকে কিছু মেঘমালা দেখতে পেলেন যা দেখে মনে হচ্ছিল যে, বৃষ্টি হতে পারে। তিনি সেদিকে ঘুরলেন। হঠাৎ তার পা একটা ভারী পাথরের সাথে ধাক্কা খেল। তিনি চেয়ে দেখলেন সেখানে বৃষ্টির পানি জমা আছে। তিনি সামান্য পানি পান করলেন এবং পিপাসা পুরোপুরি নিবারণ না করেই দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি ভাবলেন যে, হতে পারে আল্লাহর নবী (সাঃ) তৃষ্ণার্ত রয়েছেন। এ ভেবে তিনি স্কন্ধ থেকে খালি মশকটি নামালেন এবং সে পানি মশকে ভরে নিলেন। মশকটি কাঁধে করে চলতে লাগলেন। গরমের তীব্রতায় তার কলিজা শুকিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে উঁচু- নিচু পথ অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে থাকলেন। কিছুক্ষণ পথ চলার পর অনেক দূরে ইসলামী বাহিনীর অবস্থান দেখতে পেলেন। এ দেখে তিনি খুব খুশী হলেন এবং আরো দ্রুত পদে পথ চলতে লাগলেন।

এদিকে ইসলামী বাহিনীর একজন সৈনিক দেখতে পেল যে, কোন এক লোক দ্রুতগতিতে তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। সুতরাং তারা রাসূল (সাঃ) এর কাছে গিয়ে বললো, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! মনে হচ্ছে কেউ একজন আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। রাসূল (সাঃ) খুশীর ভাব প্রকাশ করে বললেন, হায়! সে যদি আবুযার হতো। আগমনকারীর ছায়া নিকটতর হতে থাকলো। একবার লোকেরা তাকে দেখে চিনতে পেরে চিৎকার করে উঠলো, খোদার কসম। আগন্তুক ব্যক্তিটি হযরত আবুযার ব্যতীত আর কেউ নন।

রাসূলে আকরাম (সাঃ) বললেন, হে পরোয়ারদিগার! আবু যারকে ক্ষমা করে দাও। সে একাই জীবনযাপন করে, একাই মৃত্যুবরণ করে আর একাই হাশরে উপস্থিত হয়।

এরপর মহানবী (সাঃ) আবুযারকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করলেন। আবুযার তার কাঁধের সমস্ত মালামাল মাটিতে রেখে দিলেন। ক্লান্তি- শ্রান্তির কারণে তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন।

রাসূল (সাঃ) সাহাবীদেরকে বললেন, তাড়াতাড়ি পানি আনো। আবুযার বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার সাথে পানি আছে।

রাসূল (সাঃ) বললেন, পানি তোমার সাথে ছিল, অথচ তুমি পিপাসায় কষ্ট করেছো? তৃষ্ণা নিবারণ করোনি?

তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমার পিতামাতা আপনার জন্য কোরবান হোক! পথে আমি একটি পাথরের সাথে ধাক্কা খেয়েছি। দেখলাম সেখানে পানি জমা আছে। আমি একটুখানি পানি পান করে দেখলাম যে, পানি ভাল আছে। তখন আমি ভাবলাম যে, আল্লাহর নবীকে পানি পান না করিয়ে আমি নিজে পানি পান করবো না।[৮৫]

৭৪

ধারাশায়ীকে পদাঘাত

আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ান তার একুশ বছরের জুলুম- নির্যাতনের শাসন চালাবার পর দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়। তার মৃত্যুর পর তারই পুত্র ওয়ালিদ ক্ষমতা লাভ করে। ক্ষমতার চাবি- কাঠি হাতে নিয়ে ওয়ালিদ সিদ্ধান্ত নিল যে, জনসাধারণের মধ্যে বিদ্যমান অসন্তোষ এবং শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ নিরসনের জন্য সে লোকদের সাথে কিছুটা নম্র আচরণ ও সদ্ব্যবহারের নীতি অবলম্বন করবে। বিশেষভাবে সে মদীনাবাসীদের সাথে অত্যন্ত ভালো আচরণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। এর কারণ হলো এই যে, এখনো সে মোকাদ্দাস ও পবিত্র শহরে রাসূলের অসংখ্য সাহাবী, ফকিহ ও মুহাদ্দিস বর্তমান রয়েছেন। এছাড়াও এ শহরটি বিশেষ পবিত্রতার কারণে মর্যাদার অধিকারী। সুতরাং সে মদীনার শাসনকর্তার পদ থেকে হিশাম ইবনে ইসমাঈল মাখযুনীকে সরিয়ে দিল। কেননা তার অত্যাচার- নিপীড়নে সেখানকার লোকেরা ছিল জর্জরিত। প্রত্যেক মানুষ অন্তরের মধ্যে এ কামনা রাখতো যে, আল্লাহ্ যেন এ জালিমকে ধ্বংস করে দেন। এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে, হিশাম ছিল ওয়ালিদের নানা।

হিশাম ইবনে ইসমাঈল মদীনাবাসীদের প্রতি নির্মম অবিচার চালায়। সীমাহীন জুলুম- অত্যাচার করে জনজীবনকে অতিষ্ঠ করে তোলে। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব সকল মদীনাবাসী নিকট ছিলেন একজন সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। তিনি হিশামের বাইআত করতে অস্বীকার করেছিলেন। এ কারণে হিশাম তাকে ৬০টি চাবুকের দণ্ড দিয়ে ছিল। শুধু এখানেই শেষ নয়, বরং চাবুকাঘাত করার পর তাকে একটি মোটা কাপড় দিয়ে পেঁচিয়ে মদীনার বাইরে এক মরুভূমিতে ফেলে দিয়েছিল। হযরত আলী (আঃ) এর অনুসারীদের সাথে, বিশেষত আলী ইবনুল হোসাইন তথা ইমাম যয়নুল আবেদীন (আঃ) এর সাথে অমানবিক নিপীড়ন আর নির্যাতনের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

যা হোক ওয়ালিদ মদীনার গভর্নরের পদ থেকে হিশামকে অপসারণ করে তদস্থলে তার চাচাতো ভাই ওমর ইবনে আব্দুল আযীযকে নিয়োগ করে। লোকেরা ওমর ইবনে আব্দুল আযীযের সত্যবাদিতা ও ন্যায়পরায়ণতার জন্য আকৃষ্ট হয়েছিল। তিনি গভর্নরের পদে অধিষ্ঠিত হয়ে নির্দেশ জারী করলেন যে, হিশামকে গ্রেফতার করে মারওয়ান ইবনে হাকামের বাড়ির সামনে দাঁড় করিয়ে রাখা হবে। আর জনসাধারণের মধ্যে ঘোষণা করে দিতে হবে যে, যার যার সাথে হিশাম ক্ষমতায় থাকাকালীন জুলুম অবিচার করেছিল, সে সমস্ত লোকেরা এসে এখন তার থেকে প্রতিশোধ নিতে পারবে। সুতরাং লোকেরা দলে দলে এসে হিশামকে গালিগালাজ ও অভিশাপের বৃষ্টি বর্ষণ করতে থাকলো।

কিন্তু হিশাম নিজেই ইমাম যয়নুল আবেদীন ও তার অনুসারীদের সম্পর্কে শংকিত ছিল। কেননা সে ইমাম ও তার সাথীদের প্রতি সবচেয়ে বেশী জুলুম চালিয়েছিল এবং নবী বংশের সাথে সর্বাধিক অন্যায় অপরাধ করেছিল। সে জানতো যে তাদের প্রতি নির্বিচারে জুলুমের প্রতিশোধ মৃত্যুর চেয়ে কম কিছু হবে না। এদিকে ইমাম তাঁর সঙ্গী-সাথীদেরকে ডেকে বললেন, ধরাশায়ীকে পদাঘাত করা আমাদের নীতি নয়। আমরা দুশমনদের দুর্বলতার সুযোগের সদ্ব্যবহার করে তাদের থেকে প্রতিশোধ নেই না। বরং আমাদের চরিত্র হলো যে, আমরা অসহায় লোকদের প্রতি যথা সম্ভব সদয় থাকি। ইমাম (আঃ) যখন তার সাথীদেরকে সাথে নিয়ে হিশামের কাছে যাচ্ছিলেন তখন তাদেরকে দেখে হিশামের চেহারার রং বিবর্ণ হয়ে গেল। সে ভাবলো যে, সে সময় খুব বেশী দূরে নয় যে, তাকে মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নিতে হবে। কিন্তু তার চিন্তার বিপরীতে ইমাম তার কাছে পৌঁছে উচ্চস্বরে বললেন, সালামুন আলাইকুম। অতঃপর তার সাথে করমর্দন করে বললেন, তোমার যথা সম্ভব সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত রয়েছি।

এ ঘটনার পর মদীনাবাসীরা হিশামের প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করা থেকে বিরত হলো।[৮৬]

৭৫

অচেনা পুরুষ

এক অসহায় রমণী কাঁধে পানির মশক ঝুলিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে নিজের বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন। পথে একজন অচেনা পুরুষ সে অসহায় মহিলার কাছ থেকে মশকটি নিয়ে নিজের কাঁধে ঝুলিয়ে মহিলার সাথে সাথে চলতে লাগলেন। মহিলার ছোট ছোট ছেলে- মেয়েরা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে তাদের মায়ের আগমনের অপেক্ষা করছিল। এ মাছুম ছেলে- মেয়েরা দেখতে পেলো যে, একজন অচেনা- অজানা লোক তাদের মায়ের সাথে তাদের বাড়ির দিকে আসছেন। আর পানির মশকটি তার স্কন্ধে। বাড়িতে এসে অপরিচিত লোকটি পানির মশক মাটিতে রেখে মহিলাকে উদ্দেশ্য করে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার অবস্থা দেখে খুব ভালোভাবে বুঝতে পারা যায় যে, আপনার ঘরে কোনো পুরুষ লোক নেই। কিন্তু বলুন তো, আপনি এভাবে অসহায় হলেন কিভাবে?

জবাবে মহিলা বললেন, আমার স্বামী ছিলেন একজন বীর যোদ্ধা। আলী ইবনে আবী তালিব তাকে ইসলামী বাহিনীর সাথে যুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন। যুদ্ধে আমার স্বামীর মৃত্যু হয়েছে। এখন এ ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ছাড়া জগতে আর আমার কেউ নেই?

অচেনা লোকটি আর কোনো কথা বললেন না, বরং মাথা ঝুকিয়ে ঘরের বাইরে চলে গেলেন। কিন্তু তিনি এরপর শুধু এ অসহায় স্ত্রী লোকটি ও তার কচি কচি শিশু সন্তানের কথাই ভাবতে থাকলেন। রাতে তার নিদ্রা হলো না। সকালে তিনি একটি থলিতে কিছু গোশত, আটা, খুরমা ও আরো কিছু খাদ্যদ্রব্য নিলেন এবং সে অসহায় রমণীর বাড়িতে গেলেন। দরজায় দাঁড়িয়ে আওয়াজ দিলেন। মহিলা ভেতর থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, কে আপনি?

আগন্তুক জবাব দিলেন, আমি খোদার সে বান্দা, যে কাল আপনার পানির মশক এনে দিয়েছিলাম। আজ আমি আপনার ছেলে- মেয়েদের জন্য কিছু খাদ্য- খাবার নিয়ে এসেছি।

মহিলা ভেতর থেকে বললেন, হে আল্লাহর বান্দা! আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুন। আমার ও আলী ইবনে আবী তালিবের মধ্যে আল্লাহই ফয়সালা করবেন।

অতঃপর দরজা খুলে দিলেন। অচেনা লোকটি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। খাদ্য সামগ্রীগুলো মহিলাকে দিয়ে বললেন, আমার মন চাচ্ছে যে, কিছু সওয়াবের কাজ করবো। অতএব, আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে আমি নিজে আটা খামির করে রুটি বানিয়ে দেবো অথবা আমি ছেলে- মেয়েদের দেখাশোনা করি আর আপনি আটা খামির করে রুটি বানিয়ে নিন।

মহিলা বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে আমিই আটা খামির করে রুটি তৈরি করছি আর আপনি ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা করুন।

তারপর ভদ্র মহিলা আটা খামির করে রুটি তৈরিতে ব্যস্ত হলেন। আর অপরিচিত লোকটি থলে থেকে খুরমা বের করে নিজের হাতে এ ছেলেমেয়েদেরকে খুরমা খাওয়াতে লাগলেন। নিজের হাতে বাচ্চাদেরকে খুরমা খাওয়াবার সময় তিনি তাদেরকে বার বার এ কথাটাই বলতে থাকলেন, হে আমার প্রিয় সন্তানরা! আলী ইবনে আবী তালিবকে মাফ করে দাও। যদিও তিনি তোমাদের ব্যাপারে কার্পণ্য করেছেন।

এতোক্ষণে আটা খামির হয়ে গেছে। সে মহিলা ডেকে বললেন, হে আল্লাহর বান্দা! আটা খামির করা হয়ে গেছে। এবার তন্দুর জ্বালিয়ে দিন।

অচেনা লোকটি সাথে সাথে উঠে গিয়ে তন্দুরে আগুন ধরালেন। আগুনের ভাপ তন্দুর থেকে বের হতে লাগলো। লোকটি নিজের চেহারাকে আগুনের কাছে নিয়ে নিজে নিজে এভাবে বলতে লাগলেন, আগুনের তাপের স্বাদ আস্বাদন করো। একজন বিধবা রমণী ও ইয়াতিম বাচ্চাদের খোঁজ খবর নেবার ব্যাপারে কার্পণ্য করার এটাই শাস্তি।

তিনি যখন এ কাজে ব্যস্ততখনি প্রতিবেশী এক মহিলা এ বাড়িতে এলো এবং ঘরে ঢুকেই এ অপরিচিত লোকটিকে চিনতে পারলো। তারপরে সে বিধবা মহিলাকে বললো, ধিক তোমার প্রতি! তুমি কি এ লোকটিকে চেনো না? তাকে দিয়ে এভাবে কাজ করিয়ে নিচ্ছো? তিনি হলেন আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী ইবনে আবী তালিব।

অসহায় বিধবা মহিলাটি হযরত আলী (আঃ) এর সামনে এসে বলতে লাগলেন, আমি আমার এ কাজের জন্য আপনার নিকট খুবই লজ্জিত। আমি আপনার নিকট ক্ষমা চাইছি।

আলী (আঃ) বললেন, না! আমিই বরং আপনার নিকট ক্ষমা চাচ্ছি। কেননা আমি আপনার ব্যাপারে খোঁজ- খবর নিতে কার্পণ্য করেছি।[৮৭]

তথ্যসূত্র :

১.ইসলামের প্রথম দিকে মসজিদে নববীতে কেবল নামাযই হতো না, বরং তখনকার মুসলমানদের সামাজিক ও ধর্মীয় সকল কর্মকান্ডের কেন্দ্র ছিল এ মসজিদ। যখন কোন প্রয়োজনীয় কাজের জন্য সকলের একত্র হওয়ার দরকার দেখা দিত তখন সকলকে এ মসজিদে ডাকা হতো। লোকেরা এখানে এসেই তাদের জরুরি বিষয়াদি জেনে নিত। যে কোন নতুন সিদ্ধান্ত এখানেই গ্রহণ করা হতো এবং ঘোষণাও করা হতো এখান থেকেই যাতে করে সকল লোকে জানতে পারে।

মুসলমানরা যতদিন মক্কায় ছিল ততদিন তারা সামাজিক কাজকর্ম ও স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত ছিল। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান স্বাধীনভাবে পালন করতে পারতো না। আর ইসলামী শিক্ষা- দীক্ষাও গ্রহণ করতে পারতো না নিজেদের ইচ্ছামতো। এ অবস্থা অনেক দিন পর্যন্ত চলতে থাকে। অতঃপর আরবের আরেকটি স্থানের 'নাম ছিল 'ইয়াসরিব'। সেখানে ইসলামের প্রভাব ছড়িয়ে পড়লো। এ স্থানটিতে পরবর্তীকালে 'মদীনাতুন্নাবী' অর্থাৎ 'নবীর শহর' নামে বিখ্যাত হলো। মহানবী (সাঃ) মদীনার লোকদের প্রস্তাব ও প্রতিশ্রু''তি বিবেচনা করে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করলেন। ধীরে ধীরে সকল মুসলমানই হিজরত করে মদীনায় এসে উপস্থিত হয়। তখন থেকে তারা স্বাধীনভাবে ধর্মীয় কাজগুলোতে অংশগ্রহণ করতো। মদীনায় পৌঁছে মহানবী (সাঃ) সর্বপ্রথম যে কাজটি করলেন সেটি হলো একটি মনোরম ও সুবিধাজনক স্থান বেছে নিয়ে তাঁর সাহাবীগণের সহযোগিতায় এই মসজিদের নির্মাণ কাজ শেষ করলেন।

২ মুনিয়াতুল মুরীদ, বোম্বে সংস্করণ, পৃ. ১০।

৩.উসূলে কাফী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ.:১৩৯, বাবুল কানাআহ, সাফীনাতুল বিহার, 'কানাআহ' অধ্যায়।

৪.ওয়াসাইল, আমীর বাহাদর মূদ্রণ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ: ৫২৯।

৫. কোহলিল বাছার, মুহাদ্দেসে কুমী, পৃ. ৬৯।

৬.'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই মহান আলাহ তার সে বান্দাকে কখনও ভালোবাসেন না যে নিজের বন্ধুদের মাঝে নিজেকে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম মনে করে এবং নিজেকে অপরের চেয়ে বিশেষ ব্যক্তিত্ব জ্ঞান করে।

৭.কোহলিল বাছার, মুহাদ্দেস কুমী, পৃ. ৬৮ ।

৮.বিহারুল আনোয়ার, খণ্ড- ১১, কোম্পানী মুদ্রিত, পৃ. ২১ ।

৯.অসূলে কাফী, দ্বিতীয় খণ্ড, বাবু হুসনুছছাহাবা ওয়া হাককুছছাহেবে ফিস- সফর, পৃ. ৬৭০।

১০.নাহজুল বালাগাহ, কালিমাতে কেছার, নং- ৩৭ ।

১১.কোহলিল বাছার, পৃ. ৭০, মুহাদ্দেসে কুমী ।

১২.সিরিয়া দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমরের খেলাফতকালে বিজিত হয়েছিল। বিজয় লাভের পর সেখানকার শাসনকর্তা হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছিল মুআবিয়ার বড় ভাই ইয়াযীদ ইবনে আবু সুফিয়ানকে। দুই বছর শাসন করার পর ইয়াযীদ মারা যায়। তার মৃত্যুর পর এ গুরুত্বপূর্ণ এলাকাটির শাসনভার মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের হাতে তুলে দেন স্বয়ং দ্বিতীয় খলিফাই। এরপর থেকে মুআবিয়া একাধারে বিশ বছর পর্যন্ত দোর্দণ্ড প্রতাপের সাথে শাসন করতে থাকে। হযরত ওমরের খেলাফতকালে বিশেষ একটি নিয়ম ছিল যে, কোন শাসককেই একই এলাকায় একাধারে কয়েক বছর পর্যন্ত শাসন করার সুযোগ দেয়া হতো না। কারণ সে যেন অনেক দিন পযর্ন্ত শাসন করার সুযোগ নিজের অবস্থান ও ক্ষমতাকে সুদৃঢ় ও মজবুত করতে না পারে। এ জন্যই শাসকদেরকে তাড়াতাড়ি পদচ্যুত করে তদস্থলে অন্য নতুন শাসক নিয়োগ করা হতো। কিন্তু মুআবিয়া নিজের ক্ষমতায় স্থায়ী থাকে। কেননা তাকে করা পদচ্যুত হয়নি। এ সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে সে নিজের অবস্থান ও ক্ষমতাকে এতো মজবুত করেছে যে, সে খেলাফতের মসনদের স্বপ্ন দেখতে লাগলো। সুতরাং বিশ বছর ক্ষমতায় থাকার সুসংবাদে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে তার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হলো। পরবর্তী আরো বিশ বছর সে সিরিয়া ও ইসলামী সাম্রাজ্যের অন্যান্য এলাকাতে মুসলমানদের খলিফা হিসেবে শাসন করে। এভাবে সিরিয়াতে বসবাসকারী লোকেরা উমাইয়া শাসনাধীনে লালিত- পালিত হয় এবং তাদেরই দেয়া শিক্ষা- দীক্ষায় গড়ে ওঠে। আমরা সকলেই খুব ভালোভাবে জানি যে, বনী উমাইয়ারা হাশেমী খানদানের সাথে আন্তরিক শত্রুতা রাখতো। ইসলামের ঘোষণা প্রকাশের পর সে শত্রুতা আরো প্রকট আকার ধারণ করে। সুতরাং হযরত আলী (আঃ) ও তার সন্তানগণ উমাইয়াদের শত্রুতার কেন্দ্রে পরিণত হলো। সিরিয়ার লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করার সাথে সাথে হযরত আলী ও তার সন্তানদের বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ করার শিক্ষাও লাভ করতে থাকে। এভাবে শত্রুতার শিকড় তাদের অন্তরে ভালোভাবেই গেড়ে গিয়েছিল। বনী উমাইয়ার শাসকরা হযরত আলী ও তার সন্তানদের বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণের কাজটিকে দ্বীন ইসলামের অংশ বলে সাব্যস্ত করেছিল। তাদের প্রচার দ্বারা অর্থাৎ জনগণকে এভাবে বুঝিয়েছে যে, সে ব্যক্তি সঠিক মুসলমান হতেই পারবে না যে আলী ও তাঁর সন্তানদের সাথে শত্রুতা না রাখবে। সুতরাং সিরিয়াবাসীদের এ আচরণ এবং হযরত আলী ও তার সন্তানদের প্রতি দুশমনি পোষণ করা তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল।

১৩.নাফশাতুল মাছদুর, মোহাদ্দেছে কুমী, পৃ. ৪ ।

১৪.অসূলে কাফী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ, . ৪০৪।

১৫.আল ইমামু আলীউন সওতুল আদালাতিল ইনসানিয়্যাহ, পৃ. ৬৩, বিহারুল আনোয়ার, নবম খণ্ড, তাবরীয সংস্করণ, পৃ. ৫৯৮ (মতান্তরে)।

১৬.হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম দিকে মুসলমানদের মধ্যে থেকে একটি দল আত্মপ্রকাশ করলো যারা নিজেদেরকে সূফী ও দরবেশ নামে পরিচয় দিত। এরা একটা বিশেষ পদ্ধতিতে জীবন যাপনের পথ অনুসরণ করতো। আর তাদের যথাসাধ্য চেষ্টা ছিল যে, অন্য মুসলমানদেরকেও তাদের অনুসারী বানাবে। সে দলের লোকেরা এ কথাই বোঝাতে চাইতো যে, তারা যে পন্থা অনুসরণ করে চলেছে প্রকৃতপক্ষে সেটাই ইসলামী জীবন যাপনের পথ। সেটাই ইসলামের শিক্ষা। তাদের দাবী ছিল দুনিয়ার নেয়ামতসমূহ থেকে দূরে থাকা উচিত। তাদের আকীদা- বিশ্বাসমতে একজন মুমিন মুসলমানের উচিত উত্তম পোশাক, রুচিসম্মত খাদ্য খাবার ও ভালো ভালো ঘর- বাড়ী পরিহার করা। এরা যদি দেখতে পেতো যে, কোন মুসলমান আলাহর দেয়া নেয়ামত দ্বারা কোন ফায়দা হাসিল করছে বা উপভোগ করছে তাহলে তারা তার অপমান ও হেয় করার ব্যাপারে মোটেও দেরী করতো না। তাদের দৃষ্টিতে ভালো পোশাক পরিধানকারী, রুচিসম্মত খাদ্য গ্রহণকারী ও ভালো বাড়িতে বসবাসকারী লোকেরা দুনিয়াদার। তাদের সাথে মহান আল্লাহর কোন সম্পর্ক নেই। ইমাম সাদিক (আঃ) এর প্রতি সাওরীর আপত্তি এ আকীদা বিশ্বাসের ভিত্তিতেই।

এ মতবাদ সমগ্র পৃথিবীতেই খ্যাতি অর্জন করেছে। শুধু ভারত ও গ্রীসে) নয়, বরং বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে এ মতবাদের অনুসারীদের সংখ্যা বিরাট পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে এ মতের অনুসারীদের সংখ্যা কম নয়। আর তারা তাদের এ মতবাদের গায়ে ধর্মীয় লেবাস পরিয়ে দিয়েছে। সুতরাং এর ধারা বংশানুক্রমে এগিয়েই চলেছে এবং এর প্রভাবও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যথেষ্ট। অতএব এ কথা বললে বেশী বলা হবে না যে, মসলমানদের মধ্যে এমন একটা বিশেষ মতবাদের আবিষ্কার হয়েছে, যার অনিবার্য ফল হচ্ছে জীবন যাপনের রীতিনীতির ক্ষেত্রে মুসলমানরা একটা অমর্যাদাকর অবস্থায় রয়েছে এবং দুনিয়ার লেনদেনের ক্ষেত্রে কোন নিয়ম- নীতির অনুসারী নয় বলে পরিচিত হয়েছে। পরবর্তীতে এ নীতিহীনতা ও বেদআতের কারণে ইসলামী দেশগুলো পশ্চাৎপদতায় পতিত হয়েছে।

এ মতবাদের প্রভাব কেবল সুফীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে যায়নি, বরং এ বিশেষ মতবাদটি যার ভিত্তি হচ্ছে দুনিয়া ত্যাগ ও বৈরাগ্যবাদ, তা সেই লোকদের উপরও বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছে যারা ছিল এ সুফীবাদের ঘোর বিরোধী। তাদের সংখ্যাও বৈরাগ্যবাদে বিশ্বাসী এ সুফীদের চাইতে কোন অংশ কম নয় ।

এ মত বিশ্বাসটিকে যদি একটি সামাজিক ব্যধি বলে আখ্যায়িত করা হয় তাহলে অত্যুক্তি হবে না অর্থাৎ এটি এমন একটি বিপজ্জনক ও সমাজ ধ্বংসকারী রোগ যা ইসলামী সমাজকে অভ্যন্তরীণভাবে একেবারে আধমরা করে ফেলেছে। অতএব এ বিপজ্জনক রোগের উত্তম চিকিৎসা উদ্ভাবন করা খবই জরুরী। যাতে করে ইসলামী সমাজকে এর কূ- প্রভাবের শিকার হতে না হয়। অত্যন্ত পরিতাপের সাথে এ কথা স্বীকার করতে হয় যে, এখন পর্যন্ত এ রোগের বিরুদ্ধে তেমন কোন কার্যকরী আন্দোলন গড়ে উঠতে পারেনি এবং এ ধরনের চিন্তা- ভাবনা দূর

করার ব্যাপারে কিছুই করা সম্ভব হয়নি। এ ব্যাপারে প্রতিটি আন্দোলনই জাতিগত ঝগড়া ও শেণী সংগ্রামের রূপ পরিগ্রহ করেছে। আর অনেক লোকই দুনিয়ার পদের লোভে এর বিরুদ্ধে সংগ্রামের পথ থেকে সরে পড়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তো এটাই দেখা গেছে যে, এ সূফীবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকারীরা নিজেরাই এর ফাঁদে আটকা পড়েছে। এছাড়াও দেখা গেছে এ আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীরা বেশীর ভাগই উচ্চ চিন্তা- ভাবনা ও মানুষের উচ্চ মর্যাদার ধারণা সম্পর্কে মোটেই কোন জ্ঞান রাখে না। তাদের আদৌ জানা নেই যে, মানবতা ও মানুষের প্রধান কর্তব্য কি? কিছ লোক যদি মানুষের উচ্চ মর্যাদার ও উচ্চ চিন্তা- ভাবনা করার জ্ঞানের অধিকারী হয় এবং সমাজের বিস্তৃত রোগ- ব্যধিগুলো দূর করার জন্য প্রচার করা শুরু করে তখনই চারদিক থেকে তার উপর আক্রমণ চালানো হয়। তথাকথিত এ সুফীবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার সময় এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, এমন একটি মতবাদের বিরু দ্ধে সংগ্রাম করা হচ্ছে যা ইসলামী সমাজের জন্য একটা মারাত্মক রোগ। যার কারণে ইসলামী উম্মাহ নানা প্রকার বেদআতের শিকার হচ্ছে। সুফীবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীদেরকে ইমাম সাদিক (আঃ)- এর সাথে ঘটিত এ ঘটনাটি মনে রাখতে হবে। আরো খেয়াল রাখতে হবে যে, কোন অবস্থাতেই যেন এ আন্দোলন জাতিগত ঝগড়া ও শ্রেণী সংগ্রামের রূপ্প ধারণ করতে না পারে। আর স্থান, কাল বা ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে সীমিত না হয়ে যায়। বরং কার্যক্রমটি এমন হতে হবে যে, যেখানেই হোক এবং যে দলের দ্বারাই এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়ে থাকুক, তাদের সাথেই উক্ত মতবাদটি ভ্রান্ত প্রমাণের জন্য সহযোগিতা করা উচিত।

যা হোক এ মতবাদটির জবাব ও তা ভ্রান্ত প্রমাণ করার ব্যাপারে ইমাম জা'ফর সাদিক (আঃ)- এর এ বর্ণনাটি অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য। আর এটা আমাদের জন্য পরম সৌভাগ্যের কথা যে, ইমামের এ হাদিসটি সনদযুক্ত কিতাবাদির মধ্যে সংরক্ষিত রয়েছে। যার প্রচারের দ্বারা ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোতে বিদআত সৃষ্টি করার যে কোন প্রচেষ্টার মোকাবিলা করা যেতে পারে।

১৭.অর্থাৎ যারা হিজরতকারীদের পূর্বে নিজেদের বাড়িতে বসবাস করতো। আর ঈমানে ছিল মজবুত। হিজরত করে যারা তাদের কাছে চলে এসেছে তাদের প্রতি রাখে ভালোবাসার মন। তারা যে (ধন) লাভ করেছে তার জন্য নিজেদের অন্তরে গরজবোধ করে না। যদিও নিজে অভাব- অনটনের মধ্যে রয়েছে এবং নিজের প্রয়োজন মিটাতে পারছে না তথাপিও অপরের প্রয়োজনকে নিজের উপর প্রাধান্য দেয়। আর যারা নিজেদেরকে লোভ- লালসা থেকে রক্ষা করতে পেরেছে তারাই সফলকাম। (সূরা আল- হাশর, আয়াত- ৯)।

১৮.অর্থাৎ আর তারা তাকেই ভালোবেসে মিসকীন, ইয়াতীম ও কয়েদীকে খাবার খাওয়ায়। (সূরা- আদ দাহার, আয়াত- ৮)।

১৯. অর্থাৎ, আর তারা যখন খরচ করে তখন তারা অতিরিক্ত তথা অপাত্রে খরচ করে না। আর বখিলী কৃপণতাও করে না। তাদের খরচ মধ্যম নীতিতে হয়ে তাকে। (সরা- আল- ফোরকান, আয়াত- ৬৭।)

২০.অর্থাৎ, তোমার হাতকে ঘাড়- গর্দানের সাথে বেঁধে রেখো না। তথা বখীল কৃপণ হয়ে হাত মুষ্টিবদ্ধ করে রেখো না যে, (কাউকে কিছু দিবে না)। আর দান করতে গিয়ে হাত একেবারে খুলে দিও না যে, (সব কিছদিয়ে দিবে)। অবশেষে তোমাকে দঃখি ও লজ্জিত হয়ে বসে থাকতে হবে।(সূরা ইসরা, ২৯)।

২১.অর্থাৎ, সে আমার নিকট প্রার্থনা করে বললো, হে আমার পরোয়ারদিগার! আমাকে ক্ষমা করে দাও। আর আমাকে এমন একটি রাজত্ব দান করো যা আমার পরে আর কারো পক্ষেই লাভ করা সম্ভব হবে না। নিঃসন্দেহে তুমি বড় দয়ালু দাতা। (সূরা- ছোয়াদ, আয়াত- ৩৫)।

২২ অর্থাৎ, ইউসুফ বললো- আমার উপর রাজ্যের কোষাগার বা অর্থনৈতিক বিষয়াদির দায়িত্বভার অর্পণ করুন। কেননা আমি নির্ভরযোগ্য বিশ্বাসী ও কর্মাভিজ্ঞ ।সূরা ইউসুফ, আয়াত- ৫৫)।

২৩.তুহফুল উকূল, পৃ. ৩৪৮- ৩৫৪, কাফী, প্লঞ্চম খণ্ড, আল- মাঈশাহ অধ্যায়, পৃ. ৬৫- ৭১।

২৪.উষ্ট্রের যুদ্ধটি বসরা শহরের নিকটেই হয়েছিল। এ যুদ্ধে এক পক্ষে ছিলেন আমীরুল ম'মিনীন হযরত আলী (আঃ) ও অন্য পক্ষে ছিলেন বিবি আয়েশা, তালহা ও যোবায়ের। এটাকে উষ্ট্রের যুদ্ধ এ জন্য বলা হয় যে, এ যুদ্ধে বিবি আয়েশা একটা উটের পিঠে আরোহণ করে হযরত আলী (আঃ)- এর বিরুদ্ধে দ্বযরত সৈনিকদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। আরবী ভাষায় জামাল মানে উট। হযরত আলী (আঃ) খেলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পরপরই বিবি আয়েশা, তালহা ও যোবায়ের তাঁর বিরুদ্ধে এ যুদ্ধ চাপিয়ে দেন। কারণ তিনি তাঁর ন্যায় ইনসাফ ভিত্তিক আচরণের কারণে অভিজাত শ্রেণীর লোকদের বেলায় কোন প্রকার বিশেষ সুযোগ প্রদান করতে রাজী ছিলেন না। যুদ্ধে হযরত আলীই জয়ী হয়েছিলেন।

২৫. নাহজুল বালাগা, খোতবা নং- ২০৭।

২৬. অসুলে কাফী, দ্বিতীয় খণ্ড, ফাজলে ফোকারায়িল মুসলিমীন অধ্যায়, পৃ. ২৬০।

২৭. সাফীনাতুল বিহার, মাদ্দায়ে শোতর, মাজমুআয়ে ওয়ারাম থেকে সংকলিত।

২৮.গাযযালী নামা, পৃ. ১১৬।

২৯. তারীখে উলুমে আকলী দার ইসলাম, পৃ. ২১১।

৩০. বিহারুল আনোয়ার, কোম্পানী মুদ্রিত, ১১শ খণ্ড, হালাতে ইমাম বাক্বের (আঃ), পৃ. ৮২।

৩১.

কাব্যার্থ

* গগণচুম্বী অট্টালিকা, দুর্জয় দুর্গ গড়ি

চেয়েছে পেতে অনেকে নিরাপ্লদ আশ্রয়।

সশস্ত্র দেহরক্ষী,   জাগ্রত সান্ত্রী রাখি

চেয়েছে রুখিতে শঙ্কা- শঙ্কিল বিপ্লর্যয়।

কিন্তু এসে যবে মৃত্যুদূত টুটি ধরে চাপি

ব্যর্থ তাবৎ অস্ত্রশস্ত্র মুহূর্তও দেয়নি প্রশ্রয়।

৩২.

* বিরাট- বিশাল মহল,   দুর্ভেদ্য কেলা ছাড়ি

যেতে হয়েছে সমাধির সংকীর্ণ আঁধার গোরে।

চলে গেছে সকল স্বজন নির্জনে অসহায় ফেলি।

কেউ এসে দেখেনি হাল কখনও কবর খুঁড়ে!!

জিজ্ঞাসে তাদের পুনঃপুনঃ বিবেক হাতেফ ডাকি

কোথা তোদের শান- শওকত,   কোথা তখতে তাজ?

দোর্দণ্ড প্রতাপ- প্রতিপত্তি,   অহংবোধ কোথা রাখি

এসেছো শন্য হাতে,   বলো তো কি হবে আজ?

* চকচকে ঝলমল রেশমী মিহি পর্দার আড়ালে থাকি

রেখেছো নিজেকে জনগণ থেকে অনেক দর।

আরাম- আয়েশে লালিত গর্বাহংকারে মুখখানি

চলে গেছে কোথা,   কোন সুদূর অচিনপুর?

* চলেছে তারা যে মাটির উপর নিয়ত : দম্ভ ভরি

সঁপেছে লোকেরা তাদের তারই দয়ার দ্বারে।

ভোগ- বিলাসে করেছে সতেজ যে দেহকে সদা লালি।

লাঞ্ছিত আজি কবর নামক বন্দী কারাগারে।

*   কালান্তর ধরে জগৎ মাঝে স্বাদাস্বাদের আহার করি

হয়েছে আজি কবর মাঝে মাটিরই খাদ্যাহার।

ভুগিবে কঠোর শাস্তি সাজা মাটিরই গর্ভে থাকি

নিজেদেরই কর্মের ফল,   অশেষ- অসীম লাঞ্ছনার।

৩৩.বিহারুল আনোয়ার, দ্বিতীয় খণ্ড, আহওয়ালে ইমাম হাদী (আঃ), পৃ. ১৬৯ ।

৩৪. বিহারুল আনোয়ার, দ্বাদশ খণ্ড, হালাতে হযরত রেজা, পৃ ৩৯।

৩৫. বিহারুল আনোয়ার, দশম খণ্ড, পৃ. ২৫।

৩৬. আল- ইমামু আলীয়্যুন, সওতিল আদালাতিল ইনসানিয়্যাহ, পৃ. ৪৯, দেখুন শরহে নাহজুল বালাগা, ইবনে আবিল হাদীদ, বৈরুত সংস্করণ, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ১৮৫।

৩৭. বিহারুল আনোয়ার, একাদশ খণ্ড, হালাতে ইমাম সাদিক, পৃ. ১১৬।

৩৮. ওয়াসায়েল, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ৪৬৯।

৩৯. ওয়াসায়েল, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৪৯৪, বারো ইসতিহবাবির রিফকু আলাল মু'মিনীন, হাদীস নং- ৩ ও ৯।

৪০.মুরূজুযযাহাব মাসউদী, দ্বিতীয় খণ্ড, হালাতে মাহদী আব্বাসী।

৪১. উসলে কাফী, দ্বিতীয় খণ্ড, বাবে হাককল জেওয়ার, পৃ:৬৬৮।

৪২. ওয়াসায়িল, তৃতীয় খণ্ড, কিতাবুশশাফাআহ, বাবো আদমে জাওয়াযিল ইজরারি বিল মুসলিম, পৃ. ৩২৯, হাদীস নং- ১, ৩, ৪।

৪৩. বিহার, ৬ষ্ঠ খণ্ড, বাবো মাকারেমে আখলাকুহু ওয়া সিয়ারুহু ওয়া সুনানুহু।

৪৪.বিহারুল আনোয়ার, একাদশ খণ্ড, পৃ:১২১।

৪৫. বিহারুল আনোয়ার, ৬ষ্ঠ খণ্ড, বাবো মাকারিমুল আখলাকু ওয়া সিয়ারুহু ওয়া সুনানুহু।

৪৬. বিহারুল আনোয়ার, একাদশ খণ্ড, পৃ:১১৭।

৪৭..কবিতাটির বাংলা অর্থ নিম্নরূপ্প :

* চেনে তাকে মরু মক্কার প্রতিটি পাথরকণা,

খানে কা'বার কাছে নন তিনি অচেনা অজানা।

হেরেমের ধূলা- বালির যতো অণূ- পরমাণু

বাইরে মৃত্তিকাও অবগত তার পরিচয়খানা।

* নন্দন তিনি অতি প্রিয় বান্দা খোদার;

সবার সেরা আবেদ তিনি মোত্তাকী পরহেযগার।

পুতঃপবিত্রতার প্রতীক তিনি জগতে খ্যাত,

অতুল ব্যক্তিত্বাসনে অশেষ মর্যাদার।

* যতোই বলো না কেন চেনো না তারে;

কি তাতে আসে যায়, না কমে- না বাড়ে!

তোমার চেনা- অচেনায় নেই তাঁর নোকসান-

কেননা আরব- আজম জানে তাঁকে হাড়ে হাড়ে।

৪৮. বিহারুল আনোয়ার, দ্বাদশ খণ্ড, পৃ:. ১৪ ।

৪৯. বিহারুল আনোয়ার, নবম খণ্ড, তাবরিয সংস্করণ, পৃ. ৬১৩।

৫০. ওয়াসায়েল, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ: ৫৮২।

৫১. বিহারুল আনোয়ার, একাদশ খণ্ড, কোম্পানী, পৃ. ১১০, ওয়াসায়েল, দ্বিতীয় খণ্ড, মুদ্রণ- আসীর বাহাদুর, পৃ. ৪৯।

৫২.ওয়াসায়েল, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ: ২১২।

৫৩.এরশাদে দেইলামী।

৫৪. বিহারুল আনোয়ার, দ্বাদশ খণ্ড, পৃ: ৩১।

৫৫. আল কুনা ওয়াল আলকাব, মুহাদ্দিসে কুমী, দ্বিতীয় খণ্ড, আলহাফী শিরোনাম, পৃ. ১৫৩, আলামা লিখেছেন মিনহাজুল কারামাহ গ্রন্থ থেকে।

৫৬. মালেক ইবনে আনাস বিন মালেক বিন আবী আমের আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের চারজন বিখ্যাত ইমামগণের একজন। বিখ্যাত মালেকী মাযহাব তার নামানুসারেই। তিনি ইমাম আব হানীফার সময়কালের একজন আলেম। ইমাম শাফেঈ ইমাম মালেকের শিষ্য ছিলেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ইমাম শাফেঈর শিষ্য ছিলেন।

ফেকাহশাস্ত্রের দিক থেকে ইমাম মালেক ও আবু হানীফার মতবাদে বিরাট পার্থক্য ছিল। এ দু'টি মতবাদকে একটি আরেকটির ঘোর বিরোধী বলে ধরা হয়। কেননা আবু হানীফা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজের রায় ও কিয়াসকে প্রাধান্য দিতেন। এর বিপরীতে ইমাম মালেকের ফেকহী মতবাদ অধিকতর হাদীসের উপর নির্ভরশীল। এর সাথে সাথে ইবনে খালকান তার রচিত ওয়াফইয়াতুল আ'ইয়ান নামক গ্রন্থের তৃতীয় খন্ডের ২৮৬ পষ্ঠায় লিখেছেন যে, ইমাম মালেক তার মৃত্যুর পূর্বে অনেক কান্নাকাটি করতেন। এর কারণ ছিল এই যে, তিনি কতিপয় ফতোয়া নিজের রায় ও কিয়াসের ভিত্তিতে দিয়েছিলেন। তার জীবনের শেষ মুহূর্তে সে ভুলের কথা গভীরভাবে অনুভূত হচ্ছিল। তাই যখনই তার নিজের রায় ও কিয়াস ভিত্তিক প্রদত্ত ফতোয়ার কথা তার মনে জাগতো তখনই তিনি অস্থিরভাবে কান্নাকাটি শুরু করতেন। আর নিজের অজান্তেই বলতেন, হায় আফসোস! আমি যদি অমার রায় মোতাবেক সে ফতোয়াগুলো না দিতাম। আমি এখন এ ব্যাপারে সন্তুষ্ট চিত্তে প্রস্তুত রয়েছি যে, আমার নিজস্ব রায়ের ভিত্তিতে দেয়া প্রতিটি ফতোয়ার বদলে এক একটি করে বেত্রাঘাত করা হোক। যাতে করে আমি সে সব গুনাহ থেকে মক্তি লাভ করতে পারি।

মালেকী মাযহাবের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন বিশেষ ব্যাপার হচ্ছে যে, তারা মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ মাহাজ যিনি শহীদ হয়েছেন তার বাইয়াতকে সঠিক মনে করে। এ মাযহাবের দৃষ্টিতে বনী আব্বাসীয়দের, যারা শক্তি দ্বারা খেলাফতের ক্ষমতা দখল করেছে তাদের বাইয়াত করা জায়েয নয়। ইমাম মালেক কখনও তার এ আকীদা- বিশ্বাস প্রকাশ করা পরিত্যাগ করেননি। তিনি বনী আব্বাসীয়দের প্রতাপ- প্রতিপত্তি ও দোর্দণ্ড প্রভাবের কোনই পরোয়া করতেন না। এ কারণেই সাফফাহ ও মনসুরে চাচা জা'ফর ইবনে সুলাইমান আব্বাসীর হুকুমে তাকে কঠোর বেত্রাঘাত করা হয়েছিল। কিন্তু এটা একটা আশ্চর্যের বিষয় যে, আব্বাসীয় শাসকদের পক্ষ থেকে প্রহারের কারণে মালেকের খ্যাতি, জনপ্রিয়তা ও সম্মান অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেল। ওয়াফইয়াতুল আ'ইয়ান গ্রন্থের তৃতীয় খন্ডের ২৮৫ পৃষ্ঠায় এ পর্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

মদীনায় অবস্থানকালে ' ইমাম মালেক সব সময় ইমাম জাফর সাদিক (আঃ)- এর কাছে আসা- যাওয়া করতেন। তিনি তাদেরই মধ্য থেকে একজন, যারা ইমাম (আঃ)- এর কাছ থেকে হাদীস বণর্ না করতেন। বিহারুল আনোয়ারের বর্ণনা মতে ইমাম সাদিক (আঃ) ইমাম মালেককে খুব ভালো জানতেন। আর প্রায়ই তিনি মালেককে বলতেন, আমি তোমাকে ভালো জানি। মালেক ইমামের মুখে নিজের প্রশংসা শুনে খুব খুশী হতেন। আল- ইমাম আস- সাদিক নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে যে, ইমাম মালেক প্রায়ই বলতেন, আমি একটা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ইমাম জা'ফর সাদিক (আঃ)- এর কাছে আসা- যাওয়া করতাম। তখন আমি ইমামকে অধিকাংশ সময় দেখতে পেতাম নামায- রোযা, তিলাওয়াতে কোরআন ইত্যাদি নেক কাজে ব্যস্ত। ইবাদত- বন্দেগী, তাকওয়া- পরহেযগারী ও জ্ঞান- গরিমার জগতে তার থেকে বড় কাউকে আর আমি দেখিনি। বিহারুল আনোয়ারে ভাষ্য অনুযায়ী ইমাম মালেক ইমাম জা'ফর সাদিক (আঃ) সম্পর্কে এভাবে বলতেন, ইমাম জা'ফর সাদিক (আঃ) অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন একজন ইবাদতকারী ও মোত্তাকী- পরহেযগার লোক ছিলেন। তিনি মহান আল্লাহকে অনেক ভয় করতেন। মহানবী (সাঃ) এর অনেক অনেক হাদীস তার মুখস্ত ছিল। তিনি ছিলেন অত্যন্ত নেক চরিত্রের অধিকারী এক মহান ব্যক্তিত্ব। তাঁর সংস্পর্শে এসে অনেক কিছু অর্জন করা যেতো। তাঁর সংস্পর্শে এসে ও তার মজলিসে বসে লোকেরা সব রকমের সৌভাগ্য ও বরকত হাসিল করতো। মহানবী (সাঃ) এর নাম তাঁর সামনে উচ্চারিত হবার সাথে সাথেই তাঁর চেহারার রং পাল্টে যেতো।

৫৭. বিহারুল আনোয়ার, একাদশ খণ্ড, পৃ. ১০৯।

৫৮. ওয়াসায়েল, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৫৩১, বিহারুল আনোয়ার, নবম খণ্ড, পৃ. ৫৯৯।

৫৯. উসূলে কাফী দ্বিতীয় খণ্ড বাবুল বাযা, পৃ. ৩২৪, ওয়াসায়েল, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৪৭৭।

৬০. নাহজুল বালাগাহ, শরহে ইবনে আবিল হাদীদ, বৈরুত সংস্করণ, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৩৮৯।

৬১. তাতিম্মাতুল মুনতাহা, মুহাদ্দেসে কুমী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৪০০, তারীখে ইবনে খালকান, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৪৪।

৬২. মুরযুযাহাব, মাসউদী, মিসর সংস্করণ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ.১৭৪, আহওয়ালে ওমর ইবনে আব্দুল আযীয অধ্যায়ে।

৬৩. আল আনোয়ারুল বাহিয়াহ, মোহাদ্দেসে কুম্মী, পৃ.৭৬ ।

৬৪. কিতাবে নিয়ায়েশ এর অনুবাদের ভূমিকাংশ (আলেকসিস কার্ল রচিত) জনাব মুহাম্মাদ তাকী শরীয়াতীর লিখিত।

৬৫.কাফী, দ্বিতীয় খণ্ড, বাব হাকীকাতল ঈমান ওয়াল ইয়াকনী, পৃ.৫৩।

৬৬. সীরায়ে ইবনে হিশাম, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩২১- ৩৩৮, শরহে ইবনে আবিল হাদীদ নাহজুল বালাগাহ। চতুর্থ খণ্ড, বৈরুত সংস্করণ, পৃ. ১৭৫- ১৭৭, নাসেখুত তাওয়ারিখ হিজরত পূর্ব ঘটনাবলী।

৬৭. বিহারুল আনোয়ার, ১১শ খণ্ড, প. ১২০।

৬৮. কাফী, দ্বিতীয় খণ্ড, বাবু হাক্কুল জাওয়ার, পৃ. ৬৬৬।

৬৯. বিহারুল আনোয়ার, ১১শ খণ্ড, প. ১০৫।

৭০. শরহে ইবনে আবিল হাদীদ, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৫৬৮- ৫৭০, মাগাযীয়ে ওয়াকেদী থেকে সংকলিত।

৭১. ওয়াসায়েল দ্বিতীয় খণ্ড, প. ৪৫৭।

৭২. ওয়াসায়েল, দ্বিতীয় খণ্ড, প. ৪৬২ ।

৭৩. বিহারুল আনোয়ার, একাদশ খণ্ড, পৃ. ২১৫।

৭৪. কুহলিল বাছার, মুহাদ্দেসে কুমী, পৃ. ৭৯।

৭৫. ওয়াসায়েল, দ্বিতীয় খণ্ড, প. ৫৭।

৭৬ . সীরাতে ইবনে হিশাম, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৬৫।

৭৭. রওযাতল জান্নাত, হাজী সাইয়্যেদ সাঈদ প্রকাশিত, পৃ. ৭৪৭।

৭৮. তারীখে উলুমে পিইউররোসো, পৃ. ৩৮২- ৩৮৩।

৭৯. আইনে সখানভারী, মরহুম মহাম্মাদ আলী ফরুগী রচিত, দ্বিতীয় খণ্ড, প. ৫- ৬।

৮০. সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১৯- ৪২১।

৮১. কাব্যার্থ : *দেখেছো তোমরা? কতো উচ্চ ব্যক্তিত্বের শবদেহ- চলে গেছে এ পথিবীর মায়া সাঙ্গ করে; হেরেছো তোমরা? কেমন করে হলো এমন? স্তব্ধ হয়ে গেছে প্রজাপতির সমারোহ চিরতরে।

* লুটিয়ে পড়েছে ভূতলে হিমাদ্রিসম পর্বত, হতো যদি নিপতিত অতল সাগর বুকে- উপচে উঠতো তার সীমাহীন জলরাশি, প্লাবিত হতো ভরপুর বারিধির উপরি মুখে!!

* তোমার মৃত্যুর আগে কখনো পায়নি স্থান- আমার বিশ্বাস জগতের মণিকোঠায় একটিবার, পর্বতসম তোমাকেও একদিন মৃত্তিকার অভ্যন্তরে লুকিয়ে নেবে চিরতরে ফিরিয়ে দেবে না আর!!

৮২. ওয়াফইয়াতুল আইয়ান, মুহাদ্দেস কুমী দ্বিতীয় খণ্ড, প. ৩৬৫ আসসাবী অধ্যায়।

৮৩. আলকুনা ওয়াল আলকাব, দ্বিতীয় খণ্ড, আল বসরী শিরোনাম, বিহারুল আনোয়ার, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২২৪, হাদীস নং- ১৭।

৮৪.তরজমাতুল মুনাকায মিনাদ্দলালাহ (এতেরাফাতে গাযযালী), তারীখে ইবনে খালকান, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৩৫১- ৩৫২, গাযযালী নামাহ।

৮৫. আবুযার গিফারী, রচনায় আব্দুল হামীদ জাওয়াতুসসিহার, (অনুবাদ- আলী শরীয়তী, বর্ধিত কলেবরে)।

৮৬. বিহারুল আনোয়ার, ১১শ খণ্ড, পৃ. ১৭, ২৭, আল ইমাম আসসাদিক, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১১, আল-ইমামু যয়নুল আবেদীন, রচনায়- আব্দুল আযীয সাইয়্যেদুল আহাল, অনুবাদ- হোসাইন বিজদানী, পৃ. ৯২।

৮৭. বিহারুল আনোয়ার, সপ্তম খণ্ড, ১০৩নং অধ্যায়, পৃ.- ৫৯৭ ।

সূচীপত্র :